ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি

-উষাকান্ত দত্ত

কলিকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ, বিশ্বভারতী, যাদবপুর প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের
পাঠ্যসূচী অনুযায়ী লিখিত পূর্ণাঙ্গ পুস্তক

ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি

[বিষয় পদ্ধতিসহ পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ]

অধ্যাপক ঊষাকান্ত দত্ত, এম.এ. বি.টি. (পদকপ্রাপ্ত)
উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়
কোচবিহার।

ঃ পরিবেশনায় ঃ

স্বরাজ ভাণ্ডার
১২৭এ, এস পি মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

সঞ্চয়
৩০।১/বি, কলেজ রো,
কলিকাতা-৯

প্রকাশিকা:
শ্রীমতী শোভারাণী চক্রবর্তী
এডুকেশনাল বুক করপোরেশন
১২৭এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড
কলিকাতা-২৬

প্রথম সংস্করণ :
১৫ই আগষ্ট—১৯৭৫

আর্থিক মূল্য—বারো টাকা পঞ্চাশ পয়সা মাত্র

মুদ্রাকর :
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৩৩ডি, মদন মিত্র লেন,
কলিকাতা-৬

॥ উৎসর্গ ॥

আমার
বাবাকে
যিনি আমাকে ইতিহাস
চিনিয়েছেন আর
যিনি আজ নিজেই
ইতিহাস।

॥ লেখকের অন্য বই ॥

তুলনামূলক শিক্ষা

॥ মুখবন্ধ ॥

বাজারে ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতির উপর বহু বই প্রচলিত। তবুও আরেকটি বইয়ের প্রকাশনা শুধুমাত্র প্রকাশকের ব্যবসায়িক তাগিদ বা গ্রন্থকারের নিজেকে জাহির করার উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয়।

ইতিহাস যেহেতু নিয়তই সঞ্চারমান, সেই হেতু ইতিহাসের সঞ্চয় সর্বদাই ক্রম-বর্ধমান। তাই ইতিহাসের পাঠককে সর্বদাই হতে হয় সর্বাধুনিক। স্বভাবতঃই এ কারণে এই গ্রন্থকে বিষয় ও পদ্ধতিগত দিক থেকে, যতখানি সম্ভব, সাম্প্রতিক ও আধুনিক করার চেষ্টা করা হয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে অবশ্যই স্বীকার্য, ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় দেশে ও বিদেশে প্রকাশিত ও প্রচলিত প্রায় সব বই বর্তমান গ্রন্থকার পাঠ করেছেন। ফলে এই গ্রন্থ রচনায় সে সব গ্রন্থের প্রভাব থাকাটাই স্বাভাবিক।

এই গ্রন্থ রচনায় প্রথম উদ্দীপক ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ। আর সেই উদ্দীপণাকে পরিণতি পথে নিয়ে গিয়েছেন সহমর্মী ও সহকর্মী। অতএব কৃতজ্ঞতা এঁদের সবার কাছে।

শেষে বিনীত অনুরোধ, গ্রন্থখানির অধিকতর গুণগত উৎকর্ষতা অর্জনে সবার সহযোগিতা এবং মূল্যবান উপদেশ একান্তভাবে আকাঙ্ক্ষিত।

গ্রন্থকার।

কোচবিহার

জ্যৈষ্ঠ ২২, ১৩৮২

সূচীপত্র

প্রথম পর্ব—ইতিহাস বিষয়ের সাধারণ পদ্ধতি

পৃষ্ঠা

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের পরিচয়

॥ বিষয়-সংকেত ॥

ইতিহাসের ইতিহাস—ইতিহাসের সংজ্ঞা—
ইতিহাসের পরিধি—ইতিহাসের দর্শন—
ইতিহাসের স্বরূপ—ইতিহাস রচনাশৈলী—
ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলী।

"*What men have done and said and above all what they have thought that is history.*"—*Maitland*

"*We can learn to lead efficient and useful lives only if we try to understand our present-day-problems—national and international, accurately and dispassionately. History will show us how to do it.*

V. D. Ghate

"*It is the welfare of your country, it is your whole interest as citizens that is in question when you study history.*"

John Seeley.

॥ ইতিহাসের ইতিহাস ॥

॥ History of History ॥

সাম্প্রতিক কালে সোভিয়েট রাশিয়ার মত শিক্ষায় সমুন্নত দেশে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান-বিভাগীয় বিষয় হিসেবে পরিগণিত। বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ইতিহাসের যে বিশেষ মর্যাদা আজ সর্বজন স্বীকৃত তা কোন তাৎক্ষণিক ঘটনার ফলশ্রুতি নয়, বরং আমাদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রে দীর্ঘকাল ব্যাপী বিবর্তনের একটি স্বাভাবিক পরিণতি। এই বিবর্তনের প্রবাহকে অনুসরণ করতে হলে প্রয়োজন ইতিহাসের ইতিহাসকে জানা।

প্রারম্ভিক কাল

সেই কোন্ সুদূর অতীতে একটি সময় ছিল যখন ইতিহাস বলতে বুঝাতো আঞ্চলিক কোন রোমাঞ্চকর কাহিনী, কোন বীরত্বের কীর্তি-কথা, লোকগাথা, মহাকাব্য ইত্যাদি। **তখন ইতিহাসের ভূমিকা ছিল প্রাত্যহিকতার জীবন-যন্ত্রণায় বিক্ষত মানুষকে কিছুক্ষণের জন্য আনন্দ দান।**

ইতিহাসের এই ভূমিকার পরিবর্তন আনলেন গ্রীক ঐতিহাসিক **হেরোডোটাস**। তাই তাঁকেই আমরা ইতিহাসের জনক (Father of history) বলে জেনেছি।

হেরোডোটাস

ইতিহাসকে একটি স্বতন্ত্র চিন্তা ও চেতনার বিষয়রূপে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁর উদ্যোগে সত্যকে অনুসন্ধান ইতিহাসের মূল নীতিরূপে গৃহীত হ'ল। তাঁর লেখা পারস্যের যুদ্ধের কাহিনী একাধারে যেমন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল, অন্যদিকে তেমনি পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত তথ্যের যথোচিত বিশ্লেষণ লব্ধ ফল। হেরোডোটাস প্রকৃত অর্থে ইতিহাস শব্দের যে ব্যুৎপত্তিগত দ্যোতনা 'অনুসন্ধান' তার প্রতি যথোচিত মর্যাদা আরোপ করেন। হেরোডোটাস অনুসৃত পদ্ধতির মূলকথা হ'ল এই : **ইতিহাস হ'ল অতীত ঘটনার বিবরণ আর ঐতিহাসিক হলেন সেই বিবরণের গাল্পিক লিপিকার।**

হেরোডোটাসের সমসাময়িক-কালে ছিলেন আর একজন ঐতিহাসিক, নাম **থুকিডাইডিস্**। তাঁর রচনার বিষয় হ'ল পেলোপনেশিয়ার যুদ্ধ। তাঁর মতে, **অতীত নয়, সাম্প্রতিক-কালের বিবরণই হ'ল ইতিহাস**। শুধু তাই নয়।

থুকিডাইডিস

পেলোপনেশিয়ার যুদ্ধের বিবরণ রচনা করতে গিয়ে তিনি উভয় যুযুধান পক্ষের শক্তি-সামর্থ্যের, ত্রুটি-বিচ্যুতির যে তুলনামূলক আলোচনা করলেন তাতে ইতিহাস সত্যি সত্যিই বিশ্লেষণাত্মক হয়ে উঠলো। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল, ইতিহাস যেন জনগণের ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী গঠনের সহায়ক হতে পারে। তাই থুকিডাইডিসের সময় থেকে ইতিহাস হ'ল শিক্ষামূ্লক বা Didactic এভাবেই ইতিহাস-নির্ভরতার একটি মান নির্ধারিত হয়ে গেল।

এঁদের পরবর্তীকালে এসেছেন বহু-খ্যাতিমান ঐতিহাসিক। যেমন জেনোফোন, পলিবাস, ক্যাসিয়াস্, ট্যাসিটাস্ প্রভৃতি। কিন্তু এঁরা সবাই হেরোডোটাস-

পরবর্তীকাল

থুকিডাইডিস প্রদর্শিত পথই অনুসরণ করেন। অর্থাৎ দীর্ঘকাল পর্যন্ত হৃদয়-গ্রাহীতা ও শিক্ষামূলক বিবরণ-ধর্মিতাই হয়ে রইলো ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

ইতিহাসের পথ-পরিক্রমার নতুন বাঁক এল মধ্য-যুগে পৌছে। **সেই তুমুল ধর্মান্ধতার সময় ধর্মই হ'ল ইতিহাসের প্রধান উপজীব্য**। আর তখন ইতিহাস

মধ্যযুগ

লেখক ছিলেন মূলতঃ যাজক-সম্প্রদায়। এঁরা ইতিহাসের মধ্যে ঈশ্বরের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে চাইলেন। তাই বলা হয়েছে এই সময় ইতিহাস ছিল handmaid of theology.

তারপর সপ্তদশ শতাব্দীতে সূচিত হ'ল আর এক পট-পরিবর্তন। ইতিহাস এ সময় থেকে কেবল কোন ঘটনার বিবরণই নয়, অথবা শুধুমাত্র কোন শিক্ষামূলক

সপ্তদশ শতাব্দী

রচনাও নয়। ইতিহাস হয়ে উঠলো বহুলাংশে স্ব-নির্ভরতারই ঘটমানতার নির্লিপ্ত সমালোচক। ইতিহাসের এই যে ভিন্নতর ভূমিকা তাকে সার্থক করে তোলার জন্য ঐতিহাসিকেরাও অবলম্বন করলে

চাইলেন ইতিহাস রচনার ভিন্নতর পথ। আরম্ভ হ'ল বিভিন্ন ইতিহাসের নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলীর সন্ধানী বিচার-বিশ্লেষণ। আরম্ভ হ'ল মুদ্রা, স্মৃতিস্তম্ভ, শিলালিপি প্রভৃতি উপাদানগুলি যাচাই করে ঐতিহাসিক তথ্যচয়ন, সংগঠন ও সমন্বয় সাধনের উদ্যোগ। ইতিহাস রচনার এই নতুন পথের প্রদর্শক হলেন **জিন বোডিন ও জিন ম্যাবিলন**। প্রকৃতপক্ষে এ সময় থেকেই **বিজ্ঞান ও দর্শনের মানদণ্ডে ইতিহাসকে বিচার করার সূত্রপাত হ'ল**। এভাবেই আধুনিক ইতিহাস রচনার যাত্রা হ'ল শুরু।

ইতিহাস রচনার পদ্ধতিগত পরিবর্তন

তারপর এক পট পরিবর্তন উনবিংশ শতাব্দীতে। এই শতাব্দী একদিকে যেমন বিজ্ঞানের শতাব্দী, অন্যদিকে তেমনি ইতিহাসের শতাব্দী। আপাতঃদৃষ্টিতে যাই মনে হোক্, কথা দুটি কিন্তু পরস্পর বিরোধী নয়, বরং পরস্পরের পরিপূরক। কারণ এই শতাব্দীতে বিজ্ঞানের দুর্বার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে জ্ঞানের প্রতিটি বিভাগেই এসেছে যে কোন তথ্য নিয়ে পরীক্ষণ, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মানসিকতা। ইতিহাসও নিজেকে এই পরিবর্তিত মানসিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে পারলো না। তাই আরম্ভ হ'ল ইতিহাসের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান চেতনা।

উনবিংশ শতাব্দী

বিজ্ঞান-ভিত্তিক

ইতিহাসের এই অভিনব যাত্রা পথের প্রথম অভিযাত্রী হলেন এক জার্মান শিক্ষক, **নাম লিওপোল্ড ভন র‍্যাংকে**। একজন বিজ্ঞানীর চোখে ইতিহাসকে বিচার করতে গিয়ে তিনি বললেন, **ইতিহাস হ'ল অতীতের অবিকৃত এবং যথাযথ বিবরণ**।

র‍্যাংকে

বিজ্ঞান-ভিত্তিক এই ইতিহাস-চর্চাকে স্পষ্টতর এবং তীক্ষ্ণতর করে তুললেন ইংরেজ ঐতিহাসিক **বাক্‌লে**। তাঁর মতে, **অতীত সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করাতেই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ হয় না। বরং সেই সংগৃহীত তথ্যগুলোকে বিশ্লেষণ করে কতকগুলো বিধি বা Law নির্ধারণ করাও ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।**

বাক্‌লে

কিন্তু এই ইতিহাসের বিধি বা law নির্ধারণ করতে গিয়ে দেখা গেল যে, কোন স্মরণীয় ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া-কলাপ সেই ব্যক্তিত্বের একক অবদান নয়, কারণ তাঁর পটভূমি হিসেবে রয়েছে সমসাময়িক সমাজ ও সভ্যতা। অতএব ইতিহাস হয়ে দাঁড়ালো সভ্যতার ক্রমিক বিকাশের এক অন্তহীন প্রবাহ। একেই আমরা বলছি law of development.

ইতিহাস-বিধি

ইতিহাসের এই যে অভিনব পরিচয় তাকে সম্পূর্ণ অর্থেই বিজ্ঞান নির্ভর করে তুললেন **কার্ল লামপ্রেকট তাঁর** Genetic concept বা উৎপত্তি সম্পর্কীত মতবাদ দ্বারা। এই মতবাদ অনুসারে বলা হয়, কোন ঘটনা অপর কোন ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কহীন

নয়, বরং কার্য-কারণ সূত্রে গভীরভাবে সংযুক্ত। ল্যামপ্রেক্টের মতে, অতীতে ঘটনাটি কেন ঘটেছিল তার কারণ অনুসন্ধানই ইতিহাসের কাজ। এমন ইতিহাসই হ'ল প্রকৃত ইতিহাস, বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস নির্ভুল ইতিহাস।

ল্যামপ্রেক্ট

এই কার্য-কারণ সূত্রের পারম্পর্য বজায় রেখে ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে দেখা গেল, **কেবলমাত্র রাজন্য-বর্গকে নির্ভর করে এতকাল যে ইতিহাস রচিত হচ্ছিল তা ঐতিহাসিকের সকল প্রশ্নের জবাব দিতে সক্ষম নয়।** তাই ইতিহাসের আঙ্গিনাও হ'ল সম্প্রসারিত। রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অর্থনৈতিক ইতিহাস সামাজিক ইতিহাসকেও আর দৃষ্টির বাইরে রাখা গেল না। প্রকৃত ইতিহাস রচনায় **অর্থনৈতিক উপাদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করলেন সমাজবাদী রাজনীতিবিদ্ ও ঐতিহাসিক কার্ল মার্কস্।** আর সামাজিক ইতিহাস পর্যালোচনার সূত্র ধরেই এল সাংস্কৃতিক ইতিহাসের অনুশীলন উদ্যোগ। **আজকের ইতিহাস তাই মানুষের সামগ্রিক ইতিহাস এবং সামগ্রিক ইতিহাসকে পরিপূর্ণ করে তুলতে আজকের ঐতিহাসিককে প্রয়োজন অনুসারে সমাজ-তাত্ত্বিক হতে হয়, মনস্তাত্ত্বিক হতে হয়।**

ইতিহাসের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত

কার্ল মার্কস্

সুতরাং সর্বাধুনিক সময়ে **ইতিহাস চর্চা হ'ল প্রকৃতপক্ষে সত্যের অনুসন্ধান আর ইতিহাস-গ্রন্থ হ'ল আবিষ্কৃত সত্যের লিপিবদ্ধ প্রকাশ।**

॥ ইতিহাসের সংজ্ঞা ॥

॥ Definition of History ॥

ইংরেজীতে History শব্দটি গ্রীক শব্দ Historia থেকে এসেছে, যার অর্থ হ'ল সত্যের অনুসন্ধান। আর বাংলাতে 'ইতিহাস' শব্দটি এল সংস্কৃত 'ইতিহ' শব্দ থেকে যা ঐতিহ্যকে বুঝায়। এই দুই ভাষার মধ্যে আপাতঃ বিরোধ থাকলেও একটি অন্তর্নিহিত সম্পর্ক কিন্তু অস্পষ্ট নয়। কারণ ইংরেজীতে History যেমন সত্যানুসন্ধান, বাংলাতে ইতিহাস তেমন ঐতিহ্যকে জানার অর্থে প্রাচীন সত্যকেই জানা।

ব্যুৎপত্তিগত

কিন্তু নানাজন ইতিহাসকে দেখেছেন নানা দৃষ্টি কোণ থেকে। যেমন ইংলণ্ডের প্রধান মন্ত্রী ওয়ালপোল তাঁর অসুস্থ থাকাকালে ইতিহাস বাদে যে কোন বই পড়তে চেয়েছিলেন (Give me anything but history). ইতিহাস সম্পর্কে ছিল তাঁর এমনি অনীহা। নেপোলিয়ন বলতেন, "What is history but a fable agreed upon." স্পেন্সার মনে করতেন, Read them (histories) if you like, for

amusement : but don't flatter yourself they are instructive. অন্যদিকে অলিভার ক্রমওয়েল বলেছেন, "ভগবান নিজেকে ইতিহাসের মধ্য দিয়েই প্রকাশ করেন।" ফ্রড্ বলেছেন, "History records the vices and virtues of the ages." কোশ বলেছেন, "History is a veritable mine of life experiences."

বিভিন্ন জনের মত

এত পরস্পর-বিরোধিতা যেখানে সেক্ষেত্রে ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝি? আমাদের দৈনন্দিন জীবন যাপনে যা কিছু ঘটে তা প্রচণ্ড—সত্য বাস্তব। **তাই জীবন বলতে আমরা সব বাস্তবতাকেই বুঝি। এবং সেই জীবনের কথাই হ'ল ইতিহাস।**

তাই ইতিহাস সৃষ্টি করতে পারে একমাত্র মানুষই এবং ইতিহাস বলতে মানুষের কাহিনীকেই বুঝায়। এই পৃথিবীতে অস্তিত্বের দুটো দিক—মানুষ ও প্রকৃতি। আবার প্রতিটি মানুষের দুটো পরিচয়—একটি তার ব্যক্তি পরিচয়, অন্যটি তার সমষ্টিগত সামাজিক পরিচয়। **মানুষ এই প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যক্তি ও সমষ্টির যুক্ত ক্রিয়ায় ও প্রতিক্রিয়ায় যেসব ঘটনার নায়ক তাই হ'ল ইতিহাসের বিচরণ ক্ষেত্র।** আর সেই মানুষ কোন একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক পরিসীমায় সংকীর্ণ নয়, কোন কৃত্রিম শ্রেণী বিন্যাসে বিভক্ত নয় কিংবা কোন জাতিগত বৈষম্যে বিচ্ছিন্ন নয়। এই কথাটি Dilthey সুন্দরভাবে বলেছেন "the historian concerns himself with elusive entities such as classes, nations and ages, even worse, with the religious spirit of an age, the will of a nation or the interests of a state."

মানব-কাহিনী

কিন্তু এই মানুষের কাহিনীতো হ'ল এক ধারাবাহিক বিবরণ—প্রতিটি ঘটনার সঙ্গে প্রতিটি ঘটনা গভীরভাবে সংযুক্ত। **ঘটনাবলীর এই যে পারস্পরিক সম্পর্ক তাকে বুঝানোর জন্যই ইতিহাসে সময়ের গুরুত্ব অপরিসীম।** ভি. এইচ. গলব্রেথ বলেছেন, "If time were to stand still, history would soon cease, once the existing evidence was fully shifted." প্রকৃতপক্ষে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ যেন এক অনিবার্য ঘটমান তার রজ্জুতে আবদ্ধ। আর সময় বলতে বুঝায় বিবর্তন। শুধু মানুষই নয়, আমাদের চারপাশে যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল তাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। ইতিহাস তো এই পরিবর্তনশীলতারই নির্বাক, নিস্পৃহ ও নিরপেক্ষ দ্রষ্টা। শুধু তাই নয়, এই পরিবর্তনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব নিরূপিত হয় সমসাময়িকতার পশ্চাদপটে। গৌতম বুদ্ধের বাণীর কোন ভিন্নতর মূল্য আজকে আমাদের কাছে নেই। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের যথাযথ তাৎপর্য তখনই বিবেচিত হবে যখন সে বিচারের ভিত্তিভূমি হবে আড়াই হাজার বছর আগেকার পারিপার্শ্বিকতা। প্রকৃতপক্ষে ভূগোল যেমন স্থানীয় মানদণ্ডে মানব-জীবনের পরিমাপক, ইতিহাস তেমনি সময়ের মানদণ্ডে মানব-

সময়-ভিত্তিক যোগসূত্র

জীবনের অগ্রগতির বিশ্লেষক। তাই এদিক থেকে পরম সত্যটি হ'ল, "The wheels of history can not be rolled back, nor can the hands of clock be advanced. History must be re-written for each generation, from the ever changing angle of vision caused by the touch of time.

ইতিহাস কাকে বলে—এ সম্পর্কে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত প্রকাশ সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন পণ্ডিত ব্যক্তি ইতিহাসকে নিজ নিজ দৃষ্টি কোণ থেকে বিচার করেছেন। তার ফলে সৃষ্টি হয়েছে নানা মতের। তবে সবগুলো মতামত আলোচনা করলে ইতিহাসের পরিধি বা তার কর্মক্ষেত্র সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা গড়ে তোলা যেতে পারে।

॥ ইতিহাসের পরিধি ॥

॥ Scope of History ॥

ইতিহাসের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে পণ্ডিতগণ কখনো হয়েছেন, ভাববাদী, কখনো বস্তুবাদী, আবার কখনো অতিরিক্ত বিজ্ঞান-সচেতন। এর ফলে ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপটি যেন কেমন সংশয়ের কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়ে যায়। কিন্তু নানা জনের নানা মত থেকেই আমরা ইতিহাসের বিষয়বস্তু, তাঁর ব্যপ্তি ও বিস্তৃতি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করে নিতে পারি।

মানুষের বিবরণ

আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে মানুষই হ'ল ইতিহাসের স্রষ্টা। মানুষের সকল কর্মোদ্যোগই হ'ল ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু এই যে চলমান মানব-জীবন কাহিনী তা কখনোই কোন ব্যক্তি-কেন্দ্রিক নয়, নানা ঘটনার ঘাত প্রতিঘাত, নানা পরিবেশের প্রভাব সেই কোন্ সুদূর অতীত থেকে মানব-জীবন প্রবাহে জীবনীশক্তি যুগিয়ে চলেছে। তাই ইতিহাসকে কেবলমাত্র মানব-জীবন নির্ভর হলেই চলে না। বরং সেই জীবনকে জানবার জন্য তার নিয়ন্ত্রক শক্তি বা প্রভাবগুলোকে নিয়েও ইতিহাসকে পর্যালোচনা করতে হয়।

সাধারণ মানুষের স্থান

অবশ্য কার্লাইল দাবী করেছেন যে, 'the history of what man has accomplished in this world is at bottom the history of great men who have worked here" কিন্তু এই দাবী সর্বাংশে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। মানব সভ্যতার বিবর্তনে ব্যক্তি-বিশেষের অবদান নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। তাই বলে কত অসংখ্য সাধারণ মানুষ তাদের নিজ নিজ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কর্ম-প্রচেষ্টা যুক্ত করেছে এই সভ্যতাকে পরিপূর্ণতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে, তাতো ইতিহাস কখনো বিস্মৃত হতে পারে না। শুধু তাই নয়। ইতিহাসের তিনিইতো স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব যিনি নিজের পুরুষাকারকে নিয়োজিত করেছিলেন এই মানব সমাজকেই অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে। তাই শুধুমাত্র মহামানব বা মহাপুরুষই নয়, সাধারণ মানুষের কথাও ইতিহাসের বিবেচ্য।

যখন সাধারণ মানুষের কথা এল তখন মানুষে মানুষে যে জাতি-গত বৈষম্য তাও ইতিহাসের আলোচ্য বিষয়। কেননা প্রত্যেক জাতিরই আছে কতকগুলো নিজস্ব বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলোই জাতীয় ইতিহাসকে রূপায়িত করে, প্রভাবিত করে। কিন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে বিকশিত তা ইতিহাসের নয়, নৃতত্ত্বের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু ইতিহাস যেহেতু একটি জাতির পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ছাড়া অগ্রসর হতে পারে না সে কারণে ঐতিহাসিককে নৃতত্ত্ববিদের সহযোগিতা সর্বদাই গ্রহণ করতে হয়।

নৃতত্ত্ব ও জাতিগত দিক

মানব-সমাজের জীবনধারা বহুলাংশে নিয়ন্ত্রিত হয় প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা। কিংবা একটি নির্দিষ্ট 'প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলই মানুষের যাবতীয় কর্মের ক্ষেত্র'। সুতরাং সেই প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলকে বাদ দিয়ে মানুষকে জানার চেষ্টা কখনো সার্থক ও সম্পূর্ণ হতে পারে না। একটি বিশেষ জৈবিক প্রয়োজনে প্রাচীনকালের সভ্যতাগুলোর বিকাশ হয়েছিল বিভিন্ন নদীর তীরে। ভৌগোলিক অবস্থিতিই ভারতবর্ষকে একদিকে যেমন বহুদিন পর্যন্ত এক নিশ্চিত নিরাপত্তা দান করেছিল অন্যদিকে তেমনি তাকে বহির্বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল এই পটভূমিকাতেই ভারতবর্ষ প্রাচীনকালে গড়ে তুলেছিল তার নিজস্ব সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও দর্শন। তাই ঐতিহাসিককে অবশ্যই যথেষ্ট ভূগোল সম্পর্কীত জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও ভূগোল

তারপর মানুষ তার নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে তৈরী করেছে ভাষা ও সাহিত্যের, গড়ে তুলেছে ধর্ম ও ধর্মীয় সংগঠন, সৃষ্টি করেছে সমাজ ও সামাজিক সংগঠন, রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনীতি, শিল্প-বাণিজ্য-অর্থনীতি। এইসব বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্য পৃথক পৃথক জ্ঞানের ক্ষেত্র রচিত হয়েছে কিন্তু ইতিহাসের পরিধি এই সবগুলো ক্ষেত্রেই সম্প্রসারিত। জনসন্ যথার্থই বলেছেন, "History with or without the name certainly has been and is a background for other social sciences." কথাটি খুবই স্পষ্ট। এ জীবন যাপন করার জন্য যা কিছু অভিজ্ঞতা আমাদের অর্জিত হয় তাইতো ইতিহাস। তাইতো বলা হয়েছে ইতিহাস হ'ল veritable mine of life experiences.

মানবজীবনের বিচিত্র দিক

এ সব ছাড়াও আরও একটি দিক্ আছে। ইতিহাসকে কখনোই কোন সংকীর্ণ ভৌগোলিক পরিসীমায় বিচার করা চলে না। **সত্যি সত্যিই সে সম্পূর্ণ-অর্থেই আন্তর্জাতিক।** তাই তার আলোচনার দৃষ্টিভঙ্গীও হ'ল আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট। সমগ্র মানব সমাজ যার বিচরণক্ষেত্র তাকে কখনোই কোন ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠের আবেষ্টনীতে বেঁধে ফেলা চলে না।

আন্তর্জাতিক চেতনা

তাই অনন্ত প্রবাহী তার গতিপথের মত ইতিহাসের পরিধিও দিগন্ত বিস্তৃত।

॥ ইতিহাসের দর্শন ॥
॥ Philosophy of History ॥

মূলতঃ জীবন সম্পর্কে মানুষের যে উপলব্ধি তারই প্রকাশই হল দর্শন। এই জীবনকেই বিভিন্ন চিন্তাবিদ বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাই মানুষের জীবনের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে ভিন্ন ভিন্ন দর্শন গড়ে উঠেছে। ইতিহাসকেও ঘিরে বিভিন্ন দর্শন।

এই দর্শনের মূল কথাটি হ'ল **বিশ্বজনীনতার বোধ**। এই দর্শনের দিক দিয়ে হ'ল ইতিহাসচর্চার আর **আলোচ্য বিষয় হ'ল সভ্যতার অন্তহীন প্রবাহ।** কিন্তু সবাই একই দৃষ্টিভঙ্গি নেননি। একই সমগ্রকে পরিস্ফুট করতে গেছেন বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে। তার মধ্যে প্রথমেই আসে কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ বা Speculative approach-এর কথা।

॥ কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ ॥
॥ Speculative Approach ॥

ইতিহাস হ'ল এক অন্তহীন প্রবাহধারা। কোথায় যে তার যাত্রা শুরু হ'ল, কোথায় শেষ—আমরা জানি না। কিন্তু এই যে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ, কোন কোন দার্শনিক এর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য খুঁজে পেতে উৎসাহী হলেন। তাঁদের মতে, "It is perfectly legitimate to speculate on the patterns and laws of historical change; though it is impossible to prove the existence of such patterns and laws with any certainty."

কিন্তু এই দার্শনিকেরা ইতিহাসের ব্যাখ্যা দিতে উৎসাহী হলেন কেন? তাঁদের মনে প্রশ্ন এল, পারস্পরিক সম্পর্কহীন ঘটনাগুলির সমষ্টি যদি ইতিহাস হয় তবে তার তাৎপর্য কি? তাঁরা বললেন, মানুষের ব্যক্তিগত জীবনের যেমন একটা অর্থ থাকে, তেমনি তার জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলি কখনো অকারণ, সম্পর্কহীন হতে পারে না। তা হলে "the sufferings and disasters which historians narrate are pointless and meaningless". তা হলে মানুষ কখনো তার দুঃখ-দুর্দশার বিরুদ্ধে অন্তহীন প্রতিবাদে সংগ্রাম চালাতো না, সব কিছুকেই অদৃষ্ট বলে মেনে নিত। দার্শনিকদের এই প্রশ্ন থেকেই জন্ম নিল ইতিহাসের ভাববাদী দর্শন।

॥ ভাববাদী দর্শন ॥
॥ Idealistic Philosophy ॥

ইতিহাসের ভাববাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠার সার্থক প্রবক্তা হলেন জার্মান দার্শনিক হেগেল। তাঁর মতবাদ পরবর্তীকালের চিন্তা-নায়কদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল।

হেগেলের মতে, বস্তুজগৎ হ'ল অধ্যাত্ম জগতের প্রতিফলনমাত্র। তাই বস্তুজগতের আলোচনা থেকে কিছু নেই। অধ্যাত্ম জগতে যে পরমশক্তি (Absolute)

হেগেলের মতবাদ

তারই পরমইচ্ছায় (Divine will) প্রতিফলিত হয় বস্তুজগৎ। **ইতিহাস হ'ল এই পরমইচ্ছারই আত্মপ্রকাশ। তাই ইতিহাসের কাজ হ'ল, সেই পরমইচ্ছার ক্রমবিকাশের ধারাকে অনুধাবন করা।** এই বিকাশের লক্ষ্য হ'ল স্বাধীনতা বা মুক্তি। বস্তুজগতে রাষ্ট্র গঠনের দ্বারা এই স্বাধীনতা নিজেকে প্রকাশ করে।

হেগেল বিশ্বাস করতেন, ইতিহাসে বিশেষ ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে ঐশ্বরিক কারণেই। সিজার, আলেকজাণ্ডার, নেপোলিয়ন প্রভৃতি যুগ প্রবর্তক ব্যক্তিরা ইতিহাসে

ব্যক্তি

অবশ্য হয়ে আছেন তাঁদের অধ্যাত্ম আলোকপ্রাপ্তির জন্য। কিন্তু এই আলোকও অদৃশ্য অপার্থিব নিয়মে। কেন বা এদের আলোর জন্য দিতেই যেন ঐতিহাসিক শক্তি সক্রিয় থাকে।

হেগেলের মতে, যুক্তি (Reason) এই পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে। **তাই পৃথিবীর**

যুক্তিবাদ

ইতিহাস বলতে আমরা একটি যুক্তিনিষ্ঠ ধারাবাহিক প্রবাহকেই বুঝব। সুতরাং ঐতিহাসিক ঘটনাই এক অদৃশ্য শক্তি-দ্বারা সম্যক নিয়ন্ত্রিত হবে।

হেগেলের এই ভাববাদ পরবর্তীকালের দার্শনিকদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল। যেমন ফিক্টে, ক্রোচে, র‍্যাঙ্কে ইত্যাদি। কিন্তু হেগেলীয় দর্শন থেকেই প্রতিপক্ষ হিসেবে জন্ম নিয়েছিল আর এক দর্শন—বস্তুবাদী দর্শন।

॥ বস্তুবাদী দর্শন ॥

॥ Materialistic Philosophy ॥

বস্তুবাদী দর্শনের প্রবক্তা কার্ল মার্কস্‌ তাঁর বক্তব্য শুরু করেছেন হেগেলীয় দর্শন থেকেই। হেগেলের মত তিনিও দ্বন্দ্বমূলক বিবর্তনে বিশ্বাসী। কিন্তু হেগেল যেখানে এই পৃথিবীকে সেই পরমশক্তির (Spirit) এক বিচিত্র লীলা হিসেবে বিচার করেছেন, মার্কস্‌ সেখানে এই বস্তু জগতকেই প্রাধান্য দিয়েছেন।

মার্কসের মতে, মানুষের অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগের মধ্যেই জীবনের প্রকৃত সত্যটি প্রকাশ। ইতিহাস হ'ল এই কর্মোদ্যোগেরই ধারাবাহিক বিবরণী। তিনি

অর্থনৈতিক কর্মোদ্যোগ

বলেছেন, উৎপাদনের শক্তি ও সম্পর্কের অসমান সংগ্রামের মধ্য দিয়েই সৃষ্টি হয় বিবর্তন ইতিহাস। এই সংগ্রামই হ'ল শ্রেণী সংগ্রাম এবং মানুষের ইতিহাস বলতে বুঝায় শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাসকেই।

মার্কসের দর্শন দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism) নামে পরিচিত। এই দর্শনে বলা হয়েছে **ক্রমিক অগ্রগতিই হ'ল ইতিহাসের চালিকা শক্তি।**

পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে সংগ্রামের মাধ্যমে যে সমন্বয় সাধিত হয় তার উপরই নির্ভর করে অগ্রগতি। মার্কস বললেন, এই বস্তু জগতে তিনটি অবস্থা লক্ষণীয়—থিসিস, এ্যান্টিথিসিস, সিনথেসিস্। থিসিস্ হ'ল যে শক্তি বর্তমানকে ধরে রাখতে চায়। এ্যান্টিথেসিস হ'ল যে শক্তি সেই বর্তমানকে বাতিল করে নতুন অবস্থা সৃষ্টি করতে চায়। এই উভয় বিরোধী শক্তির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আসে সমন্বয় বা সিনথেসিস্।

নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি

মার্কস যখন এই দর্শন প্রচার করেন তখন ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে সমাজের অর্থনৈতিক কাঠামোতে এসেছে এক বিরাট পরিবর্তন। ফলে সেই সময় এই মতবাদ যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে। পরবর্তীকালে এই দর্শনকে কেন্দ্র করে নানা বিতর্কের সৃষ্টি হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে মার্কস ইতিহাসের গতিকে একটি সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন এবং তার ফলে আরও গভীর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে যাচাই করার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

॥ সংস্কৃতি-ভিত্তিক মতবাদ ॥
॥ Cultural Conception ॥

দার্শনিক স্পেঙ্গলার (Spengler) ইতিহাস দর্শনে স্মরণীয় অবদান রেখে গেছেন। তিনি বলেছেন, **কতকগুলো সংস্কৃতির সমন্বয়েই ইতিহাস রচিত হয়। উত্থান ও পতন যেমন প্রাকৃতিক নিয়ম সেই প্রাকৃতিক নিয়মই ইতিহাসের ক্ষেত্রেও কার্যকরী।** তাই দেখা যায় যে কোন সংস্কৃতির স্বাভাবিক উত্থান, তারপর তার পূর্ণ বিকাশ, শেষে তার অনিবার্য পতন। এই গতিপথেই এগিয়ে চলেছে ইতিহাস।

স্পেঙ্গলারের মতবাদ

অধ্যাপক টএনবি ইতিহাস দর্শনের দিক থেকে স্পেঙ্গলার প্রদর্শিত পথেরই অনুসারী। তাঁর রচিত "Study of History" ইতিহাসের এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি।

টএনবি কতকগুলো সভ্যতার উত্থান-পতনের তুলনামূলক আলোচনার মধ্য দিয়ে শুরু করেন। এই আলোচনার মধ্য দিয়ে তিনি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌছান যে ইতিহাস সচেতন ভাবেই এক পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে এবং এই পরিণতিকে লক্ষ্য করলেই প্রত্যেক সভ্যতার যে অনিবার্য পতন তার কারণ উপলব্ধি করা যায়। তাঁর মতে ইতিহাসের পূর্বাপুবৃত্তি যদি সত্যি হয় তা হলে ইতিহাস-বিধি (historical law) প্রণয়ন নিশ্চয়ই সম্ভব, এবং তিনি এই বিধির উপর ভিত্তি করেই পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন। সত্যকে জানা এবং তাকে উদ্‌ঘাটিত করা—এ জন্যই তিনি ইতিহাসকে ব্যবহার করতে চেয়েছেন।

টএনবির অভিমত

॥ আবর্তন-মূলক মতবাদ ॥

॥ Cyclic Conception ॥

আবর্তন-বাদ অনুসারে কতকগুলো জীবন-বৃত্তের মাধ্যমে মানবজাতির ইতিহাস বিবৃত হয়। এই মতবাদ অনুসারে **ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কখনো হয় না। মানুষ তার চলার পথে নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়।** সেখানে পুরানো অবস্থা ফিরে আসার কোন সুযোগই থাকে না। কলিংউড্ এইজন্য বলেছেন, "The cyclical movement is not a mere rotation of history through a cycle of fixed phases ; it is not a circle but a spiral ; for history never repeats itself but comes round to each new phase in a form differentiated by what has gone before."

কলিংউডের অভিমত

এই মতবাদের মধ্য দিয়ে যে সত্যটি পরিস্ফুট হ'ল তা এই যে, বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে উৎকর্ষতা বা অপকর্ষতার অনুসন্ধান একান্তই অবাঞ্ছিত। কেননা প্রতিটি সভ্যতাই নিজস্ব পারিপার্শ্বিকতায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জল।

॥ ঈশ্বর-বাদ ॥

॥ Theistic Conception ॥

এক সময় ইতিহাসকে ধর্মশাস্ত্রেরই অংশ হিসাবে বিচার করা হ'ত। এই মতবাদ অনুসারে, **ঈশ্বরের ইচ্ছা ইতিহাসের মধ্য দিয়েই প্রতিফলিত হয়।** নেবুর, ব্যাটারফিল্ড প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসকে এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিশ্লেষণ করেছেন। ব্যাটার ফিল্ড বলেছেন, "The purpose of life is not in the far future, nor as we so after imagine around the next corner, but the whole of it is here and now, as fully as it will ever be on this planet."

ব্যাটারফিল্ডের মন্তব্য

কিন্তু ইতিহাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রভাব সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাওয়া একান্তই কঠিন। তা ছাড়া ঈশ্বরের গতিবিধি যদি রহস্যময় হয় তবে ইতিহাসের প্রকৃতিও আরও বেশী জটিল ও সংশয়-সংকুল হয়ে ওঠে।

॥ বিবর্তন-বাদ ॥

॥ Evolutionary Conception ॥

ডারউইনের বিবর্তনবাদই ইতিহাসের বিবর্তনবাদী দর্শনের উৎস। এই দার্শনিক মতবাদ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কলিংউডের মতে প্রথমে বিবর্তন বা evolution এবং প্রগতি বা progress এই শব্দ দুটির তাৎপর্যগত পার্থক্য সম্পর্কে স্পষ্ট হতে হবে। তাঁর মতে বিবর্তন বলতে প্রাকৃতিক জগতের কোন পরিবর্তনকেই বুঝায়। অন্যদিকে প্রগতিই হ'ল প্রকৃতির ধর্ম।

কলিংউডের মন্তব্য

কিন্তু মানুষের ইতিহাস কি সদা সর্বদা কোন সুনির্দিষ্ট প্রগতির পথকে মেনে চলে? দার্শনিক কান্ট অবশ্য বলেছেন যে, ইতিহাস তখনই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে যখন ইতিহাস হয় ক্রমশঃ এক উন্নততর অবস্থায় উত্তরণের ধারাবাহিক বিবরণ। প্রকৃত-পক্ষে কান্টের এই বক্তব্যের যৌক্তিকতা সামগ্রিকভাবে মানবজাতির ক্ষেত্রে অংশতঃ খুঁজে পাওয়া যায়।

যাই হোক 'বিবর্তন' শব্দটি যদি ইতিহাসের গতিপথকে সর্বাংশে ব্যাখ্যা করতে না পারে তাহলে আমরা বিবর্তনের পরিবর্তে 'ঐতিহাসিক পরিবর্তন' বা Historical change শব্দটি বেছে নিতে পারি। কারণ নিয়মিত তো কত ঘটনাই ঘটে চলেছে। ঐতিহাসিক পরিবর্তন **কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সব ঘটনাই প্রগতিশীল নয়, শুধু পরিবর্তনশীল হতে পারে**। উদাহরণ, যেমন ফরাসী বিপ্লব। এই বিপ্লব এমন এক ঘটনা যা সমগ্র মানবজাতি এই অপ্রতিরোধ্য প্রগতির পথের নির্দেশ দিতে পারে। কলিংউড্ তাই যথার্থই বলেছেন, "Progress is not the replacement of the bad by the good but of the good by the better." বিশেষ করে ইতিহাসের ক্রমবিকাশ যখন নির্ভর করে ঘটনার পারম্পর এবং ধারাবাহিকতার উপর।

॥ নিয়তিবাদ ॥
॥ Determins ॥

কেউ কেউ আবার ইতিহাসের প্রতি ঘটনার ভেতর এক অনিবার্যতার সন্ধান পেয়েছেন। তাঁদের মত অনুসারে, "Determinism is the belief that every-thing that happens has a cause and could not have happened differ-ently, unless something in the cause or causes had also been different." মূলকথা এই মতবাদ অনুযায়ী, ইতিহাস শুধুমাত্র নৈর্বক্তিক নয়, কতকগুলো সুনির্দিষ্ট নিয়মের অধীন। এবং এই নিয়মাবলী ইতিহাসের সমস্ত ঘটমানতাকে চলমানতাকে নিয়ন্ত্রণ করছে।

কিন্তু মানুষতো মূলতঃ স্বাধীনচেতা। তার নিজস্ব চিন্তা চেতনাই যে কোন কর্মোদ্যোগের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু। সেক্ষেত্রে কতকগুলো নির্ধারিত নিয়মকানুন কেমন করে মানুষের জন্মগত স্বাধীন সত্তাকে বেঁধে ফেলতে পারে?

এর সঙ্গে রয়েছে মানুষের সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা। আমাদের দৃষ্টি পথে কিছু ঘটে গেল, আমরা তখুনই জানতে চাই, ঘটনাটি ঘটলো কেন? যখন আবার কারণ আবিষ্কৃত হ'ল তখন জানতে চাই, ঘটে যাওয়া ঘটনাটি যদি আদৌ না ঘটতো তাহলে কি হতে পারতো। এভাবেই আমরা আমাদের অনন্ত কৌতূহলকে চরিতার্থ করে চলেছি এবং ইতিহাসে এর একটি নিশ্চিত প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। যেমন ধরা যাক্ মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মত বিরোধ যদি না হ'ত কিংবা হলেও সেই

মত-বিরোধের মধ্যে যদি কোন সমঝোতার সূত্র খুঁজে পাওয়া যেত তা হলে ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস কি এক ভিন্ন বর্ণে চিত্রিত হ'ত না? ইতিহাসকে বিশ্লেষণ করার জন্য যুক্তি-তর্কের জাল বিছানো এই পরিক্রমাকে এক অকারণ আবেগপ্রধান অলসতা বলে নস্যাৎ করে দেবার কোন কারণ নেই, বরং ইতিহাসের চলমানতার অনেক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিকে এই বিশ্লেষণ-ভংগিমাই আলোকপাত করতে পারে।

সীমাহীন কৌতূহল

এই নিয়তিবাদের বিরোধিতা করেই বলা যায় যে যখন সত্যি সত্যিই ইতিহাসে কোন সুনির্দিষ্ট কারণের অনুপস্থিতি রয়েছে কিংবা কোন ঘটনার শিক্ষা থেকে অন্য কোন ঘটনার ব্যাখ্যাও অত্যন্ত দুরূহ তখন **ইতিহাস হ'ল কতকগুলো আকস্মিকতার ফলশ্রুতি বা যোগফল।** যদি আমরা ইতিহাসকে কার্যকারণের সূত্রে বাঁধতেই না পারি তা হলে বহু আকস্মিকতার সম্মিলনই হয়ে দাঁড়ায় ইতিহাস।

ইতিহাসে আকস্মিকতা

কিন্তু এরকম চিন্তাধারারও একটি উল্টো দিক রয়েছে। যেখানেই আমাদের বিশ্লেষণী সামর্থ্য নাগাল পায় না সেখানেই নিজেকে আকস্মিকতার শিকার হতে দেওয়া তো নিজের অক্ষমতারই পরিচায়ক। তা ছাড়া প্রতিটি ঘটনার পেছনে কতরকমের স্বার্থচিন্তা পারিপার্শ্বিকতা কাজ করে চলেছে। এটা হতেই পারে যে সমস্ত জটীলতা হয়তো বা আমাদের অনুধাবনের অগোচরেই রয়ে গেল। আর রয়ে গেল বলেই সেখানে আকস্মিকতা এ যুক্তি কখনোই মেনে নেওয়া চলে না। "It is essential to realise that the world is very complicated and what we fail to understand cannot be attributed to chance.

এই মতের বিরোধিতা

আসল কথা হ'ল, সাধারণভাবে জীবনের ক্ষেত্রে যেমন ইতিহাসের ক্ষেত্রেও তেমনি দর্শনের শেষ কথাটি আজ অবধি অব্যক্তই রয়ে গেল। এতক্ষণ ইতিহাস সম্পর্কীত যে সব চিন্তাধারা আলোচিত হ'ল তার কোনটাকেই আমরা সর্বব্যাপী একমাত্র সত্য বলে মেনে নিতে পারি না, যদিও তার প্রত্যেকটি ইতিহাসের কোন না কোন দিক সম্পর্কে আলোকপাত করছে। Dilthey যথার্থই বলেছেন, "There is nothing like the meaning of life or of history and if there were, it would not concern the historian in his research. But on the other hand, there is, in a quite unmysterious way, meaning everywhere in life and it is with this kind of meaning that the historian too is concerned." কিন্তু আমরা জীবন বলতে কি বুঝি? জীবন হ'ল বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি। যে কোন অভিজ্ঞতার মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, কতকগুলো চিন্তাধারা থেকে সৃষ্টি হয় বিভিন্ন অনুভূতির আর বিভিন্ন অনুভূতি বিচিত্র কমোদ্দীপনায় প্রকাশিত হয়

উপসংহার: সকল মতের সমন্বয়

বিভিন্নরূপে এবং এই বিভিন্ন রূপই তো হ'ল আমাদের অভিজ্ঞতার সম্পদ্। সুতরাং পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে আমাদের যত বেশী সংঘাত তত বেশী অভিজ্ঞতার পুঁজির বৃদ্ধি এবং তত বেশী জীবনের পরিপূর্ণতা লাভ। তাই বলা হয়েছে, "This human world permeated with meaning is the subject matter of the human studies. In its temporal extension it is the subject matter of history." সে কারণেই মানুষের অতীত, বর্তমান ভবিষ্যৎও নিরবচ্ছিন্ন ভাবে পরস্পরের পশ্চাতে ধাবমান এবং এই গতিবেগই আমাদের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারকে নিয়তই সমৃদ্ধ করে চলেছে। ঐতিহাসিকের কাজই হ'ল, এই অভিজ্ঞতা এবং অভিজ্ঞতা থেকে অর্জিত ফলশ্রুতির সঠিক মূল্যায়ন করা। সেক্ষেত্রে কোন একটি নির্দিষ্ট দার্শনিক চিন্তা ঐতিহাসিকের বহুমুখী ও বিচিত্র কর্মভার বহনে এককভাবে সাহায্য করতে পারে না।

অভিজ্ঞতাই মূলকথা

॥ ইতিহাসের স্বরূপ—কলা না বিজ্ঞান ॥

॥ Nature of History—art or Science ॥

যদি কোন দার্শনিক মতবাদ ইতিহাসের স্বরূপ সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারিত ক'রে দিতে না পারে তখনই প্রশ্ন আসে, তা হলে ইতিহাসের ক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? ইতিহাসকে আমরা কেমন করে গ্রহণ করবো? একটি বিজ্ঞান না কলা বিষয়ক বিষয় হিসেবে?

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে ঐতিহাসিক বিউরি খুব স্পষ্ট করে জোরের সঙ্গেই বললেন, "History is a science, no less and no more," এ কথাটাকেই আর একটু ব্যাখ্যা করে গলব্রেথ বললেন, "By science, we mean a body of Knowledge that seeks to tell the truth the whole truth and nothing but the truth." ইতিহাসের কাজও তো প্রকৃতপক্ষে তাই—অতীতের গর্ভ থেকে সত্যের অনুসন্ধান, সত্যের আবিষ্কার এবং সত্যের প্রতিষ্ঠা।

বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত

বস্তুতঃ ইতিহাসকে বিজ্ঞানের মর্যাদায় অভিষিক্ত করার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে **ঊনবিংশ শতাব্দী** থেকেই। বিজ্ঞান-চেতনার অনুপ্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে জার্মান ঐতিহাসিক নেবুর রোমের ইতিহাস রচনা করেছিলেন। পরবর্তীকালে র‍্যাংকে স্টাব্‌স, গার্ডিনার, মেটল্যাণ্ড, টাউট্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণ এই নতুন পথে ইতিহাস রচনায় ব্রতী হলেন।

নতুন পথ: নেবুর

কিন্তু আসল সমস্যাটি অন্যত্র। বিজ্ঞানের ধর্মই হ'ল, সঠিকতা, নির্ভুলতা, তথ্যনির্ভরতা এবং ব্যক্তিনিরপেক্ষতা। বৈজ্ঞানিকের সিদ্ধান্ত সর্বজন স্বীকৃত এবং প্রমাণগ্রাহ্য। এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানের **সুস্পষ্ট সূত্র সর্বদেশে সর্বকালে সমানভাবে প্রযোজ্য।** বিজ্ঞানের এই চারিত্রিক

বিজ্ঞানের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য

মানদণ্ডে ইতিহাসকে যাচাই করে তাকে কি আমরা বিজ্ঞান আখ্যায় ভূষিত করতে পারি ?

প্রথম কথা হ'ল, **বিজ্ঞান হবে ব্যক্তি নিরপেক্ষ।** বৈজ্ঞানিকের নিজস্ব বিশ্বাস, সংস্কার বা উচ্ছ্বাসের কোন স্থান বিজ্ঞানের কাছে নেই। কিন্তু ইতিহাস কি কখনো এতটা ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পেরেছে? তাই যদি হ'ত তাহলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে এত মতদ্বৈধতার সৃষ্টি হ'ত না। যেমন ভারতের ইতিহাসে সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ নিয়ে কিংবা উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ নিয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। অবশ্য **ইতিহাস চর্চার একটি বিধি হিসেবে ব্যক্তিনিরপেক্ষতা স্বীকৃত হলেও কর্মক্ষেত্রে কোন ঐতিহাসিকই সম্পূর্ণ ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে পারেন না।** তার তা হওয়া সম্ভবও নয়। কারণ অতীতের পরিবেশ ঐতিহাসিকের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। ঐতিহাসিক বিক্ষিপ্ত তথ্য রাশি সংকলন করেন। তারপর আপন কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে অতীতকে নতুনভাবে গঠন করেন। সেক্ষেত্রে **যে বর্তমানে ঐতিহাসিক বেঁচে আছেন সেই বর্তমানের চিন্তা-চেতনা-মূল্যবোধকে সর্বতোভাবে বর্জন করে সর্বাংশে অতীতচারী হওয়ার প্রয়াস কখনোই সার্থক হতে পারে না।**

ব্যক্তি-নিরপেক্ষতা

দ্বিতীয় প্রশ্ন হল, ইতিহাসের প্রয়োগগত দিক। **ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয়েই তথ্যনির্ভর।** বৈজ্ঞানিককে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, বিশ্লেষণ করতে হয়, বিচার করতে হয়, তারপর একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌছাতে হয়। ঐতিহাসিকও ঠিক এই পদ্ধতিরই অনুসারী। বৈজ্ঞানিক যেমন কোন অনুমান বা hypothesis-এর উপর নির্ভর করে এক নতুন সত্যের সন্ধান পেয়ে যায়, তেমনি ঐতিহাসিকও কোন নবলব্ধ তথ্যের উপর ভিত্তি করে সর্বসিদ্ধান্ত বাতিল করে নতুন সত্য প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রয়োগগত দিক থেকে সাদৃশ্য

কিন্তু প্রয়োগগত এই সাদৃশ্যই সবটুকু নয়। কেননা বৈশাদৃশ্য অননুভূত নয়, বরং যথেষ্টই স্পষ্ট। কারণ অন্যান্য ব্যবহারিক বিজ্ঞানের মত বিজ্ঞান ইতিহাস নয়, **ইতিহাস হ'ল science of cirticism বা সমালোচনার বিজ্ঞান।** তাই বিজ্ঞানের তথ্যগুলোকে যেখানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে, **ইতিহাসের তথ্যগুলো সেখানে পরস্পরের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।** বরং এক্ষেত্রে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করলেই তথ্যগুলো তাদের নিজস্ব তাৎপর্য হারিয়ে ফেলে। এ ছাড়াও **ইতিহাসে যেহেতু কার্য কারণ সম্পর্কটা হ'ল একটা বড় কথা, সেহেতু প্রতিটি তথ্যের সঙ্গে প্রতিটি সম্পর্ক তো খুবই স্বাভাবিক।** দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানের

প্রয়োগগত দিক থেকে বৈসাদৃশ্য

(১) পারস্পরিক সম্পর্ক

(২) কার্য-কারণ সূত্র

তথ্য সর্বদাই দৃষ্টিগ্রাহ্য, প্রত্যক্ষ এবং পরীক্ষাযোগ্য। কিন্তু **ইতিহাসের তথ্য দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়, প্রত্যক্ষও নয়।** তাই ইতিহাসের তথ্য ঐতিহাসিকের কাছে অদৃশ্য। কিন্তু বৈজ্ঞানিকের তথ্য অদৃশ্য হলেও তার অস্তিত্ব নিশ্চয়ই থাকে, কেননা এই অস্তিত্ব আছে বলেই বৈজ্ঞানিক সত্য বারংবার পরীক্ষার মাধ্যমে প্রশ্নাতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তৃতীয়তঃ সত্যের অনুসন্ধান যদিও ইতিহাস ও বিজ্ঞান উভয়েরই মূলমন্ত্র, তথাপি **ঐতিহাসিক সত্য যেন অনেকখানি আপেক্ষিক।** কারণ ঐতিহাসিক সত্য নির্ধারণে অনুসন্ধানকারীর নিজস্ব অনুভব ও মানসিকতার প্রভাব তো অনস্বীকার্য। তাই রিক্‌ম্যান যথার্থই বলেছেন, "History deals with sequence of events, each of them unique, while science is concerned with the routine appearance of things and aims at generalisations and the establishment of regularities governed by lows." চতুর্থতঃ **বৈজ্ঞানিক যেখানে তার গবেষণার ফলশ্রুতি সম্পর্কে পূর্বাহ্ণেই মত প্রকাশ করতে পারেন, ঐতিহাসিকের পক্ষে তা সম্ভব নয়।** কারণ "Historians are not prophets but "a study of the history of a country or a movement does put us in a better position to forecast its future. The scientist concentrates his attention on extracting general truths and thus he is in a position to predict ; the historian is engrossed in the peculiarities of a particular event and thus he cannot predict." এই প্রসঙ্গেই অধ্যাপক পপার Historicism শব্দটি ব্যবহার করেছেন। তাঁর মতে **মানুষের ইতিহাস জ্ঞান-ভাণ্ডারের সমৃদ্ধির দ্বারা নিয়তই পরিবর্তিত হচ্ছে। সেক্ষেত্রে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোন রকম ধারণা করা অথবা ভবিষ্যৎ—প্রবাহ সম্পর্কে কোন সুনিশ্চিত মতামত প্রকাশ করা ঐতিহাসিকের পক্ষে কখনো সম্ভব নয়।**

(৩) ঐতিহাসিক তথ্য

(৪) ঐতিহাসিক সত্য

এসব বৈসাদৃশ্য সত্ত্বেও ইতিহাস কতদূর বিজ্ঞান তা আমরা অনুধাবন করতে পারি দুই ধরনের চিন্তাধারা থেকে—একটি হ'ল আদর্শবাদী চিন্তা (Idealist thinking), অপরটি হ'ল দৃষ্টবাদী চিন্তা (Positivist thinking)।

আদর্শবাদী চিন্তাধারার মূল প্রবক্তা হলেন অধ্যাপক কলিংউড্। তিনি বলছেন, ইতিহাস হ'ল একটি সুশৃঙ্খল পাঠচর্চা। সেই দিক থেকে **ইতিহাস এমন মূর্ত বিজ্ঞান (concrete science) যার কর্মক্ষেত্র হ'ল ক্রমপ্রসারমান মানুষের অভিজ্ঞতা-রাশি।** প্রকৃতপক্ষে ঐতিহাসিক এই সব অভিজ্ঞতাকে নবজন্ম দান করেন। এবং এই যে কল্পনা-নির্ভর নবজন্মদান এটাই হ'ল ঐতিহাসিক চিন্তাধারার কারু-কার্য। তাই ইতিহাস অনুভব দ্বারা উপলব্ধি নির্ভর। কলিংউড্ বলছেন, যে কোন ঘটনার পেছনে আছে দুটো দিক—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ ঘটনাটির বাইরের পরিচয় বহন করে,

আদর্শবাদী মতবাদ

আর অন্তরঙ্গ দিক ঘটনাটির সঙ্গে যুক্ত মানুষের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিচয় দেয় এবং "an action is the unity of the outside and inside factors of an event." তাই ঐতিহাসিককে যদি কোন অতীত অভিজ্ঞতাকে নবজন্ম দান করতে হয় তবে অবশ্যই তাকে সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে যুক্ত বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। এইভাবে **ইতিহাসের আদর্শবাদী চিন্তাধারা অতীত সম্পর্কে এক সহমর্মিতার মনোভাব গড়ে তুলতে আমাদের উৎসাহিত করে।**

এর অপরদিকে রয়েছে দৃষ্টবাদী চিন্তাধারা। এই চিন্তাধারার প্রবক্তাগণ ইতিহাসকে সর্বাংশে বিজ্ঞানের স্তরে উন্নীত করতে উৎসাহী। তাঁদের মতে বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সঙ্গে ইতিহাসের চিন্তাধারার কোন বিরোধ নেই। তাই তাঁরা চান বিজ্ঞানের মত ইতিহাসের কতকগুলো বিধি (Law) প্রণয়ন করতে।

দৃষ্টবাদী মতবাদ

এরই ফলশ্রুতি হ'ল, ১৯২৩ সালে আমেরিকার ইতিহাস সংস্থায় Edward P. cheyney ঘোষণা করলেন ইতিহাসের বিধি আছে এবং থাকবেই। শুধু তাই নয়, তিনি ছয়টি বিধি ঘোষণাও করলেন। যথা:—(১) নিরবচ্ছিন্নতা বা Law of Continuity, (২) পরিবর্তনশীলতা বা Law of change, (৩) পারস্পরিক নির্ভরশীলতা বা Law of interdependence, (৪) গণতান্ত্রিকতা বা Law of democracy, (৫) স্বেচ্ছা প্রণোদিত সম্মতির বিধি বা Law of free consent এবং (৬) নৈতিক প্রগতির বিধি বা Law of moral progress.

যাই হোক স্বপক্ষে বিপক্ষে এমন ভাবে বহু যুক্তির অবতারণার পরেও আজ পর্যন্ত এই প্রশ্ন অমীমাংসিত, ইতিহাস বিজ্ঞান কি না, কিংবা না হলে কতটুকু বিজ্ঞান। যেহেতু ইতিহাস ঐতিহাসিকের সৃষ্টি এবং ঐ ঐতিহাসিক তাঁর গবেষণাকালে নিজের ব্যক্তিসত্বাকে সর্বতোভাবে অবজ্ঞা করে নিজেকে বিলীন করে দেবেন অতীত গর্ভে যেহেতু এমনটা কখনোই সম্ভব নয়, সেই হেতু সম্পূর্ণ আক্ষরিক অর্থে নিরপেক্ষ ইতিহাস হতেই পারে না। এইজন্যেই ক্রোচে বলেছেন যে ইতিহাস সর্বদা বর্তমানের চিন্তাই প্রতিফলিত। এবং এটাই স্বাভাবিক। কারণ ঐতিহাসিকের মনোজগতের বিষয় অতীত হলেও বাইরের যে বর্তমানে তিনি বাস করেন তাকে অস্বীকার করবেন কি করে? ইতিহাস ব্যক্তিনিরপেক্ষ এবং তথ্যনির্ভর এই বক্তব্যকে উপহার করে জেন্টিল বলেছেন: "The historian in short knows well enough that the life and meaning of past facts is not to be discovered in charters or inscriptions or in any actual relics of the past ; their source is in his own personality."

উভয় মতবাদের আপোষ রফা

কিন্তু সমস্ত মতদ্বৈধতার ঊর্ধ্বে, ইতিহাস রচনার এমন কতকগুলো ক্ষেত্র রয়েছে যে সব ক্ষেত্রে শুধু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতাই নয়, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও প্রয়োগ করা যেতে পারে। সেইক্ষেত্রগুলি যেমন, বিভিন্ন গণআন্দোলনের স্বরূপ এবং পরবর্তী কালে

তাদের প্রভাব, বিভিন্ন জাতীয় জীবনে নিজস্ব ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের প্রতিক্রিয়া কিংবা গণমানসিকতা বিকাশে সমসাময়িক সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রতিফলন ইত্যাদি। এসব ক্ষেত্রে বিচার্য বিষয় এতটা নৈর্ব্যক্তিক যে ঐতিহাসিক ঠিক পটভূমিকাকে আবিষ্কার করতে না পারলে সামগ্রিক পরিস্থিতিও তাঁর অনুধাবনের বাইরেই থেকে যায়। এবং প্রেক্ষাপট বিচারের উদ্যোগ থেকেই জন্ম নিয়েছে মার্ক্সীয় দর্শন।

ব্যক্তি-নিরপেক্ষতার ক্ষেত্র।

এতক্ষণ যে আলোচনা হ'ল তা হ'ল ইতিহাস আবিষ্কার সম্পর্কীত। কিন্তু ইতিহাস আবিষ্কার করেই ঐতিহাসিকের দায়িত্ব শেষ হ'ল না। তার পরবর্তী দায়িত্ব হ'ল, না। তার পরবর্তী দায়িত্ব হ'ল, আবিষ্কৃত তথ্যকে নির্ভরযোগ্য, বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়-গ্রাহী করে পরিবেশন করা। এটাও কম বড় দায়িত্ব নয়। কেননা যে তথ্য আমাদের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়, তাকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য করে তোলা—সেটা খুব কম নৈপুণ্যের কাজ নয়। ঠিক এই জায়গাতেই ঐতিহাসিককে হতে হয় মানব-মনের এক সুনিপুণ লিপিকার। এই প্রসঙ্গেই জর্জ ট্রেভেলিয়ান মন্তব্য করেছেন, ইতিহাস একই সঙ্গে বিজ্ঞান ও কলা। ইতিহাস বিজ্ঞান, কেননা তথ্যের সূক্ষ্ম বিচার ও বিশ্লেষণ এবং সেই সঙ্গে কলাও, কেননা পরীক্ষিত তথ্যের মর্মস্পর্শী বহিপ্রকাশ। তাই গ্রীক Historia শব্দটির অর্থ সত্যানুসন্ধান আর Historiography শব্দটির অর্থ ইতিহাস রচনাশৈলী।

ইতিহাসের প্রকাশ-ভঙ্গী

যাই হোক ইতিহাস কতখানি বিজ্ঞান আর কতখানি কলা—এ প্রশ্ন আজ অবধি নিরুত্তর। এবং **অতি সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছে, ইতিহাস চয়নে আমরা যত বেশী বিজ্ঞান-নির্ভর, ইতিহাস পরিবেশনায় আমরা তত বেশী কলানুরাগী**। যেন এক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে, বিজ্ঞান রূঢ় কাঠিন্যকে কলা চর্চার মাধুর্যরসে অধিকতর সুখকর করে তোলার। তাই ইতিহাস বিজ্ঞান না কলা—নিরবধি কাল এ প্রশ্ন অপেক্ষিতই থেকে যাবে উত্তরের প্রতীক্ষায়।

॥ ইতিহাস রচনাশৈলী ॥
॥ Historiography ॥

ঐতিহাসিককে লিপিকার হতে হবে, হতে হবে পাঠককে মোহিত করার মত অতীতের সুদক্ষ সুনিপুণ ভাষ্যকার। কিন্তু তাই বলে বন্ধনহীন কল্পনা কখনো তার সম্বল হতে পারবে না, কিংবা মানব-মনকে শুধুমাত্র মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার তাগিদে সত্যকে বিকৃত করা চলবে না। সুতরাং ইতিহাস রচনাশৈলী এক সূক্ষ্ম শিল্প চর্চা। এবং এই শিল্প চর্চার কারুকার্যগুলোকে বুঝতে হলে আমাদের জানতে হবে ইতিহাস চর্চার সঠিক পদ্ধতি কি, ইতিহাসে নৈর্ব্যক্তিকতা শুধু তাত্ত্বিক বক্তব্য না সত্যিকারের কোন ভূমিকা রয়েছে প্রভৃতি বিষয়গুলো। আমরা এবার এই সব বিষয়গুলোই আলোচনা করছি।

॥ ইতিহাস চর্চার পদ্ধতি ॥

॥ Historical Method ॥

অতীত তো কখনো ফিরে আসে না। আর ঐতিহাসিকের এমন কোন একান্তই নিজস্ব শক্তি থাকে না যার সাহায্যে তিনি অতীতকে দেখতে পারেন। তবু সেই লুপ্ত অতীতকে নিয়েই ঐতিহাসিকের কাজকর্ম। কিন্তু সে কাজ কেমন করে সম্ভব?

বিচিত্র এবং বিভিন্নভাবে অতীত নিজের আংশিক পরিচয় রেখে যায় বর্তমানেও। সেই পরিচয় পাওয়া যায় ধ্বংসাবশেষ থেকে, রাষ্ট্রীয় দলিল এবং উপকরণ বিদেশীদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত থেকে, প্রচলিত মুদ্রা থেকে, ব্যবহার্য জিনিসপত্র থেকে, কাব্য-কাহিনী থেকে। তা ছাড়া রয়েছে আরও কত বিচিত্র উপাদানের সম্ভার।

কিন্তু প্রশ্ন হ'ল এতো যে বিচিত্র উৎপাদনের প্রাচুর্য এর মধ্য থেকে ঐতিহাসিক ইতিহাসকে আবিষ্কার করেন কি করে? এই কাজ ত্রিমুখী। প্রথম **তথ্য সংগ্রহ** দ্বিতীয় সংগৃহীত তথ্যের **বিশ্লেষণ**, তৃতীয় সংগৃহীত তথ্য সমূহের মধ্যে **সমন্বয় সাধন**।

প্রথমে ঐতিহাসিক অতীতের কোন একটি বিশেষ সময়কে চিহ্নিত করে নিজের গবেষণার ক্ষেত্র হিসেবে। তারপর আরম্ভ হয় তার তথ্য সংগ্রহের কাজ। ইতিহাসের তথ্যগুলোকে আমরা সাধারণভাবে দুটো ভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যথা **মৌলিক উপাদান বা primary source এবং অমৌলিক** তথ্যসংগ্রহ **উপাদান বা Secondary source.** মৌলিক উপাদান বলতে বুঝায় সেই সব উপাদান যা ঐতিহাসিকের গবেষণার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এর উল্টোটাই হ'ল অমৌলিক উপাদান। দ্বিতীয় শ্রেণীর উপাদানের সত্যাসত্য যাচাই যেহেতু খুব সহজ সাধ্য নয়, সেইহেতু **ঐতিহাসিক সর্বদাই সচেষ্ট থাকেন যতটা সম্ভব মৌলিক উপাদান সংগ্রহ করতে।**

তথ্য সংগ্রহের পর ঐতিহাসিকের দ্বিতীয় কাজ হ'ল সংগৃহীত তথ্যের মূল্যায়ন, তার সত্যাসত্য যাচাই। এ কাজ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পর্যায়তেই স্থির হয়ে যাবে **ঐতিহাসিক কোন্ কোন্ উপাদান নিয়ে তার গবেষণার কাজে অগ্রসর হবেন এবং এই সব উপাদানের ভিত্তিতেই** মূল্যায়ন **ইতিহাস রচিত হবে**। তাই এই স্তরের কাজ শেষ করতে ঐতিহাসিককে যথেষ্ট বিচক্ষণ এবং সুনিপুণ হতে হয়। এই দায়িত্ব পালনে **ঐতিহাসিক সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন**। এই সমালোচনা দ্বিমুখী —একটি বাইরের সমালোচনা বা external criticism, অপরটি আভ্যন্তরীণ সমালোচনা বা internal criticism. বাইরের সমালোচনা বলতে বুঝায় উপাদান-গুলোর ভেতর কোন বঞ্চনা, কোন প্রক্ষেপণ কোন অসত্য কিছু আছে কি না তা

বিচার করা। এই স্তরে সর্বদাই মনে রাখতে হবে "Historical facts have in every case to be established ; they are never simply given." যাই হোক উপাদানগুলোকে প্রাথমিক ভাবে বেছে নেবার পর আরম্ভ হয় আভ্যন্তরীণ সমালোচনার কাজ। এই কাজ অধিকতর জটিল এবং দুরূহ। কারণ এক্ষণে ঐতিহাসিকের বিচার্য, সংগৃহীত তথ্যের সূত্র বা উৎসটি বিশ্বাসযোগ্য কি না, নির্ভরযোগ্য কি না। যদি ঐতিহাসিক কোন লিখিত উপাদান নিয়ে কাজ করবেন স্থির করেন তবে তার বিপদ আরও বেশী। কারণ ঐতিহাসিককে বুঝতে হবে লিখিত উপাদানের লেখকের মানসিকতা, লেখক কতখানি ব্যক্তি-সাপেক্ষ, কতখানি ব্যক্তি-নিরপেক্ষ, লেখক যে অর্থ প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন তার লিখিত বিবরণের মধ্য দিয়ে তার কতটা বিবরণে পরিস্ফুট ইত্যাদি সব দিক। এই সব বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে ঐতিহাসিক তার উপাদান সম্পর্কে যে সিদ্ধান্তে এসে পৌছান তা আবার নির্ভুল হ'ল কি না তা যাচাই করার জন্য ঐতিহাসিককে অন্যান্য উপাদানের সঙ্গে তার সিদ্ধান্তকে তুলনা করে দেখতে হবে। অবশ্য এই তুলনামূলক যাচাই-এর কাজটি সব সময় করা সম্ভব নাও হতে পারে। কেন না ইতিহাসে এমন অনেক সময় আছে যে সময়ে যথেষ্ট সংখ্যক উপাদানই পাওয়া যায় না। সেক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচারের সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। দ্বিতীয় পর্যায়ে ঐতিহাসিকের কাজ কলিংউড খুব সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করে বলেছেন : The historian is like a detective, investigating a case. He begins by deciding what the undisputed fact is and builds his theories around that. He should be ready to give up even his fundamental fact when new evidence comes to his notice.

এরপর তৃতীয় পর্যায় -সংগৃহীত তথ্য সমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধন। এই পর্যায়ের যা কিছু করণীয় সবই ঐতিহাসিকের একান্তই নিজস্ব, স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। এই স্তরে প্রথমে ঐতিহাসিক বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করেন। তারপর নির্বাচিত উপাদান সমূহকে গুরুত্ব অনুসারে **বিন্যস্ত বা শ্রেণী বিভাগ** করা হবে। এইবার উপাদান-সমূহের উপর ভিত্তি করে ইতিহাসের গতি-পথের **উৎস আবিষ্কারের** চেষ্টা চলবে এবং এই আবিষ্কারকেই কেন্দ্রবিন্দু করে রচিত হবে ইতিহাস। এই বিস্তৃত ও ব্যাপক কর্মসূচীকেই সামগ্রিক অর্থে বলা হয়েছে **সমন্বয় সাধনের কাজ**।

সমন্বয়-সাধন

স্বভাবতঃই এই স্তরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে ব্যক্তিবৈষম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কারণ একটি দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ঐতিহাসিক তার গবেষণা কার্যে মনোনিবেশ করেন এবং স্বাভাবিক কারণেই সেই দৃষ্টিভঙ্গী তার কর্মধারাকে প্রভাবিত করে। তাই জন্সন্ বলেছেন "It has become an axiom that each generation must rewrite the history written by preceding generation." ঐতিহাসিকের জাতীয় চেতনা,

তার ধর্মীয় বিশ্বাস, তার সামাজিক মূল্যবোধ কিংবা তার রাজনৈতিক আদর্শ তার জ্ঞাতসারে অথবা অজ্ঞাতসারে তার চিন্তাচেতনা এবং সেই চিন্তা-চেতনা প্রকাশ-ভঙ্গীমাতে উপস্থিত থেকে যায়।

কিন্তু তাই বলে ঐতিহাসিক কখনো ইতিহাসের মৌল সত্য থেকে সরে যেতে পারেন না। সেই মৌল সত্যটি কি? যে পরিবর্তনশীলতাই হ'ল ইতিহাসের প্রাণশক্তি সেই পরিবর্তনের ধারাবাহিকতা ও নিরবচ্ছিন্নতাই হ'ল মৌল সত্য। ঐতিহাসিককে এই মৌল সত্যটাই আবিষ্কার করতে হয়। কিন্তু পরিবর্তন বলতে আমরা কি বুঝি? এই প্রসঙ্গে আমাদের পরিবর্তন বা change, প্রগতি বা development এবং উন্নয়ন বা progress এই তিনটি শব্দের অন্তর্নিহিত পার্থক্যটুকু আমাদের হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। প্রথমে পরিবর্তন বল্‌তে বুঝায় চলমান অবস্থার রকমফের। এই রকমফেরের ফলাফল ভালমন্দ দুইই হতে পারে। কিন্তু প্রগতি শব্দটির মধ্যে রয়েছে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির ব্যঞ্জনা, যে অগ্রগতি সর্বদাই ঊর্ধ্বমুখী। জন্‌সন্ শব্দটিকে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে বললেন, "From the point of view of development, nothing ever was or is ; everything was or is in a state of becoming." অন্যদিকে উন্নয়ন শব্দটি যেন কেবল মাত্র শুভফল প্রত্যাশী। কিন্তু মানব-সমাজ তো পূর্ব-নির্ধারিত গতিপথ মেনে চলে না। সমাজকে চলার পথে কত ঝড়-ঝঞ্ঝা, বাধা-বিঘ্ন, ভাল-মন্দের, চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে আপন যাত্রাপথটুকুকে অব্যাহত রাখতে হবে।

ইতিহাসের মৌল সত্য

তাহলে শব্দ তিনটির ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে দেখা গেল, **প্রগতি বলতে যা বুঝায় তা নিয়েই ঐতিহাসিকের কাজ-কারবার**। কিন্তু অহরহ তো কত ঘটনাই ঘটছে। সব ঘটনাই কি ঐতিহাসিকের কাছে সমান তাৎপর্যপূর্ণ? সেই ঘটনাই ঐতিহাসিকের গ্রহণীয় যা প্রগতি শব্দটির ব্যাখ্যার সঙ্গে যথোচিত সামঞ্জস্য রক্ষা করে। অবশ্য এই ক্ষেত্রে ঘটনা বাছাই-এর প্রয়োজনে ঐতিহাসিক নিজস্ব চিন্তা-চেতনা, বিশ্বাস দ্বারা পরিচালিত হতে পারেন এবং এই প্রভাবের প্রতিবন্ধকতার মধ্য দিয়ে যেহেতু রচিত হয়ে থাকে ইতিহাস সেই হেতু বহুজনের প্রবল আপত্তি, সম্পূর্ণ অর্থে ইতিহাসকে বিজ্ঞান আখ্যা দিতে। তাই বারংবার বলা হয়, ঐতিহাসিককে যতটা সম্ভব ব্যক্তি-নিরপেক্ষ হতে হবে।

॥ ইতিহাসে নৈর্ব্যক্তিকতা ॥

॥ Objectivity in History ॥

যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ইতিহাস-রচনার তথ্য সংগৃহীত হয় সেই প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানভিত্তিক। কিন্তু তথ্য থেকে নিষ্কাশিত যে ইতিহাস তার উপস্থাপনাই হ'ল ইতিহাস রচনাশৈলী। এই রচনাশৈলীতেই প্রকাশ পায় ঐতিহাসিক কতটা

নৈর্বক্তিক, কতটা ব্যক্তিসাপেক্ষ। আর ঐতিহাসিক নৈর্বক্তিক হবেন এটাই আমাদের আকাঙ্ক্ষিত। অতএব এখন আমাদের প্রশ্ন হ'ল, নৈর্বক্তিক ইতিহাস রচনাশৈলী কতটা সম্ভব ?

ইতিহাস বিজ্ঞান হিসেবে বিবেচিত হবার অন্যতম মানদণ্ড হ'ল, ইতিহাসকে ব্যক্তি নিরপেক্ষ হতে হবে। দু'জন বৈজ্ঞানিক যদি একই বিষয় নিয়ে বিচ্ছিন্নভাবেও গবেষণা করেন তবে তাদের গবেষণা-লব্ধ ফলাফল তো একই হবে। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রেও কি তাই হয়? হয় না বলেই আর্য কারা এ নিয়ে ঐতিহাসিকের গবেষণার ফলশ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন, সিপাহি বিদ্রোহ কিংবা অন্ধকূপ হত্যা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ। কিন্তু এর কারণ কি ?

ব্যক্তিগত সংস্কার

প্রথম কারণ হ'ল **ব্যক্তিগত সংস্কার বা personal prejudice.** এই সংস্কার সাধারণতঃ ঐতিহাসিক বিবরণ প্রণয়ণে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এবং এই প্রভাব যে অতিক্রম করা যায় না তার প্রমাণ অন্ধকূপ হত্যা সম্পর্কে হল্‌ওয়েলের বিবরণ।

দলীয় সংস্কার

দ্বিতীয় কারণ হ'ল **দলীয় সংস্কার বা group prejudice.** ঐতিহাসিক যে দল বা গোষ্ঠীর অংশীদার সেই দল বা গোষ্ঠীর সংস্কার ঐতিহাসিককে প্রভাবিত করে। এই দলীয় সংস্কার ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে জন্ম নিতে পারে অথবা সম্প্রদায় গত, শ্রেণীগত বা জাতিগত প্রয়োজন সাধনের তাগিদ থেকেও জন্ম নিতে পারে। এই দলীয় সংস্কারের বাইরে বেরিয়ে আসাও ঐতিহাসিকের পক্ষে সহজ-সাধ্য নয়।

দার্শনিক চিন্তাধারা

তৃতীয় কারণ ইতিহাসের বিভিন্ন তাত্ত্বিক বা দার্শনিক চিন্তাধারা (Theories of historical interpretation.)। এই সব চিন্তাধারা ইতিহাসকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার চেষ্টা করে। একটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ভারতের ইতিহাসের সম্ভবতঃ সর্বাধিক বিতর্কিত প্রশ্ন হ'ল সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ। মার্ক্সীয় দর্শন এই স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহকে এক কৃষক বিদ্রোহ বলে অনায়াসেই চিহ্নিত করে দিল। ইউরোপের ইতিহাসে এমন নজীরের অভাব নেই।

নিরপেক্ষহীনতার দূরত্ব

তা হলে দেখা গেল সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। সে ক্ষেত্রে আমাদের লক্ষ্য হ'ল, এই নিরপেক্ষহীনতাকে কোন একটি সীমাবদ্ধতার মধ্যে নিয়ে আসা। সুতরাং আমাদের বিচার্য হবে ইতিহাস কতখানি আপেক্ষিকভাবে ব্যক্তিসাপেক্ষ বা relatively subjective, কতটাই সম্পূর্ণ ব্যক্তি সাপেক্ষ বা absolutely subjective. ড্যান্স এই প্রসঙ্গে চমৎকার বলেছেন, "One of the easiest ways of telling an untruth is to speak nothing but the truth—with something vital omitted.

তা হলে কি ঐতিহাসিক সত্য বলে কিছু নেই? সত্যি, নেই। কারণ আজ যাকে আমরা সত্য বলে মেনে নিচ্ছি আগামীকাল হয়তো তা কোন নতুন গবেষণার আলোকচ্ছটায় মিথ্যে বলে প্রমাণিত হয়ে যাবে। কিন্তু এতে পরিতাপের কোন সুযোগ নেই। আসল কথা হ'ল, কতটা নিরুদ্বেগে নির্দ্বিধায় আমরা সত্যানুসন্ধানী হতে পেরেছি, তাই বিবেচ্য।

তাই সম্পূর্ণ নৈর্বক্তিক ইতিহাস রচনাও সম্ভবতঃ সম্ভব নয়। ঐতিহাসিকও একজন মানুষ এবং মানুষ হিসেবে তার কতকগুলো নিজস্ব মূল্যবোধ বিশ্বাস ও আদর্শ থাকাই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয়। তার একটি নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী থাকাও প্রয়োজন। এই দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়া যে ইতিহাস তিনি রচনা করবেন তা হবে প্রাণহীন, যান্ত্রিক, উদ্দেশ্যহীন। শিল্পী তার শিল্প সৃষ্টি যেমন করে নিজের মন প্রাণ সমর্পণ করেন, এবং এই সমর্পণ আছে বলেই শিল্প সৃষ্টি সার্থকতায় উত্তীর্ণ হয়, তেমনি ঐতিহাসিককেও সাফল্যের সর্ব দ্বারে পৌঁছুবার জন্য এমন সমর্পনই চাই। Walsh এ কথাটারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, History might be said to give us a series of different but incompatible portraits of the past, each reflecting it from a different point of view."

॥ ইতিহাসের কার্যকারণ সূত্র ॥

॥ Law's of Causation ॥

যে কোন বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত কোন অনুমান বা hypothesis কে ভিত্তি করে। তারপর হয়তো নিত্য নতুন গবেষণার মধ্য দিয়ে হয়তো পুরোনো অনুমানকে পাল্টে নিতে হয় কিংবা নতুন কোন অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়। এইভাবে আমরা কোন সঠিক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছুই। বিশেষ করে ইতিহাসে এই অনুমান ছাড়া "......facts would have remained a meaningless jumble."

কিন্তু কোন একটি অনুমানের সত্যতা যাচাই করার জন্য প্রয়োজন হ'ল প্রাপ্ত তথ্য সমূহকে কার্যকারণের সূত্রে গ্রথিত করা। কোন ঘটনাই অকারণে সংঘটিত হয় না। ঐতিহাসিককে জানতে হবে প্রতি ঘটনার পশ্চাদপট। এইখানেই **ঐতিহাসিককে একজন মনোবিজ্ঞানীর ভূমিকাও গ্রহণ করতে হয়।**

কার্য-কারণ সূত্রের মূলকথা

ইতিহাসে তো ব্যক্তিত্বের প্রাচুর্য। প্রতিটি ব্যক্তিত্বের বহুমুখী কর্মধারাকে বুঝতে গেলে শুধু তাদের বাইরের আচরণ বিশ্লেষণ করলেই চলবে না, তাদের মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার খবরও নিতে হবে। তবেই তাদের কার্যাবলীর একটি সুসংহত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যাবে। শুধু তাই নয়। **অনুসন্ধান-লব্ধ কারণগুলোকে আবার গুরুত্ব অনুসারে সাজানোও ঐতিহাসিকের কাজ।**

কিন্তু এমন পরিস্থিতিও এসে যেতে পারে যেখানে কার্য-কারণের যোগসূত্রটুকু খুঁজে পাওয়া দুরূহ হয়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে "The use of imagination, which is indispensable for a historian to fill the gaps, in no way mars the scientific nature of his work." কারণ ঐতিহাসিক তার কল্পনাশক্তিকে কখনো বল্গাহীন হতে দেন না। তিনি তো কোন অতীত ঘটনার স্রষ্টা হতে পারেন না। কল্পনা করার ক্ষেত্রে তার স্বাধীনতা হ'ল এইটুকু যে দুটো ঘটনার মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করার জন্য তিনি নিজের বিচারবোধ ও বিবেক-বোধকে কাজে লাগাতে পারেন।

কল্পনাশক্তির প্রয়োগ

॥ ইতিহাসে অঘটন ॥
॥ Accidents of History ॥

ইতিহাসে যদি কার্য-কারণ সূত্রকেই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকি তাহলে অঘটনের স্থান কতটুকু? আমাদের চারপাশে কখনো এমন ঘটনা ঘটে যায় যার ব্যাখ্যা হয় না। অতীতে কি এমন অঘটন কখনো ঘটে নি? ঘটেছে নিশ্চয়ই। কিন্তু এমন অঘটন সম্পর্কে ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী কি হবে? মণ্টেস্কু বলেছেন, "If a particular cause, like the accidental result of a battle, has ruined a state, there was a general cause which made the downfall of this state ensue from a single battle." মার্ক্স বিশ্বাস করতেন যে অঘটন ইতিহাসের অগ্রগতি আকস্মিকভাবে দ্রুততর বা পশ্চাদ্‌পদ করতে পারে, "it could not basically change the direction of development."

অঘটনের স্থান

সুতরাং অঘটনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের কোন কারণ নেই। ঐতিহাসিকের কাজ হ'ল, অতীতের ঘটনাকে এমনভাবে বিশ্লেষণ করা যাতে সেই বিশ্লেষণ থেকে কোন সিদ্ধান্তে পৌছানো যেতে পারে। কিন্তু কোন অঘটন থেকে এমন কোন সিদ্ধান্ত আমরা পেতে পারি না।

॥ ইতিহাসে ব্যক্তিত্ব ॥
॥ Individuals in History ॥

সাধারণভাবে ইতিহাসে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা আছে। কিন্তু **ব্যক্তিত্বের পরিমাপ হওয়া উচিত সেই পরিমণ্ডলে, যে পরিমণ্ডলে সেই ব্যক্তিত্ব বর্ধিত।** এই পরিমণ্ডল বলতে বুঝায় সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক অবস্থা। মার্ক্স অবশ্য ব্যক্তিত্বকে আদৌ কোন মর্যাদা দিতে নারাজ। তাঁর মতে অনুকূল পরিবেশে খুব সাধারণ মানুষও অসাধারণ পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেন। কিন্তু

এটি একটি চূড়ান্ত মত। ইতিহাসে ব্যক্তিত্বের মর্যাদা নিশ্চয়ই আছে, ভূমিকাও অনস্বীকার্য। আসলে ব্যক্তিত্ব ও পরিবেশ উভয়ে উভয়ের পরিপূরক। তাই লেনিন যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জন্মাতেন তবে হয়তো তাঁর পক্ষে এক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংঘটিত করা সম্ভব হ'ত না। কিংবা গান্ধীজীর পক্ষেও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এত ব্যাপক জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে তোলা সহজ ছিল না। Hegel ঠিকই বলেছেন যে "the great man of the age is the one who can put into words the will of his age, tell his age what its will is and accomplish it ; what he does is the heart and essence of the age ; he actualises his age."

ব্যক্তিত্ব ও তার পরিবেশ

হেগেলের মত

সুতরাং এক ব্যক্তিত্বকে বিচার করার মানদণ্ড হ'ল তার সামাজিক ও অর্থ নৈতিক প্রেক্ষাপট, কতটুকু এই প্রেক্ষাপট তাকে তৈরী করেছে, কতটুকু এই প্রেক্ষাপটকে তারা কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছেন।

॥ ভারতীয় ইতিহাস রচনা শৈলী ॥

॥ Indian Historiography ॥

একটি চমৎকার উদ্ধৃতি দিয়েই শুরু করা যাক্। ঐতিহাসিক ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলী সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, "Historians of the peoples of the sub-continent have in the past operated rather like isolated guerilla fighters in a jungle often performing feats of individual brilliance, but lacking discipline and only vaguely aware of the part they should play in a general campaign. উদ্ধৃতিতে উল্লিখিত তুলনাতেই ভারতীয় ঐতিহাসিকদের চিন্তাধারা তাদের রচনাশৈলী সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ ছবি ফুটে উঠেছে। আমরা এই উদ্ধৃতিকে অবলম্বন করেই প্রাচীন যুগ থেকে অত্যাধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাস রচনার কলা-কৌশলের সঙ্গে পরিচালিত হতে চাই।

॥ প্রাচীন যুগ ॥

ইতিহাস নামক বিষয়টির সঙ্গে আমাদের পরিচয় প্রাচীন কাল থেকেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে। ফলে ইতিহাস-চর্চার সূত্রপাতও সেই প্রাচীন কালেই। **প্রথম স্তরে ইতিহাস ছিল মৌখিক গাঁথা, আখ্যান, পুরাণ ইত্যাদির আকারে।** এই ভাবেই চললো দীর্ঘকাল। ক্রমশঃ গাঁথা, আখ্যান ইত্যাদির সংখ্যাধিক্যও ঘটতে লাগলো।

প্রথম স্তর।

তারপর এমন একটি পর্যায় এল যখন কেবলমাত্র মৌখিক চর্চাই যথেষ্ট মনে হ'ল না, **প্রয়োজন হ'ল লোকের মুখে মুখে যুগ থেকে যুগান্তরে যা বাহিত তাকে লিপিবদ্ধ করার**। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই রচিত হ'ল রামায়ণ ও মহাভারত। এই গ্রন্থদ্বয় সম্পর্কে জওহরলাল নেহেরু বলেছেন, "I do not know of any book any where which has excercised such a continuous and pervasive influence on the mass mind as these two," এই দুই কাব্যই প্রকৃতপক্ষে প্রাচীনতর ভারতবর্ষের ইতিহাস যা মূলতঃ কল্পনাশ্রয়ী, সত্য যেখানে বহুলাংশে উপেক্ষিত। তবু এই দুই মহাকাব্য আমাদের যা জানতে সাহায্য করছে তার গুরুত্বও কম নয়।

মহাকাব্যের স্তর

ধর্ম, অর্থ, কর্ম ও মোক্ষ—এই চার নীতির প্রতিষ্ঠিত যে মানব-জীবন সম্পর্কে আমাদের প্রাচীন ধারণা তাই হ'ল দুই মহাকাব্যের উপজীব্য বিষয়। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যনীয় হ'ল এই প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের সংজ্ঞা অনুসারে মানব-জীবনের লক্ষ্য হিসেবে ঐ চার নীতির কথাই বলা হয়েছে।

পরবর্তী স্তরে ইতিহাস ক্রমশঃ তার নিজস্ব রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। মোটামুটি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই বিবর্তনের সূচনা। **বিভিন্ন রাজানুগৃহীত কবি-সাহিত্যিক এক নতুন ধরনের রচনার সূত্রপাত করেন** এগুলোকে আমরা চরিত বা প্রশস্তি নামে অভিহিত করতে পারি। মূলতঃ এগুলো পৃষ্টপোষকদের তৃপ্ত করার তাগিদেই রচিত। যেমন বিক্রমদেব রচিত, রাম-রচিত, হর্ষ-চরিত ইত্যাদি। এই সব রচনাবলী থেকে মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যাবলী সহজলভ্য।

চরিত ও প্রশস্তি

এ ধরনের রচনার একটা উদাহরণ দেওয়া যাক্। যেমন বাণভট্ট রচিত হর্ষ-চরিত। বাণভট্ট ছিলেন হর্ষবর্ধনের সভাকবি এবং তাঁর একজন গুণমুগ্ধ। স্বভাবতঃই বাণভট্ট নিরপেক্ষ হতে পারেন নি। এমন কি তাঁর বক্তব্য-বিষয়ও হর্ষবর্ধন ও তাঁর প্রাত্যহিক জীবনকে ছাড়িয়ে যেতে পারে নি। এমন কি রচনাতে সাহিত্যগত উৎকর্ষ সাধন করতে গিয়ে ইতিহাসগত প্রকরণের প্রতিও অবজ্ঞা প্রদর্শিত হয়েছে। তবে এইসব রচনাবলীতে একটা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে। তা হ'ল **এই চরিত-কাহিনীর রচয়িতাগণ সর্বদাই অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানকে যাচাই করতে চেয়েছিলেন**। এর ঠিক উল্টো দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন বর্তমানের ঐতিহাসিকেরা।

চরিত্র ও প্রশস্তি রচনার বৈশিষ্ট্য

অথচ এই সময়কারই বিস্ময়কর সৃষ্টি হ'ল কল্হন রচিত রাজতরঙ্গিনী। বিস্ময়কর, কারণ রচনাশৈলীর দিক থেকে কলহন সম্পূর্ণ আধুনিক, পদ্ধতিগত দিক থেকে তিনি সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। তাই তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে স্বতঃস্ফূর্ত স্বীকৃতি জানিয়ে ফিলিপস্ বলেছেন: "The work is unique as the only attempt at true history in the whole of surviving sanskrit literature." কল্হন লিখিত বা প্রচলিত

উৎস সমূহের সন্ধান করেছেন, বিভিন্ন শিলালিপি বিচার করেছেন, বিভিন্ন প্রশস্তির সত্যতা যাচাই করার চেষ্টা করেছেন। তারপর সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে, কোন রকম কুসংস্কার দ্বারা আচ্ছন্ন না হয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছেন। এই যে পদ্ধতি তিনি অনুসরণ করেছেন একেই তো আমরা বলছি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, এ পথেই তো রচিত হয় নৈর্বক্তিক ইতিহাস। শুধু তাই নয়। **কলহন জানতেন যে সত্যকে আবিষ্কার করাই বড় কথা নয়। তাকে প্রকাশও করতে হবে এমন ভংগিমায় যাতে পাঠক প্রলুব্ধ হতে পারে।** ইতিহাসের লক্ষ্য ও প্রয়োজন ব্যাখ্যা করে তিনি নিজেই বলেছেন"......to please the readers by displaying before them the numberless events of ancient days and to give them food for thought on the impermanence of things, thereby encouraging the sentiment of resignation which rules supreme in the work."

রাজ-তরঙ্গিনী

যাই হোক প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কার্য-কারণ সূত্রে ঘটনাবলীকে গ্রথিত করার উপলব্ধি একান্তই অনুপস্থিত। এর কারণ প্রাচীন ভারতীয় জীবনে ধর্মীয় জীবনে সর্ব-প্লাবী প্রাধান্য। যেখানে সর্বশক্তিমানের কাছে নিঃশর্ত সমর্পণ জীবনের পরম লক্ষ্য সেখানে যুক্তি-নির্ভর চিন্তা-চেতনার খুব বেশী প্রাবল্য থাকার কথা নয়।

প্রাচীন যুগের ব্যর্থতা

॥ মধ্য যুগ ॥

মুসলমান শাসনকাল ভারতের ইতিহাস চর্চার অধিকতর পরিপক্কতার কাল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলেন চতুর্দ্দশ শতাব্দির **ইবন খল্‌দুন**। তাঁর মতে ইতিহাস কেবলমাত্র ঘটনার বিবরণই নয়, **ইতিহাস হ'ল বিভিন্ন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সামাজিক ক্রিয়া প্রতি-ক্রিয়ার বিশ্লেষণ**। ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর যে সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গী তা ভারতের মুসলমান ঐতিহাসিকেরা গ্রহণ করেন নি।

ইবন খলদুন

বরং এইসব ঐতিহাসিকেরা সম্পূর্ণ সচেতনভাবে তাঁদের পূর্বতন ভারতীয় ইতিহাসের প্রতি অবজ্ঞা দেখিয়ে গিয়েছেন। তার কারণও খুব স্পষ্ট। তা হ'ল এইসব ঐতিহাসিকেরা কখনোই বিস্মৃত হন নি যে তাঁরা হলেন ভারত বিজয়ীদেরই শরিক আর হিন্দুরা হলেন বিজেতা।

যাই হোক এই সময়কার ঐতিহাসিকেরাও ছিলেন সুলতান-বাদশাহ-সম্রাটের দ্বারা অনুগৃহীত। ফলে তাঁদেরও লক্ষ্য ছিল এই শাসককুলকেই তুষ্ট করা। ফলে স্বাভাবিক কারণেই সাধারণ মানুষের কাহিনী তাঁদের বক্তব্যের বাইরেই থেকে গিয়েছে।

তুষ্ট সাধন করা

তবে এই সময়কার এক উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হলেন **আবুল ফজল**। তিনি তাঁর আইন-ই আকবরীতে অনেক ব্যাপার ও বিস্তৃত বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন।

আবুল ফজল্

যাই হোক মধ্যযুগে ইতিহাস শুধুমাত্র ব্যক্তি ও ঘটনা নির্ভর হওয়ার পরিবর্তে তথ্য-প্রধান হতে পেরেছে। ইতিহাস কার্য-কারণ বিধিটিও মর্যাদা পেতে থাকে। তবে ইতিহাস রচনার লক্ষ্য ছিল কোরাণের অনুশাসন মেনে চলা এবং ইতিহাসের মধ্য দিয়ে নীতিবোধকে জাগ্রত করা।

॥ আধুনিক যুগ ॥

ভারতে ইংরেজ শাসনের গোড়াপত্তন থেকেই উন্মোচিত হ'ল ভারতীয় ইতিহাস চর্চার আর এক দিগন্ত। স্বাভাবিক কারণেই এইবার পাওয়া গেল য়ুরোপীয় ঐতিহাসিকদের যাঁদের রচনাশৈলীতে সমসাময়িক কালের য়ুরোপীয় চিন্তাধারার প্রভাব ছিল এবং ছিল য়ুরোপীয় শক্তিবর্গের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের প্রতিক্রিয়ার প্রতিফলন। এই সময়কার ইতিহাস রচনার মূল সুরটি ছিল জওহরলাল নেহরুর ভাষায়, "The overpowering need of the moment is to justify one's own actions and condemn and blacken those of the others......" অবশ্য এর ব্যতিক্রমও ছিল। কিছু কিছু ঐতিহাসিকও ছিলেন যাঁরা ভারতীয় ভাবধারাকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করতে চেয়েছিলেন।

জেমস্ মিল্ ছয় খণ্ডে ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। ইংরাজ শাসনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠায় তিনি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতাকে হীন প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ত্রুটি সত্বেও তাঁর রচনা-কৌশল ছিল খুবই চিত্তাকর্ষক।

জেমস্ মিল্

ক্লাইভ ও হেষ্টিংস্ সম্পর্কিত **মেকলের** প্রবন্ধগুলি সেই সময় যথেষ্ট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু তিনিও নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন নি। আসল কথা হ'ল এই সময় পর্যন্ত যে বিশ্বাস প্রধান হয়ে ছিল তা হ'ল, "India existed for the glorification of the English qualities. They were blind to the fact that India was not a virgin land with a clean slate to write on."

মেকলে

অন্যদিকে **এল্‌ফিনস্টোনের** ইতিহাস অনেক উদার দৃষ্টিকোণ থেকে রচিত। কিন্তু মিলের রচনায় যে জোর ও চমক ছিল তা একান্তই অনুপস্থিত এল্‌ফিন্‌স্টোনের ইতিহাসে। ফলে তাঁর সময়ে তাঁর প্রভাব ছিল প্রায় অনুভবের বাইরে।

এল্‌ফিন্‌ষ্টোন

এই সময়কার সর্বাধিক প্রভাবশালী ঐতিহাসিক হলেন **ভিনসেন্ট্ স্মিথ্**। তিনি বলেছেন, "The value and the interest of history depend largely on the

degree in which the present is illuminated by the past. ......a sounder knowledge of the older history will always be a vanlable and in the attempt to solve the numerous problems of modern India. স্মিথের এই সুস্পষ্ট বক্তব্যের ফলেই যা কিছু ভারতীয় সভ্যতা-নির্ভর তাকেই অবজ্ঞা করার মানসিকতায় এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এল। অবশ্য স্মিথ্ও চেয়েছেন, ভারতে ইংরেজ শাসনের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে। সঙ্গে সঙ্গে তিনিই ভারতীয় ইতিহাসের অপূর্ব বৈচিত্রে মুগ্ধ হয়ে বলেছিলেন, "India offers unity in diversity." এবং স্মিথের এই কথাটিতো আজ অবধি সবাই সংশয়াতীতভাবে গ্রহণ করেছেন। তা ছাড়া স্মিথ জোরের সঙ্গে এ কথাও বলেছেন যে, ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসই সবটুকু নয়, ভারতীয় সভ্যতাকে বুঝতে হলে সাহিত্য-শিল্প-দর্শন-ধর্মের মধ্য দিয়ে যে ভারতীয় চিন্তাধারার প্রকাশ ঘটেছে তাকেও জানতে হবে, বুঝতে হবে। সুতরাং বলা যেতে পারে, স্মিথ্ ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলীর বিবর্তনে নির্ভুল পথের প্রদর্শক।

ভিনসেন্ট স্মিথ্

॥ সাম্প্রতিক প্রবণতা ॥

উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বগ্রাসী যে নবজাগরণ ভারতে সম্ভব হয়েছিল তার প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই লক্ষিত হয় ভারতীয় ইতিহাস রচনা-শৈলীতে। **এই নবজাগরণ জনসাধারণের মধ্যে নিজেদের দেশকে ভালোমত জানবার জন্য এক দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করে।** এতকাল পর্যন্ত এই জানার তৃষ্ণা মেটাবার একমাত্র উপায় ছিল য়ুরোপীয়দের রচিত ইতিহাস। এইবার দেশের লোকেরাই এগিয়ে এলেন নিজেদের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করার কাজে। এই নতুন উদ্যোগের প্রভাব পড়লো ইতিহাস রচনাশৈলীতে দুই দিক থেকে। "It whetted their appetite to learn more of the historical facts which would enable them to refute the charges of the European writers......At the same time it laid an undue emphasis on the duty of the Indian students to study. History with a view to vindicating their past culture against the unfounded charges of the European writers."

নবজাগরণের প্রভাব

নতুন ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী

সুতরাং রচিত হতে লাগলো নতুন ইতিহাস। এই রচনার উৎসাহে কারো লক্ষ্য হ'ল ভারতীয় সংস্থাগুলোকে ধরে রাখা। কেউ চাইলেন ভারতীয় প্রাচীন সভ্যতার প্রতি সশ্রদ্ধ মনোভাব জাগ্রত করতে। কেউ চাইলেন অতীত থেকে এমন শিক্ষা নিতে যা ভবিষ্যৎকে নির্ধারিত করে দিতে পারে। এই নতুন ইতিহাস-রচয়িতাদের মধ্যে এক উল্লেখযোগ্য নাম হ'ল ডঃ আর. জি. ভাণ্ডারকার।

বিভিন্ন লক্ষ্য

পদ্ধতিগত দিক থেকে ভাণ্ডারকার ছিলেন বৈজ্ঞানিক, আর প্রকাশ-ভঙ্গীমায় নৈর্বক্তিক। তাঁর বক্তব্য উদ্ধৃত করলেই বিষয়টি পরিষ্কার হবে। যেমন, ঐতিহাসিকের দায়িত্ব সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "One must be impartial with no particular disposition to find in the materials before him, something that will tend to the glory of his race and country nor should he have an opposite prejudice against the country or its people Nothing but truth should be his object."

ভাণ্ডারকার

ভারতীয় ঐতিহাসিকদের আর একটি উল্লেখযোগ্য অবদান হ'ল কে. এম. মুনসী সম্পাদিত ভারতীয় বিদ্যাভবন কর্তৃক প্রকাশিত History and culture of the Indian People. যে ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে এই ইতিহাস রচিত হয়েছে ভারতীয়দের কাছে তা নিঃসন্দেহে অভিনব এবং অভিনন্দনযোগ্য। এখানেই শেষ নয়। সম্পাদক হিসেবে কে এম. মুনসী এই ইতিহাসের ভূমিকা লিখতে গিয়ে আগামী দিনের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের কর্মক্ষেত্রের সুস্পষ্ট নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, "The modern historian of India must approach her as a living entity, with a central continuous urge of which the apparent life is a mere expression. Without such an outlook it is impossible to understand India which stands to-day with a new apparatus of state determined not to be untrue to its ancient self and yet to be equal to the highest demands of modern life. প্রকৃতপক্ষে এই তো হ'ল সত্যিকারের ইতিহাস, যেখানে রইলো আপামর জনসাধারণের ভূমিকা স্বীকৃতি, কেবল বংশানুক্রমিক রাজবংশের কাহিনী নয় যার সঙ্গে এতকাল ছিলাম আমরা অভ্যস্ত।

বিদ্যা-ভবন গ্রন্থ

জওহরলাল নেহরু ঐতিহাসিক হিসেবেও বিশেষ মর্যাদা সম্পন্ন। তাঁর ঐতিহাসিক সত্তাকে স্বীকৃতি জানিয়ে নেবুর বলেছেন, "It is a rewarding experience to accompany this man (Nehru) through the paths and by-paths of history." ঐতিহাসিক হিসেবে জওহরলালের দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল বিশ্বজনীন। সেই প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত মানুষের জয়যাত্রার কাহিনীই হ'ল তাঁর উপজীব্য। জাতীয়তাবাদী হয়েও ঐতিহাসিক নেহরুকে কোন সঙ্কীর্ণ আদর্শবাদ বেঁধে রাখতে পারে নি। এখানেই ঐতিহাসিক নেহরুর বিরাট সাফল্য।

জওহরলাল নেহরু

আবার স্বাধীনতা আন্দোলন চলা কালীন ভারতীয় ঐতিহাসিকদের মধ্যে এই প্রবণতা দেখা গিয়েছিল যে জাতীয়তাবাদকে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে ব্যবহার। ফলে এই সময় ইতিহাসের আংশিক বিকৃতি ঘটেছিল বই কি।

স্বাধীনতা সংগ্রামকাল

যাই হোক ভারতীয় ইতিহাস চর্চা এবং রচনাশৈলীর এক বিরাট দুর্বলতা হ'ল এই যে এখানে সর্বদাই রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার প্রবণতা দেখা গিয়েছে। তার ফলে ভারতীয় ইতিহাস রচনাশৈলীর মধ্য দিয়ে কখনোই একটি সামগ্রিক চিত্র ফুটে ওঠে নি। রাধাকমল মুখোপাধ্যায় তাই বলেছেন, "The approach to Indian history should be integrative, cultural and sociological rather than merely political."

ভারতীয় দুর্বলতা

ইতিহাস রচনার এই নতুন পথের পরিব্রাজক হতে হলে দুটি সমস্যা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। নতুন পথিককে বিশেষ করে ভারতের প্রাচীন যুগের উৎসগুলিকে সূক্ষ্ম এবং গভীরভাবে পর্যালোচনা নিতে হবে। এই প্রসঙ্গে রমেশ মজুমদার সতর্কবানী উচ্চারণ করে বলেছেন, "Ignorance may not be bliss in historical studies but it is certainly fally to be wise where wisdom is based on imperfect knowledge and serves merely as a cloak for dogmatism." এই নতুন দায়িত্ব পালনের জন্য প্রয়োজন অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অধ্যয়ন, খোলা মন, এবং শাসিত তরবারির মত প্রকাশভঙ্গী।

প্রাচীন উৎসের সূক্ষ্ম বিচার

দ্বিতীয় সমস্যা হ'ল ভারতীয় ঐতিহাসিকের অনুমান-নির্ভর ইতিহাস রচনার প্রবণতা। প্রকৃতপক্ষে ভারতীয় ইতিহাসের এমন বহুক্ষেত্র রয়েছে যেখানে এখনো কোন পদচিহ্ন অঙ্কিত হয় নি। এমন বহু অন্ধকার অধ্যায় যেখানে পৌঁছায় নি এখনো কোন আলোক-রশ্মি। তাই কোন পূর্ব নির্ধারিত সিদ্ধান্ত নিয়ে গবেষণা ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে অন্ততঃ সম্ভব নয়। এই কথাগুলো বিশেষভাবে প্রযোজ্য প্রাচীন যুগ সম্পর্কে। তাই ফিলিপ্‌স মত প্রকাশ করেছেন। In my opinion it is best that the historian of ancient India should continue to work with a minimum of fundamental presuppositions, in an attempt to discover with some degree of certainty what happened, for the history of ancient India is at present so tenuous that it can be fitted into almost any preconceived pattern."

অনুমান-নির্ভরতা

প্রকৃতপক্ষে আজ ভারতের সত্যিকার ইতিহাস রচিত হয় নি। হয় নি ভারতের সভ্যতার সঠিক নির্ভীক ও নিরপেক্ষ মূল্যায়ন। আগামী দিনের ভারতীয় ঐতিহাসিকদের এই দায়িত্বই নিতে হবে। সুখের কথা, সাম্প্রতিককালে দেশের তরুণতর ঐতিহাসিকেরা এই সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হয়েছেন, দায়িত্ব নিয়েছেন নিরপেক্ষ এবং বিজ্ঞান-ভিত্তিক ভারতের যথার্থ ইতিহাস রচনার। আমরা ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে সেই শুভদিনেরই আকণ্ঠ প্রত্যাশী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইতিহাসের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

॥ বিষয়-সংকেত ॥

লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা—লক্ষ্য ও মূল্যের মধ্যে প্রভেদ—ইতিহাসের স্বরূপ ও শিক্ষাগত সমস্যা—ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য—ইতিহাস পাঠের মূল্য—ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য—ইতিহাস ও জাতীয় সংহতি—ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক চেতনা—আন্তর্জাতিক চেতনা ও ভারতের ইতিহাস।

"Clio pours at our feet the treasured memories of the ages; she opens the long corridor of history and the palaces of all the courts; to us she permits to rest by pleasant streams and grants the glory of letters and the fellowship of men gone by."

—*Figgish*

"Where the poets make men witty, mathematics subtle, natural philosophy deep, moral grave, logic and rhetoric able to contend...... histories make men wise."

—*Bacon.*

॥ লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা ॥

॥ Needs of aims ॥

ইতিহাসের যাত্রা হ'ল শুরু কবে থেকে আমরা জানি না, যেমন জানি না এই মহাযাত্রার শেষ-ইবা কোথায়। যে মহাসমুদ্রের মত সীমাহীন বিস্তৃতি ইতিহাসের, সেই মহাসমুদ্রের কূলের সন্ধান পাবার জন্য চাই কতকগুলো সূচক-চিহ্ন, যেন ঐ চিহ্নগুলোকে অবলম্বন করেই আমরা অভিযাত্রী হতে পারি অজানার সন্ধানে। এই চিহ্ন বলতে আমরা ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য স্থিরীকরণকেই বুঝাতে চাই। বলা হয় "The star is useful though the mariner never reaches." প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা এইখানেই। আমাদের যাত্রাপথের নির্দেশনা থাকবে সুস্পষ্ট। এটা হতেই পারে যে শেষ অবধি হয়তো আমরা আমাদের গন্তব্য-স্থল অবধি পৌঁছাতে পারলাম না। কিন্তু তা না পারলেও, যদি পথের নির্দেশ হয় অভ্রান্ত তা হলে অন্ততঃ আমরা বিপথে পা

সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণ

বাড়াবো না। তা ছাড়া শেষ অবধি লক্ষ্যে না পৌছালেও সঠিক পথে যত দূর পৌছাবো তার-ই বা মূল্য কম কিসের? তাই পাঠ্যক্রমের অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাস পাঠ আরম্ভ করার আগে প্রয়োজন আছে সুনিশ্চিতভাবে লক্ষ্য স্থির করার।

এ ছাড়া **বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পঠন-পাঠন ব্যবস্থার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে, যার উপর ভিত্তি করে শিক্ষার সমগ্র ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছে।** এখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্যতম বিষয় হিসেবে ইতিহাসেরও নিজস্ব একটি দায়িত্ব রয়েছে, সেই সামগ্রিক উদ্দেশ্যসমূহের একাংশকে বাস্তবায়িত করার। সুতরাং এক্ষেত্রেই আমাদের বিবেচনা করে দেখতে হবে কিভাবে ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির করার মধ্য দিয়ে কিভাবে শিক্ষার যে বৃহত্তর লক্ষ্য তা বিদ্যালয়-ব্যবস্থার মাধ্যমে সার্থক করে তোলা যায়। তাই শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রেখে ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির করতে হবে।

শিক্ষার সাধারণ লক্ষ্য ও ইতিহাস

॥ লক্ষ্য ও মূল্যের মধ্যে প্রভেদ ॥
॥ Difference between aims and values ॥

ইতিহাসের লক্ষ্য স্থির করার আগে লক্ষ্য এবং মূল্য এই শব্দ দুটির ভেতরে যে তাৎপর্যগত বিভেদ রয়েছে তা আমাদের পরিষ্কার করতে হবে।

লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য যেন দার্শনিক চিন্তাধারা থেকে উদ্ভুত। কিন্তু কোন বিষয়ের মূল্য যাচাই হয়ে যায় বিষয়টির বাস্তব ব্যবহারের মধ্য দিয়ে। লক্ষ্য বলতে এমন কতকগুলো আদর্শবাদী উপলব্ধিকে বুঝায় যা পরীক্ষণের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত নয়। অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যদিয়ে আমাদের যে উপলব্ধি আমরা তাকেই মূল্য আখ্যা দিতে পারি। প্রকৃতপক্ষে লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে লক্ষ্যগুলোর বাস্তব প্রয়োগের ফলশ্রুতিই হ'ল মূল্য। তাই লক্ষ্য যেখানে আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে উদ্ভাসিত স্পষ্ট নির্দেশনা, মূল্য সেখানে এমন ফলশ্রুতি যার সঙ্গে আমাদের কোন পরিচয় ছিল না। আরও সহজভাবে বলতে গেলে, গন্তব্যস্থল হ'ল আমাদের লক্ষ্য আর সেই গন্তব্যস্থলে পৌছুবার জন্য যাত্রা পথে অর্জিত যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা-রাশি যা অর্জনের জন্য আমাদের কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না তাই হ'ল মূল্য।

উভয়ের প্রভেদ

তাই ইতিহাসের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য ও মূল্য কখনো এক হতে পারে না। একটি বিষয় হিসেবে ইতিহাস পাঠ আরম্ভের আগে আমরা কতকগুলো ইচ্ছে মনের মধ্যে পোষণ করতে পারি। বলা যেতে পারে সেই ইচ্ছেগুলোই হ'ল ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য। কিন্তু পাঠ শেষের পর দেখা গেল এমন কতকগুলো অভিজ্ঞতা অর্জিত হ'ল যার সঙ্গে পাঠ আরম্ভ করার আগের ইচ্ছেগুলোর মিল হ'ল না, আমরা সেই অভিজ্ঞতাগুলোকেই বলতে পারি মূল্য।

॥ ইতিহাসের স্বরূপ ও শিক্ষাগত সমস্যা ॥

॥ Nature of history & Educational problems ॥

পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেকটি বিষয়ের দুটো দিক আছে। একটি হ'ল বিষয়টির **নিজস্ব উপলব্ধিগত দিক বা philosophical aspect.** অন্যটি হ'ল তার **মনস্তাত্ত্বিক দিক বা psychological aspect.** সাম্প্রতিক-কালের শিক্ষায় এই মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রাধান্য সর্বজন স্বীকৃত। কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই প্রাধান্যই একটি সমস্যা। কারণ ইতিহাসের সত্ত্বা এমন যে তার সঙ্গে শিক্ষার্থীর সত্ত্বা মিলিয়ে দেওয়া সহজসাধ্য নয়। তা হলে কি শিক্ষক শিক্ষার্থীকে ততটুকুই ইতিহাস জানাবেন যতটুকু ইতিহাস শিক্ষার্থীর অভিপ্রায়ের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে? আর যদি তাই করা হয় তা হলে কি ইতিহাসের নিজস্ব স্বরূপকে বিকৃত করা হবে না? এইসব প্রশ্নের সমাধান ইতিহাসের স্বরূপ ও শিক্ষার সামগ্রিক স্বার্থে অত্যন্ত জরুরী। এবং এই জরুরী প্রশ্নের সমাধান কল্পে প্রতিদ্বন্দ্বী কোন পক্ষে কোন অনড় সমর্থন জানানো উচিত হবে না।

বিষয়ের মনস্তাত্ত্বিক দিক্‌গত অসুবিধে

ইতিহাসের শিক্ষককে প্রথমে ইতিহাসের কতকগুলো নিজস্ব অসুবিধে সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। **ইতিহাসের বিষয়ই হ'ল অতীত, যে অতীত একদা সজীব ছিল অথচ আজ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য নয়।** এই অসুবিধের ফলেই ঐতিহাসিকেরা অতীতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করেছেন, কখনো সেই ব্যাখ্যা হয়তো বা পরস্পর বিরোধী। কিন্তু ইতিহাসের যে মূল প্রবাহ তার উৎস কোথায়? "The under current of history is an expression of man's constant striving for achieving something beyond his reach" ইতিহাসের শিক্ষককে এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে এবং সত্যকেই সঞ্চারিত করতে হবে শিক্ষার্থীর মধ্যে।

অতীতাশ্রয়ী কাহিনী

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক প্রবণতাই যদি প্রাথমিক বিবেচ্য হয় তাহলে ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন আর একটি সমস্যা। এ সমস্যা সমাধানে ইতিহাসের শিক্ষক কি কেবল সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর উপরই গুরুত্ব আরোপ করবেন? কারণ সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কেই শিক্ষার্থী অধিকতর কৌতূহলী হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বিষয়-বস্তু নির্বাচনের এটাই যদি নীতি হিসেবে গৃহীত হয় তাহলে বর্তমানকে স্থান দেবার প্রয়োজনে ইতিহাসের বিষয়বস্তু হবে নিয়ত পরিবর্তনশীল। তাছাড়া কেবলমাত্র বর্তমানের উপর ভিত্তি করে তো আমরা কখনো ইতিহাসের সামগ্রিক প্রতিচ্ছবি পেতে পারি না।

বিষয়-বস্তু নির্বাচনে অসুবিধে

আবার যদি ইতিহাসের সমগ্র প্রতিমূর্তিকেই পরিস্ফুট করা হয় তাহলে প্রশ্ন আসে, ঐতিহাসিক অসংখ্য ঘটনাবলীর মধ্য থেকে কোন্ কোন্ ঘটনাকে শিক্ষার্থীর

জন্য বেছে নেবেন? এই বাছাই-এর নীতি কি হবে? বেন্‌-থামের প্রদর্শিত পথ the greatest happiness of the greatest number of people—এই কি হবে নীতি? এই প্রসঙ্গেই বার্স্‌টন বলেছেন "The idea of what affects the greatest number of people with lasting consequence is based cn a value-judgement."

বার্সটনের অভিমত ঘটনার মূল্য বিচার

সুতরাং এই পর্যায়ের আলোচনা শেষ করতে গিয়ে বলতে হয় যে ইতিহাস পাঠ থেকে সত্যিকারের সুফল পেতে হলে আমাদের দৃষ্টিকোণ হবে দ্বিমুখী। প্রথমটি হ'ল, এমনভাবে আমাদের বিষয়-বস্তু নির্বাচন করতে হবে যাতে মানুষের ক্রমিক অগ্রগতির বিভিন্ন স্তরগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আর দ্বিতীয়টি হ'ল ইতিহাসের যে কোন একটি সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ের বিস্তৃত অধ্যয়ন। বার্স্‌টন এই দুই দৃষ্টিকোণকে vertical এবং horizontal বলে ব্যাখ্যা করেছেন এবং মন্তব্য করেছেন এই বলে যে, "both must be kept in due balance or the picture of the past is distorted and history fails to bring its full benefit in education."

দ্বিমুখী দৃষ্টিকোণ

।। ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ।।

॥ Aims of Teaching History ॥

(ক) **স্থান-কাল ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করা :—**

ইতিহাস হ'ল এমন একটি বিষয় যার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের আমরা স্থান, কাল ও সমাজ সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে পারি। **ইতিহাস হ'ল যোগসূত্র বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, নিকটের সঙ্গে দূরের এবং ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের।** জীবন সম্পর্কে সামগ্রিক উপলব্ধির জন্য এই সম্পর্কগুলোকে স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে হবে। বর্তমানের পারিপার্শ্বিকতাকে বুঝার জন্য জানতে হয় অতীত পরিমণ্ডলকে। কেননা বর্তমান তো আকস্মিক ঘটনার ফলশ্রুতি নয়। আবার বর্তমানের তাৎপর্য অনুভব করতে হলে সময়-জ্ঞানকে তীক্ষ্ণ করতে হবে। বর্তমানের বিশ্বব্যাপী মুদ্রাস্ফীতির ভয়াবহতাকে আমরা বুঝাই কি করে? অতীতের একটি নির্দিষ্ট সময়ের সঙ্গে তুলনামূলক বিচারই তো বর্তমানের ভয়াবহতাকে তীব্রতর করে তোলে। এইখানেই হ'ল সময়জ্ঞানের অপরিহার্যতা এবং সার্থকতা। তাই ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল, স্থান, কাল ও সমাজ সম্পর্কে পাঠককে সচেতন করে তোলা।

(খ) **আত্মোপলব্ধিতে সহায়তা করা :—**

'নিজেকে জানো'—এতো এক চিরন্তন সত্য। কিন্তু সেই জানা সম্ভব হতে পারে কিভাবে? সম্ভব হতে পারে নিজস্ব অতীত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী হওয়ার

মধ্য দিয়ে। একথা যেমন একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি সমভাবেই প্রযোজ্য সমাজের ক্ষেত্রে, জাতির ক্ষেত্রে এবং দেশের ক্ষেত্রে। প্রকৃতপক্ষে, অতীত ছাড়া আমাদের কোন পরিচয় নেই, আমরা অস্বীকৃত তখন নিজের কাছেই। **ইতিহাস তো মানব-জাতির একমাত্র অতীত পরিচয়।** তাই স্যার ওয়ালটার র‍্যালে বলেছেন, "The end and scope of all history being to teach us by example of times past, such wisdom as may guide our desires and actions." এই পৃথিবীতে কেমন করে বিভিন্ন সভ্যতার ক্রমবিকাশ হয়েছে, কেমন করে মহামানবেরা নিজ ব্রত উদ্‌যাপন করে গিয়েছেন সাফল্যের সঙ্গে—এ সবই তো আমাদের উত্তরাধিকার এবং এই উত্তরাধিকার আমাদের নিজেদের আলোয় নিজেদেরই উদ্ভাসিত করে, চিনতে সাহায্য করে, জানতে সাহায্য করে।

(গ) **মানসিক বিকাশে সাহায্য করা ঃ—**

ইতিহাস চর্চা শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক বিকাশে সহায়তা করে, কতকগুলো প্রাক্ষোভিক ও প্রবণতাগত ভারসাম্যহীনতায় সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। ইতিহাস এই বোধই জাগ্রত করে যে মানুষের মত সামাজিক বিবর্তনও কোন নির্ধারিত পথ বেয়ে সংঘটিত হয় না, বরং এই বিবর্তন এমন জটিল পন্থানুসারী যে তার কোন পূর্বাভাষ দেওয়াও সম্ভব হয় না। তাই ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে কোন বিষয়কে বিচার করার মানসিকতা গঠিত হয় এবং সত্যানুসন্ধানে আমাদের উদ্বুদ্ধ করে।

আবার অন্যদিকে পরিবর্তনশীলতাই যে জীবনের ধর্ম এ শিক্ষা আমরা ইতিহাসের কাছ থেকেই পাই। এখানে রক্ষণশীলতার কোন স্থান নেই। সুতরাং **প্রগতিবাদী চিন্তাচেতনার উন্মেষ সাধন, ইতিহাস পাঠেরই অন্যতম অবদান।**

এইভাবে সামাজিক বিবর্তনের বিভিন্নস্তরের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগে সমাজের সঙ্গে — শিক্ষার্থীর যে একাত্মবোধ জাগ্রত হয় সেই বোধই তাকে সমাজ-সচেতন করে তোলে, সমাজের শুভাশুভের একজন অংশীদার হতে তাকে উৎসাহিত করে, সমাজে নিজের ভূমিকাটুকু জেনে নিতে তাকে সাহায্য করে।

আবার সমাজের একজন দায়িত্বশীল সভ্য হিসেবে আপন দায়িত্বভার যথাযথভাবে পালনের যে গুণাবলী অপরিহার্য তা হ'ল স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি, বৈজ্ঞানিক-সুলভ দৃষ্টিভঙ্গী, সহনশীলতা এবং গঠনমূলক বিচার বোধ। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে এইসব গুণাবলী যত সহজে অর্জন করা যায়, অন্য কোন বিষয়ের মাধ্যমে তত সহজে সম্ভব নয়। ইতিহাস তো প্রকৃতপক্ষে নিজেকে উন্মুক্ত রেখেছে সর্বক্ষণই যাতে অতীতের ঘটনাবলী থেকে মানুষ এইসব গুণাবলী অর্জনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারে।

(ঘ) নাগরিকতাবোধ জাগ্রত করা ঃ

ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। গণতান্ত্রিক শাসনের সাফল্য নির্ভর করে বহুলাংশে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জনসাধারণের সুদৃঢ় প্রত্যয়বোধের উপর। কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্পর্কে

এই অবিচল আস্থা কেমন করে উদ্দীপিত করা যায়? এই আস্থা আসতে পারে দেশের অতীত সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি থেকে। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কাহিনীও গণতান্ত্রিক শাসনের যৌক্তিকতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তোলে। এক্ষেত্রেও ইতিহাসের অবদান অপরিসীম।

(ঙ) শিক্ষার্থীদের নৈতিক বিকাশে সাহায্য করা:

অস্বীকার করার উপায় নেই শিক্ষার্থীদের নীতিবোধ সম্পর্কে সচেতন করে তোলাও ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্য। **ইতিহাসের শিক্ষা হ'ল বস্তুতঃ বাস্তববাদী শিক্ষা। আবার ইতিহাস হ'ল উদাহরণের মাধ্যমে এক অপূর্ব জীবন-দর্শনও বটে।** রোলিন চার্লস যথার্থই বলেছেন, "History describes vice. it unmasks false virtue, it exposes errors and prejudices, it dissipates the enchantment of riches and of all that vain pomp which dazzles men, it shows by a thousand examples more persuasive than all arguements that there is nothing great and laudable except honour and uprightness." যাঁরা বিজ্ঞ নন তারাই অতীতকে অস্বীকার করেন, অভিজ্ঞতাকে অবজ্ঞা করেন এবং উদাহরণকে অগ্রাহ্য করেন। তাই নৈতিক চেতনা বিকশিত করার ক্ষেত্রে ইতিহাস গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করে।

(চ) ভবিষ্যৎ দৃষ্টি (Forward look) উন্মুক্ত করা:

শিক্ষার সার্থকতা বহুলাংশে নির্ভর করে শিক্ষার্থীর সম্মুখে এক বর্ণোজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্রাঙ্কনের মধ্যে। শিক্ষার এই সার্থকতা এনে দিতে পারে ইতিহাস-চর্চা। ইতিহাসের শিক্ষা শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ দৃষ্টিই শুধু উন্মুক্ত করে না, সেই দৃষ্টিভঙ্গীকে বাস্তবায়িত করার মত পরিকল্পনা রচনাতেও সাহায্য করে। কেননা অতীত-অভিজ্ঞতাই তো ভবিষ্যতের রচয়িতা। ইতিহাসের জ্ঞান আমাদের জানতে সাহায্য করে কোন্ কোন্ উপাদান মানুষের জীবনযাত্রাকে কেমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করছে। এবং এই জ্ঞানই আমাদের ভবিষ্যতের রূপ রেখা অঙ্কন করতে সাহায্য করে।

(ছ) জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে সাহায্য করা:

ইতিহাস-বেত্তাগন ইতিহাসকে ব্যাখ্যা করেছেন নিজেদের বিশ্বাস ও উপলব্ধি অনুসারে। এ ভাবেই গড়ে উঠেছে ইতিহাসের দর্শন সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ। কিন্তু যে মতদ্বৈধতাই থাকুক না কেন তাঁদের মতবাদের মূল উৎসটি হ'ল জীবন সম্বন্ধে তাঁদের উপলব্ধি এবং জীবনকে দেখবার তাঁদের নিজস্ব দৃষ্টিকোণ। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক এইসব মতবাদের সঙ্গে পরিচিত হন। আর এই পরিচিত পাঠককে তার নিজস্ব জীবন-দর্শন গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত করে।

(জ) জাতীয় চেতনা জাগ্রত করা:

জাতীয় চেতনা জাগরণে ইতিহাসের চেয়ে উপযোগী অন্য কোন বিষয় যে আর নেই এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশের কোন অবকাশ নেই। মাতৃভূমির গৌরবোজ্জ্বল অতীত

শিশু-চিত্তেও যে আলোড়ন জাগায়, অনাবিল তৃপ্তিবোধের যে উৎস ধারা উৎসারিত করে দেয়, কেমন এক একাত্মবোধে নিজেকে আবৃত করে ফেলে আমরা তো তাকেই বলি দেশ প্রেম, বা জাতীয় চেতনা। এই চেতনাই দেশকে সুসংহত করে, সৃজনশীল স্বপ্নাবেশে আপ্লুত করে। এই চেতনাই দেশের নেতৃত্বের ভিত্তিভূমি রচনা করে। প্রকৃত পক্ষে দেশের অতীত সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা ব্যতিরেকে নেতৃত্ব কখনো দেশকে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে না। এইভাবে ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে জাতীয় চেতনা জাগরণের মত অতীব জরুরী লক্ষ্যে পৌঁছানো যেতে পারে।

(ঝ) আন্তর্জাতিক চেতনার জাগরণ :

ইতিহাস বলতে কেবল কোন দেশের ইতিহাসকে বুঝায় না। **ইতিহাস কোন সঙ্কীর্ণ ভৌগলিক পরিসীমায় সীমাবদ্ধও নয়। ইতিহাসের বিচরণ ক্ষেত্র বিশ্বব্যাপী মানব-সমাজ।** ইতিহাসের আলোচ্য মানব সমাজের অগ্রগতির কাহিনী। তাই ইতিহাসের ছাত্রও কখনো ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ হতে পারে না। এমন কি তাকে নিজ দেশের ইতিহাসকেও বিচার করতে হয় সমগ্র বিশ্বের প্রেক্ষাপটে। এই যে এক বৃহৎ ও ব্যাপক পটভূমিকায় নিজের অস্তিত্ব ও পরিস্থিতি স্থির করার শিক্ষা ইতিহাস দেয়, সেখানে কোন সঙ্কীর্ণ মানসিকতার স্থান নেই। তাই ইতিহাসের ছাত্রকে সর্বদা উদার, উন্মুক্ত মনোভাব নিয়েই যে কোন সমস্যার বিচার বিশ্লেষণ করতে হয়। অহরহ এই মনোভাব নিয়ে চলতে গিয়েই ইতিহাসের ছাত্র আন্তর্জাতিক মহামন্ত্রে দীক্ষিত হয়। এই চেতনা বিশেষ ভাবে আজকের দিনে একান্তই অপরিহার্য। যত উষ্মা, উত্তাপ পর্দার অন্তরালে থাকুক না কেন অধুনা আমরা এমন পারিপার্শ্বিকতায় বেঁচে থাকি যখন বহির্জগতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতা অভিপ্রেত নয়, সম্ভবও নয়। এমন কি যে ঠাণ্ডা লড়াই এখনো বিশ্ব শান্তি বিঘ্নিত করে তারও একমাত্র প্রতিসেধক সত্যিকারের আন্তর্জাতিকতা বোধের সম্প্রসারণ। প্রকৃত ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে আমরা এই বোধের ক্রমবিকাশকেই উৎসাহিত করতে পারি।

॥ ইতিহাস পাঠের মূল্য ॥

॥ Values of Teaching History ॥

ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে আমরা কতকগুলো মূল্যবোধ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগ্রত করতে পারি এবং একটি সম্পূর্ণ ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পিছনে এই মূল্যবোধগুলোর অবদান অপরিসীম। এবার সেই মূল্যবোধগুলো আলোচনা করা যাক্।

(ক) নৈতিক মূল্যবোধ :

মানব সমাজের অগ্রগতিতে যে সব মহামানব নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে গিয়েছেন তাঁদের মৃত্যুঞ্জয়ী কীর্তি-কাহিনীর সংরক্ষক হ'ল ইতিহাস। এইসব মহাপুরুষদের জীবন-কথা স্বভাবতঃই শিক্ষার্থীদের মহান্ আদর্শে উদ্দীপিত করে,

ত্যাগমন্ত্রে দীক্ষিত করে এবং সত্যিকারের জীবন সন্ধানের মধ্য দিয়ে এক নিরুত্তর গভীরতর প্রশ্নের সম্মুখীন করে। বহুকাল ইতিহাসকে তাই মহামানবদের কীর্ত্তি-কলাপের সংকলন বলেই মনে করা হ'ত এবং এই কীর্তি কলাপের আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নৈতিক মূল্যবোধকে উন্নত করাই ছিল ইতিহাসের কাজ।

কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে। ইতিহাস নিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়েছে কেবলমাত্র মুষ্টিমেয় মহামানবের সমষ্টিই ইতিহাস নয় এবং তাঁদের দৃষ্টিকোণই ইতিহাসের পরম সত্য নয়। তাছাড়া "There arose some measure of scepticism about the greatness of great men and the weakness of weak men, about the goodness of good men and the badness of bad men."

কিন্তু সমালোচনা যাই হোক না কেন, দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন যতই হোক না কেন, **ইতিহাসের একমাত্র উপজীব্য বিষয় হ'ল মানুষ এবং "so long as the human element is the central theme of history, great personalities will be studied."** সুতরাং সুকুমারমতি শিক্ষার্থীগণ মহাপুরুষদের জীবন-কাহিনী পড়বেই। তবে এ সম্পর্কীত সমালোচনাও যেহেতু অযৌক্তিক নয় সেইহেতু শিক্ষক পাঠ্য হিসেবে জীবনী নির্বাচনে এমনভাবে সতর্ক হবেন যাতে সেই নির্বাচনের মধ্য দিয়ে সমাজের বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব পরিস্ফুট হয়। তাছাড়া মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা কালেও আমাদের সম্পূর্ণ পক্ষপাতহীন হতে হবে। যে পারিপার্শ্বিকতায় এক মহাপুরুষ তাঁর ব্রত পালনে উদ্যোগী হয়েছিলেন, তাঁর সাফল্য, তার ব্যর্থতা অর্থাৎ একটি সামগ্রিক চিত্র যেন আমাদের প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। তাহলেই "There (greatmen) exemplary lives and their foot-steps on the sands of time will always be one of the important values of teaching history."

(খ) উত্তরাধিকার সংক্রান্ত মূল্যবোধ :

জোন্‌স বলেছেন, "History is a veritable mine of life-experiences and the youth of to-day studies history so that he may profit by the experiences of the race." এ. এল. রোসি বলেছেন, "It is a subject that rids you of illusions, one in which you grow up and become adult." সৃষ্টির সেই জন্মক্ষণ থেকে আজকের এই বিজ্ঞান-ভিত্তিক সভ্যতায় যে উত্তরণ তার বিভিন্ন পর্যায় বিস্ময়কর এবং লোমহর্ষক। কিন্তু এ সবই হ'ল ইতিহাসের এক্তিয়ার ভুক্ত। এই পর্যায়গুলোকে ব্যাখ্যা করতে গিয়েই ঐতিহাসিকেরা নানা মতবাদের প্রবক্তা হয়েছেন। **অথচ মতভেদ যাই থাকুক, এ সবই হ'ল আমাদের উত্তরাধিকার আর এই উত্তরাধিকারই হ'ল আমাদের সত্যিকারের পরিচয়।** তাই উত্তরাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা আত্মোপলব্ধির প্রয়োজনে একান্তই অপরিহার্য।

তাই "Our goal is to highlight the significant phases of the heritage of man so that we can derive inspiration for the present and guidance for the future."

(গ) বৌদ্ধিক মূল্যবোধ :

ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধিক মূল্য বোধের বিকাশ সম্ভব হতে পারে। যেমন : স্মরণ শক্তিকে শাণিত করা, যুক্তি বোধকে তীব্রতর করে তোলা, কল্পনা শক্তিকে সমৃদ্ধ করা, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ অর্জন করা ইত্যাদি। অবশ্য এক সময়ে আমাদের ধারণা ছিল মানব-মনের কতকগুলো পৃথক পৃথক সামর্থ আছে—যেমন ভাববার সামর্থ, বিচারের সামর্থ, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সামর্থ। কিন্তু অধুনা এই ধারণায় আমরা বিশ্বাসী নই। বর্তমান বিশ্বাস হ'ল, মন সামগ্রিক ভাবেই কাজ করে, কার মধ্যে সামর্থগত কোন উপবিভাগ নেই। তবুও ইতিহাস যে দূরকে নিকট করে, অদৃশ্যের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন রচনা করে, জানার কৌতূহল চরিতার্থ করে, কল্পনা শক্তির সাহায্যে মনকে সমৃদ্ধ করে সে বিষয়েও কোন সংশয় নেই। এবং এই সব গুণাবলীর মূল্যও সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশে কম নয়।

(ঘ) নির্মল আনন্দ লাভ :

"A knowledge of history enriches and fills out our appreciation of the world around us···and gives an interest and a meaning to things." এক জীবনৈতিহাস নিয়ে পর্যালোচনায় যে আনন্দানুভব, ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণে অতীতের স্পর্শ লাভের মধ্য দিয়ে যে সুখানুভব, বাস্তব জগতে বোধ হয় তার তুলনা মেলা ভার। কিন্তু তাই বলে এই অনুভূতি তো মিথ্যে হবার নয়। বরং ইতিহাসের আবেদন আমাদের সারা জীবনের সঙ্গী, আমাদের সাফল্য অর্জনের সঙ্কেত। তাই বলা হয়েছে "The appeal of history is one that grows with you as you grow in mind, ripens with your own experience in life, deepens and comes to have more meaning for you as you achieve maturity." প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস হ'ল বয়স্কদের বিষয়, এর যে শিক্ষা, এর ভেতর প্রচ্ছন্ন যে আনন্দানুভূতি তা একজন পরিপূর্ণ মানুষের পক্ষেই উপভোগ করা সম্ভব। কিন্তু এই উপভোগের সক্ষমতা অর্জনের জন্যও প্রস্তুতি প্রয়োজন। বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে এই প্রস্তুতি কার্যই অব্যাহত থাকবে। তাই আমরা নিঃসংশয়ে বলতে পারি, "School history is more than an adventure of the imagination ; it is also more than a labyrinth to be explored···The final goal is to understand something and to appreciate something." এইটেই হ'ল আসল কথা, তা সে আমরা ইতিহাস পাঠের যত উদ্দেশ্য বা যত মূল্য বোধের কথাই বলি না কেন।

॥ ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য ॥

স্বাধীনতা লাভ করার পর আমরা ধর্মনিরপেক্ষতা, গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র এবং বিশ্বসৌভ্রাতৃত্ব এই চারিটি নীতিকে জাতীয় লক্ষ্য হিসেবে ঘোষণা করেছি। ইতিহাস পঠন-পাঠনের উপর এই নীতিচতুষ্টয়ের প্রভাব নিশ্চয়ই আছে।

ইতিহাস পঠন ও পাঠনের প্রধান ত্রুটি

কিন্তু বর্তমানে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি অনুসরণ করে চলেছি তা কিন্তু ঐ নীতিগুলোর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলে না। কারণ ধর্ম নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক নীতির বাস্তবায়ণের জন্য প্রয়োজন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করার। অথচ এখনো আমাদের প্রবণতা, **যুক্তিহীন ভাবে অতীতকে গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায় হিসেবে দেখানোর।** রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর অত্যধিক গুরুত্ব করার ফলে এখনো আমাদের ইতিহাস কিছু রাজা আর রাজবংশের কাহিনী, কিছু যুদ্ধ বিগ্রহ, আর স্বার্থ সংঘাতের বিবরণ। এখনো সমাজের ক্রমিক বিবর্তনের পর্যালোচনা আমাদের ইতিহাসে যথোচিত মর্যাদা পায় নি। সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি এখনো আমাদের ইতিহাসের একটি সামগ্রিক প্রতিমূর্তি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। এক কথায়, বিজ্ঞান-ভিত্তিক নৈর্বক্তিক চিন্তা-চেতনার অভাবই আমাদের দেশের ইতিহাস পঠন-পাঠন ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় সঙ্কট।

জাতীয় লক্ষ্যের সঙ্গে ইতিহাসের লক্ষ্যের সমন্বয় সাধন।

সুতরাং এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন হ'ল ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এই লক্ষ্য অবশ্যই আমাদের গৃহীত জাতীয় নীতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই নির্ধারণ করতে হবে। এর সঙ্গে আরও একটি দিকে নজর রাখাত হবে। তা হ'ল ইতিহাস চর্চাকে আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে এই চর্চার মাধ্যমে প্রাক্ষোভিক ও জাতীয় সংহতি সাধনের কাজ ত্বরান্বিত হতে পারে। কারণ ধর্ম-নিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক দেশ গঠনের প্রয়োজনে জাতীয় সংহতি একটি অতীব জরুরী প্রশ্ন।

এই দিক থেকে আমাদের লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই বোধ জাগ্রত করা যে **ইতিহাস হ'ল সামাজিক পরিবর্তন ও প্রগতির বিচার বিশ্লেষণ।** তাই মানুষের ইতিহাসের গতি কখনো স্তব্ধ হতে পারে না, চলমানতাই হ'ল ইতিহাসের মৌল ধর্ম। এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস পঠন-পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীদের সময় সচেতনতাও যেন বৃদ্ধি পায় সেদিকে আমাদের নজর দিতে হবে।

ইতিহাসে পরিবর্তনের তাৎপর্য

অবশ্য সমাজ বিবর্তনের উপাদান কি এ সম্পর্কে কোন স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। কিন্তু ইতিহাসের পরিবর্তন বলতে যে সর্বাত্মক পরিবর্তনকেই বুঝায় এ কথাটি আমাদের উপলব্ধি করতে হবে। সমাজ-জীবনের কোন এক ক্ষেত্রের পরিবর্তন কখনো সেই ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে না, ক্রমপ্রসারমান মেঘপুঞ্জের মত সেই পরিবর্তন ক্রমান্বয়ে সমগ্র

সমাজ জীবনকে আবৃত করে। সামাজিক পরিবর্তনের গভীরতম তাৎপর্যটি অনুধাবনের জন্য পরিবর্তনের এই সর্বব্যাপী চরিত্রটি আমাদের বুঝতে হবে।

ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যেন নিজের পরিমণ্ডলকে নির্ভুল ভাবে জানতে পারে সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

নিজস্ব পরিমণ্ডল সম্পর্কে জ্ঞান

অতীতের ব্যর্থতা থেকে একদিকে যেমন সে শিক্ষা নেবে, অন্যদিকে তেমনি অতীতের সাফল্যে সে গৌরবান্বিতও বোধ করবে। এভাবে অতীতের সাফল্য- ব্যর্থতা থেকে শিক্ষার্থী শুধু নিজের পরিমণ্ডলকেই চিনতে পারবে তাই নয়, সেই পরিমণ্ডলে তার ভূমিকা কি সে সম্পর্কে দায়িত্বশীল সচেতনতা জাগ্রত হবে।

দেশপ্রেম জাগরণ

ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যেন স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয় এটাও আমাদের লক্ষ্যণীয়। এই স্বদেশ প্রেম কেমন করে জাগ্রত হবে? শিক্ষার্থী যদি তার নিজস্ব জাতীয় ঐতিহ্যের মর্মকথাটি উপলব্ধি করতে পারে, ঐতিহ্যের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি জানতে পারে এবং কেমনভাবে বহু জাতির সমন্বয়ে এই ঐতিহ্য গড়ে উঠেছে তা যদি হৃদয়ঙ্গম করতে পারে তা হলে শিক্ষার্থীর মনে ক্রমশঃ স্বদেশ প্রেমের অনির্বাণ দীপশিখার আলো তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকবে।

মানবতাবোধ

শুধু সঙ্কীর্ণ জাতীয় অনুচিন্তনই নয় গভীরতর মানবতার মহামন্ত্রেও শিক্ষার্থীদের দীক্ষা নিতে হবে। আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য যে বৃহত্তর মানব-ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয় এটা মনে প্রাণে অনুভব করতে হবে শিক্ষার্থীকে। অন্ধ জাতীয় চেতনা এমন সঙ্কীর্ণ মনোভাব তৈরী করে থাকে কখনো আশীর্বাদ বলে গ্রহণ করা যায় না। আবার এই অন্ধ জাতীয় চেতনা কখনো দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। কেননা এই চেতনার কোন বৈজ্ঞানিক প্রস্তুতি নেই। তাই স্বদেশ প্রেম নিশ্চয়ই স্বদেশ সম্পর্কে মুগ্ধতা বুঝায়, কিন্তু সেই মুগ্ধতা অবশ্য আন্তর্জাতিকতা ও মানবতাবাদ দ্বারা অভিসিক্ত হবে।

রচনাশৈলীতে পরিবর্তন

ইতিহাস পাঠের এই লক্ষ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আমাদের ইতিহাস রচনাশৈলীতেও পরিবর্তন আনতে হবে। প্রকৃতপক্ষে এতকাল যে রচনাকৌশল আমরা অনুসরণ করে এসেছি তা নৈর্বক্তিকও নয়, বিজ্ঞান-ভিত্তিকও নয়। তাই চাই পরিবর্তন, এমন পরিবর্তন যা পরিবর্তিত পরিস্থিতিকে গ্রহণ করতে পারে। কারণ "The objectives of history teaching that flow from our national objectives of secularism democracy and socialism are also logically related to our present stage of historical development and ensure constructive outlook towards the past and a progressive one for future."

।। ইতিহাস ও জাতীয় সংহতি ।।

কথায় বলে, "যা নেই ভারতে তা নেই ভূ-ভারতে।" প্রকৃতপক্ষে ভারত হ'ল এক মহাদেশেরই ক্ষুদ্র সংস্করণ। ভারত তার প্রাচীনত্বে, তার বিশালত্বে, তার বৈভবে, তার বৈচিত্র্যে তুলনা রহিত। তাই তার সমস্যাও বোধ হয় তুলনাহীন। এই মুহূর্তে যে সমস্যা তাকে সর্বাধিক বিড়ম্বিত করছে, তার জীবনী-শক্তির অকারণ অপব্যয় ঘটাচ্ছে তা হ'ল সামগ্রিক অর্থে ঐক্যবোধের অনুপস্থিতি, জাতীয় সংহতি-বোধের অভাব। অথচ কোঠারী কমিশন্ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন : Social and national integration is crucial to the creation of a strong, united country. Which is an essential pre-condition for all progress." জাতীয় সংহতি সম্পর্কীত সমস্যা আলোচনার আগে জানা দরকার বাস্তব অর্থে জাতীয় সংহতি বলতে আমরা কি বুঝি।

।। জাতীয় সংহতির স্বরূপ ।।

জাতীয় সংহতি সাধনের প্রাথমিক শর্ত হ'ল দেশের নাগরিকদের আবেগগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে তাদের সুসামঞ্জস্যপূর্ণ ব্যক্তিত্ব-বিকাশে সহায়তা করা। এ পথেই সাধারণ মানুষ ক্ষুদ্র স্বার্থবুদ্ধিকে অবজ্ঞা করে বৃহত্তর লক্ষ্য পূরণে নিজেদের নিযুক্ত করতে পারে। যখন একটি জাতির ক্ষেত্রে আমরা সংহতি শব্দটি প্রয়োগ করি তখন অর্থ দাঁড়ায়, ভাষাগত ও সংস্কৃতগত পার্থক্যকে মেনে নিয়েও আন্তঃপ্রাদেশিক ভেদাভেদকে দূর করার উদ্যোগ গ্রহণ, বিভিন্ন ভাষা ও জাতির মধ্যে এক সহনশীল মানসিকতার বিকাশ সাধন, এবং সর্বোপরি যে কোন সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে জাতীয়তাবোধের উন্মেষ সাধন। "National integration aims at unifying the people and not necessarily making them conform to one pattern. It gives them progressive realisation of the fact that there can be similarities among difference."

সংহতি শব্দের তাৎপর্য

।। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে জাতীয় সংহতির প্রয়োজনীয়তা ।।

ভারতে বিভেদের রূপটিই খুব স্পষ্ট—একথা অস্বীকার করার কিছু নেই। ইতিহাসের কোন সময়েই সমগ্র ভারতে এক ভাষা, এক ধর্ম প্রচলিত ছিল না, এমন কি কখনো আসমুদ্র হিমাচল একই শাসনাধীনেও ছিল না। এ ছাড়া বিভেদ রয়েছে আমাদের খাদ্যে, বস্ত্রে, জীবন ধারণের পদ্ধতিতে, সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে। তবুও, এতসব বিভেদের মধ্যে কেমন এক অনির্বচনীয় দুর্বার সুতীব্র সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ ভারতীয় জনজীবনকে প্লাবিত করছে যুগ থেকে যুগান্তরে।

দুর্ভাগ্যবশতঃ সাম্প্রতিককালে কিছু বিভেদকামী প্রবণতা ক্রমশঃ প্রবল হয়ে উঠ্ছে। এবং এমন অবস্থা যদি এখনো প্রতিহত করা না যায় তাহলে অচিরেই

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে, ভারতবর্ষ আবার তার রাজনৈতিক অখণ্ডত্ব হারিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয়ে যাবে এবং তেমন সম্ভাবনাও এর মধ্যেই বেশ স্পষ্ট হয়ে দেখা দিচ্ছে। **সুতরাং যদি আমরা আমাদের বহু কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাই তবে জাতীয়-সংহতি সাধন আমাদের এই মুহূর্তের কর্তব্য।**

সংহতির প্রয়োজন

আমরা আমাদের সংবিধানে গণতন্ত্রকে কেবলমাত্র একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবেই গ্রহণ করি নি, তাকে জীবন ধারণের মাধ্যমরূপেও গ্রহণ করেছি। গণতন্ত্রের এই যে নতুন পরীক্ষা তা সার্থকতায় উত্তীর্ণ হবে তখনই যখন গণতন্ত্র আমাদের মধ্যে বহুবাঞ্ছিত ঐক্যবোধ প্রতিষ্ঠায় যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবে। তাই আমাদের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভিত্তি হ'ল ধর্মনিরপেক্ষতা এবং সামাজিক সমতা। এ কারণে ভারতে জাতীয় সংহতি সাধনের লক্ষ্য হবে,

(এক) বিভেদের মধ্যে যে ঐক্যবোধ তাকে অক্ষুণ্ণ রাখা।

(দুই) দ্রুত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও শিক্ষাগত উন্নয়ন সাধন।

(তিন) বহু সংস্কৃতির সমন্বয়ে সামগ্রিক সংস্কৃতিবোধকে সমৃদ্ধ করা।

(চার) বিভেদকামী প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের অবদমন।

(পাঁচ) আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বিপদাশঙ্কার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধান।

এই পরিস্থিতির পটভূমিকাতেই কোঠারী কমিশন্ বলেছেন, "Even more important is the role of education in achieving social and national integration." কিন্তু শিক্ষা এই দায়িত্ব পালন করবে কি ভাবে? শিক্ষাকে শিক্ষার্থীদের ভিতর সচেতনভাবেই কতকগুলো উপলব্ধি জাগ্রত করতে হবে। যেমন:

(এক) ভারত যে অভিন্ন জাতি তা স্পষ্ট করে তোলা।

(দুই) আপেক্ষিক বিরোধের মধ্যেও যে ঐক্যবোধটাই ভারতে সক্রিয় তা স্বচ্ছ করে তোলা।

(তিন) বিভিন্ন প্রাদেশিক শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী থেকেও ভারতের সামগ্রিক সংস্কৃতি সম্পর্কে শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।

(চার) বহুজাতি ও সংস্কৃতির মিলনভূমি যে ভারতবর্ষ এই চেতনা জাগ্রত করা।

(পাঁচ) দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার মধ্যেই যে ভারতের যে কোন সমস্যার সমাধান নিহিত—এই উপলব্ধিকে শক্তিশালী করে তোলা।

(ছয়) দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের উপর গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রের নীতিকে সার্থক করে তোলার দায়িত্বভার অর্পিত—এই কর্তব্যবোধ জাগ্রত করা।

(সাত) দেশের আঞ্চলিক ও স্থানীয় ইতিহাসের তথ্যনিষ্ঠ যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার পটভূমিকা রচনা।

॥ এই পটভূমিকায় ইতিহাসের ভূমিকা ॥

'ভারতীয়ত্ব' বোধের বিকাশে ভারতের ইতিহাস-চর্চার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা রয়েছে। ভারতের ইতিহাস এই কথাটিই বলে দিচ্ছে যে এ হ'ল তাদেরই ইতিহাস যারা ভারতবর্ষ নামক ভৌগোলিক পরিমণ্ডলে বসবাস করে। এখানে কোন আঞ্চলিকতার, কোন খণ্ডাংশের স্পর্শমাত্র নেই। তবু যে ইতিহাস নিয়ে আমরা পঠন-পাঠনের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করি সেখানে কিন্তু এই অখণ্ডরূপটি সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত নয়। আমরা বিচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন ঘটনা বিশ্লেষণ করি। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির সঙ্গেও সেই বিশ্লেষণের কোন যোগাযোগ নেই।

তাই প্রয়োজন হ'ল ভারতের সর্বাত্মক পরিচয়বাহী ইতিহাস রচনার। সর্বদাই যেন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী থাকে সর্বভারতীয় পরিচয় উদ্‌ঘাটন। এটা না পারলেই কেমন বিচ্ছিন্নতা বোধ সৃষ্টি হয় তা একটা উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে। সাধারণভাবে আমরা দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগর রাজ্যের ইতিহাস বেশ বিস্তারিত আলোচনা করি। আকবরের রাজত্বকালের তো প্রশ্নই নেই। কিন্তু আমাদের উপস্থাপন তো কখনো এমন সামগ্রিকরূপ পায় না, যেখানে আমরা দেখাতে পারি যে উত্তরভারতে আকবর যখন এক শক্তিশালী সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বপ্ন দেখছেন তখন দক্ষিণ-ভারতের আর এক শক্তিশালী রাজ্য বিজয়নগর তালিকোটার যুদ্ধে ধ্বংস হয়ে গেল। আমাদের সামগ্রিক চেতনার অভাবেই সমসাময়িক দুটো ঘটনা শিক্ষার্থীদের কাছে দুটো বিচ্ছিন্ন ঘটনায় রূপান্তরিত হয়। সুতরাং প্রয়োজন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের।

নতুন ইতিহাস রচনার প্রয়োজন

সামগ্রিক রূপাঙ্কন

অতঃপর প্রয়োজন হ'ল নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর, বিশেষ করে ভারতের ইতিহাসে যার প্রয়োজন সর্বাধিক। বিরাট দেশের বহু ঘটনা বিচিত্রভাবে চিত্রিত ও বর্ণিত। কিন্তু খোলা মন নিয়ে যদি সত্যটুকু গ্রহণ করতে পারা না যায় তা হলে যে ইতিহাসই শুধু বিকৃত হবে তাই নয়, জাতীয় সংহতি সাধনের কাজও বিড়ম্বিত হবে। সুতরাং মুক্ত মন ও উদার দৃষ্টিশক্তি নিয়েই আমাদের ভারত-ইতিহাসের সন্ধানী হতে হবে।

নৈর্ব্যক্তিক মনোভাব

সর্বশেষে **ভারতের যে বিরাট অতুলনীয় সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার তা যেন ইতিহাসে সুপরিস্ফুট হয়।** আমাদের সংস্কৃতি যেন এক প্রগল্‌ভ নির্বিকার প্রবাহ, বহমান নিরবধি কাল। আর সেই মূল প্রবাহের সঙ্গে যুগে যুগে বহু আঞ্চলিক সংস্কৃতি চেতনা সম্মিলিত হয়ে মূল প্রবাহকেই অধিকতর বেগবতী করেছে। এই সম্পর্কেও আমাদের পরিপূর্ণভাবে সচেতন থাকতে হবে।

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উপর গুরুত্ব আরোপ

।। ইতিহাস ও আন্তর্জাতিক চেতনা ।।

বর্তমান সময়ে মানব সভ্যতার সবচেয়ে বড় সমস্যা হ'ল স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার সমস্যা। স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা বলতে আমরা কেবলমাত্র যুদ্ধাবস্থার অবসানই বুঝি না, স্থায়ী শান্তি কথাটি আরও বেশী গভীর অর্থবহ। তাই বলা হয়েছে, "Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed.

শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রতিবন্ধক

কিন্তু এই শান্তি প্রতিষ্ঠার মানসিকতা গঠনের উপায় কি? **দেখা গিয়েছে, যে কোন হিংসাশ্রয়ী কার্যকলাপের পেছনে যে প্রবৃত্তিগুলো সক্রিয় তা হ'ল ভীতি, সন্দেহ, অবিশ্বাস, স্বার্থান্বেষণ, এবং ক্ষমতার লিপ্সা।** তাই স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগে এইসব প্রবৃত্তি-গুলোর সুশৃঙ্খল অবদমন প্রয়োজন। আর প্রয়োজন মানবতাবাদ সম্পর্কে সুগভীর সহমর্মিতাবোধ। তাই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ্-পত্রের ২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, "Education shall promote understanding, tolerance and friendship among all nations, racial or religious groups and shall farther the activities of the united nations for the maintenance of peace." আমাদের দেশের সংবিধানের ৫১ নং ধারায় বিশ্বশান্তির উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করে বলা হয়েছে :

The state shall endeavour to

(a) promote international peace and security

(b) maintain just and honourable relations between nations.

(c) foster respect for international law and treaty obligations in the dealings of organised peoples with one another.

(d) encourage settlement of international disputes by arbitration.

।। আন্তর্জাতিক সম্প্রতির গুরুত্ব ।।

১৯৬৪ সালে UNESCO-র সাধারণ সভায় আশংকা প্রকাশ করে ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেছিলেন : We live today in a State of Cold War that is Armed fear. It is not peace that we are having but a precarious equilibrium in which dissension does not declare itself because of mutual fear. It is not a state of order, there is no inward tranquility."

শান্তির প্রয়োজন

অথচ অধুনা আমরা এমন এক ঘনপিনদ্ধ বিশ্বে বাস করি যেখানে যে কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা এক বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে। এখন ভৌগোলিক দূরত্ব কোন দূরত্বই নয়, আধুনিক বিজ্ঞান দূরত্বকে নিবিড় নৈকট্যে নিয়ে এসেছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির অপরিহার্যতা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

তাছাড়া **মানুষের জ্ঞানের জগতে এমন এক বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে যেখানে সমস্ত ভৌগোলিক বাধ্যবাধকতা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন।** জ্ঞান জগতের ক্রমবর্ধমান আদান-প্রদানের মধ্য দিয়েই মানুষের উত্তরাধিকার ক্রমশ: সমৃদ্ধ হচ্ছে। প্রযুক্তি বিজ্ঞানের ক্রমবর্ধমান প্রয়োগ মানুষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে খুব স্পষ্ট ভাবেই অনুভূত হয়। আবার এই প্রযুক্তি বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগের ফলেই এক প্রচণ্ড সন্ত্রাস ছায়া ফেলে যায় বার বার বিশ্বব্যাপী। সুতরাং সুষম আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির উপরই নির্ভর করবে জ্ঞানের এই বিস্ফোরণ জনিত ফলশ্রুতিকে আমরা কল্যাণের সাধনায় না ধ্বংসের উন্মত্ততায় প্রয়োগ করবো।

সর্বাত্মক নির্ভরশীলতা

সর্বোপরি **কেমন এক অবোধ মূল্যহীনতায় আজ সমগ্র বিশ্ব আক্রান্ত।** এই মূল্যহীনতার প্রকাশ ঘটে পারস্পরিক সহমর্মিতা বোধের অভাবের মধ্যে, বিশ্বাস-হীনতার মধ্যে। তার ফলে যে কোন উত্তেজক সিদ্ধান্ত যে সারা বিশ্বে কি মহাপ্রলয় ঘটাতে পারে সে সম্পর্কেও আমরা যথেষ্ট সজাগ ও সচেতন নই। তাই "The security against this is the development of international understanding and the idea of world citizenship." এই পরিপ্রেক্ষিতেই বার্ট্রাণ্ড রাশেল্ তাঁর স্বভাবসিদ্ধ অনুকরণীয় ভঙ্গিমায় বলেছেন, "It is more than nine hundred years since Christ said, Thou shall love they neighbour as theyself. I wonder how many more years it will be before people begin to think that this was sound advice."

মূল্য বোধের অভাব

॥ এই পটভূমিকায় ইতিহাসের কর্তব্য ॥

পারস্পরিক জীবনধারা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সচেতনতা এবং বৃহত্তর মানব-সভ্যতার পরিপূর্ণতা অর্জনের পথে পারস্পরিক অবদান এটাই বিশ্বজনীনতা বোধ জাগরণের মূল বিন্দু। এই দিক থেকে ইতিহাসের ভূমিকা অনন্য সাধারণ। ইতিহাস যেমন আন্তর্জাতিক চেতনার ভিত্তিকে দৃঢ় করতে পারে তেমন ধ্বংসও করতে পারে। এটা নির্ভর করে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেমন ভাবে বিশ্লেষণ করা হবে, কেমন ভাবে উপস্থাপিত করা হবে তার উপর। সঙ্কীর্ণ জাতীয় চেতনা থেকে যদি ইতিহাস রচিত হয় তবে সেই ইতিহাস অনায়াসেই বহির্বিশ্ব সম্পর্কে পাঠকের মনে এক গভীর ঘৃণাবোধ জাগ্রত করতে পারে।

ইতিহাসের বিশেষ ভূমিকা

অল্পদিন আগে পর্যন্ত আমরা ইতিহাস বলতে কেবলমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসকেই বুঝতাম। সাম্প্রতিক কালে অবশ্য সামাজিক ইতিহাসের উপরও যথোচিত গুরুত্ব আরোপিত হচ্ছে। এই দিক থেকে UNESCO-র উদ্যোগে ১৯৬৩-র জুনমাসে প্রকাশিত History of mankind গ্রন্থ মালার প্রথম খণ্ডটি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থমালার একটি উপ-নামও রাখা হয়েছে। তা হ'ল: Cultural and Scientific Development. দুই

ইতিহাসের দৃষ্টিগত পরিবর্তন

নামকরণ থেকেই এটা স্পষ্ট যে এখানে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর সমানুক্রমিক বিবরণ দানই লক্ষ্য নয়। লক্ষ্য হ'ল, তুলনামূলক দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস, ধর্মীয় ও আবেগময় জীবন কথা, তাদের শিল্প বিষয়ক কীর্তি-কলাপ ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার বিবরণ দান। এই গ্রন্থমালার প্রথম খণ্ড সম্পর্কে UNESCO সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল রেণে মেহিউ বলেছেন, "For the first time an attempt has been made to present, with respect to the history of consciousness. the sum total of the knowledge which the various contemporary societies and cultures possess···It departs from the traditional approaches to the study of history which, as we know, attach decisive importance to political, economic and even military forces···**This historical study is by itself a cultural achievement, calculated to influence by its spirit and methods the present trend of culture and that, no doubt, is its ultimate end.**"

মানুষের ইতিহাসের বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরগুলি বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করা দরকার। **বিভিন্ন দেশে নতুন নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে মানব-মনের চেতনার দিগন্ত যে ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়েছে, একথা স্পষ্ট করে তুলতে হবে।** কোন দেশ বা কোন জাতি কখনো কোনদিনই নিজেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ভাবে গড়ে তুলতে পারে নি, এটাও যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে হবে।

এরই সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কার বোধ ও সঙ্কীর্ণ বিশ্বাস কিভাবে আমাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় এবং সেই সব সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে বাস্তবতা কতটুকু তাও নৈর্বক্তিক ভাবে বিচার করার সামর্থ যাতে শিক্ষার্থীরা অর্জন করে সে সম্পর্কেও আমাদের তৎপর থাকতে হবে।

রাজনৈতিক ইতিহাসের পরিবর্তন

রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আমাদের চর্চা যদিও বহু পুরোনো, তবু এখানেও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন প্রয়োজন। নিজ দেশের শাসক বা সম্রাট বলে তাকে মহান্ করে দেখানোর প্রবণতা ত্যাগ করতে হবে। আবার আক্রমণকারী বলেই তাকে অগ্রাহ্য না করে সেই আক্রমণ থেকে কি শুভাশুভ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল তার আলোচনাই অনেক বেশী জরুরী।

সুতরাং এই প্রসঙ্গে আমাদের বক্তব্য শেষ করতে হয় এই কথা বলে: No doubt, one of the important objectives of teaching history in schools is to develop in children a love for their own country—that is not inconsistent with internationalism. **In fact to-day the national interests are bound to suffer if international interests are ignored.**"

॥ আন্তর্জাতিকতা ও ভারতের ইতিহাস ॥

ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আমরা শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিকতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে পারি। আমাদের ইতিহাসের প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আমরা কখনোই পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলাম না। সেই আর্যদের ভারত আগমনের সময় থেকে যুগে যুগে যে বিদেশী আক্রমণ হয়েছে তার ফলে বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগের দ্বার হয়ে গিয়েছে উন্মুক্ত। এই দ্বার পথেই এশিয়া ও য়ুরোপের ঘটমানতার সঙ্গে ভারত নিজেকে যুক্ত রেখেছে। বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক এই যোগাযোগকে আরও বর্ধিত করেছে।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতের সংযোগ

প্রাচীনকাল

তারপর বৌদ্ধধর্ম বহির্দেশীয় সম্পর্ককে অধিকতর নিবিড়তর করে তুলতে সাহায্য করেছে। মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারতের বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব এখনো পরিষ্কার অনুভূত হয়।

এরপর এল মুসলমান যুগ। এই সময় মুসলমান আক্রমণকারীদের মাধ্যমেই য়ুরোপ ভারতীয় মননশীলতার পরিচয় পেয়েছে এবং ভারত হয়ে উঠেছে এই মহাদেশের চোখে শ্রদ্ধেয়।

মুসলমান যুগ

ব্রিটিশ যুগে বৈদেশিক প্রভাব আলোচনার অপেক্ষা রাখে না। কে না জানে উনবিংশ শতাব্দীর য়ুরোপীয় চিন্তা জগৎ ভারতবর্ষকে নব চেতনায় উদ্বোধিত করেছিল, পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোয় ভারত নিজেকে নতুন দৃষ্টিতে দেখবার সুযোগ পেয়েছিল, জাপানের উত্থান ও রাশিয়ার বিপ্লব ভারতের সামগ্রিক পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করেছিল আমাদের। আর স্বাধীনোত্তর কালে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ প্রতিষ্ঠায়ই হ'ল আমাদের বহু বিঘোষিত নীতি।

ইংরেজ শাসনকাল

তবে আসল কথা হ'ল, "Teaching of history for international understanding should be done in a natural manner and in the right perspective. It needs special equipment on the part of the history teachers. The personal attitude of the teacher himself is also important. He should have an open mind and see things objectively rather than in a narrow nationalistic manner bordering on chauvinism"

তৃতীয় অধ্যায়

বিদ্যালয়ের পাঠ্য সূচীতে ইতিহাসের স্থান

॥ বিষয়-সংকেত ॥

বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্থানলাভের ইতিহাস—পাঠ্যক্রমে ইতিহাসকে গ্রহণের যৌক্তিকতা—ইতিহাস পাঠের আবশ্যিকতা ও ঐচ্ছিকতা—বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য।

"In East or in West, in ancient or in modern times, in religious or in secular societies, the principles in which it has been proposed to educate the youth have always been checked, reinforced and examplified by reference to the past."

"It is a strange that a subject like history that records man's doings in society and explains the state of civilization in which we find ourselves and as such, is of the widest human appeal, should have failed to convince the school-authorities of its vital importance.

—K. D. Ghosh

"In fact it is no exaggeration to say that from long being the cinderella of the curriculum, she bids fair to be its Queen."

—K. D. Ghosh.

॥ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্থানলাভের ইতিহাস ॥

॥ History of Accepting History as a School Subject ॥

বর্তমানে পৃথিবীর সবদেশের বিদ্যালয় স্তরের পাঠ্যক্রমে ইতিহাস একটি পাঠ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের এই স্থানলাভ কোন আকস্মিক ঘটনা হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বহু বিতর্কের ফলশ্রুতি। আমরা এক্ষণে সেইদিকে আলোকপাত করতে চাইছি।

প্রাথমিক স্তর

একেবারে **প্রাথমিক স্তরে কেবল মাত্র আনন্দলাভের উদ্দেশ্যে ইতিহাস পাঠ করা হ'ত।** তারপর ক্রমশঃ বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসও যুক্ত হ'ল। তখন লক্ষ্য ছিল **ইতিহাসের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দান।** মধ্যযুগেও ধর্ম প্রচারকগণ ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মীয় সংস্থার উপর সাধারণ মানুষের অবিচল বিশ্বাস রাখার জন্য ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা করতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে দেখা গেল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন। জার্মান পণ্ডিত জ্যাকব উইম্‌ফেলিং 'জার্মান জাতীয়তাবাদকে শক্তিশালী করার তাগিদে ইতিহাস শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

এরপর ইতিহাসের ভূমিকাকে স্পষ্টতর করে তুললেন মার্টিন লুথার। তাঁর মতে **ইতিহাসের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদেরই প্রতিফলন দেখতে পাই এবং ইতিহাসের মধ্য দিয়ে ঈশ্বরও নিজেকে প্রকাশ করেন।** তাই ইতিহাসকে হতে হবে সত্যের প্রবক্তা এবং ঐতিহাসিক হবেন একজন নির্ভীক সমালোচক ও নিরপেক্ষ শক্তিমান লেখক। তাই লুথারের বিশ্বাস ঐতিহাসিক হলেন the most useful of men and the best of teachers.

মার্টিন লুথারের অভিমত

অন্যদিকে স্পেনের লুই বাইব্‌স বললেন, ইতিহাস হ'ল সর্বোৎকৃষ্ট পাঠ্য বিষয়। তাঁর মতে, where there is history, children have transferred to them the advantages of old men ; where history is absent, old men are as children. তিনি আরও বলেছেন, "It is one study which either gives birth to or nourishes, develops, cultivates all arts" কারণ ইতিহাসই হ'ল গতি-নির্দেশক, আমাদের পথ-প্রদর্শক।

লুই বাইব্‌স-এর অভিমত

এই নীতির উপর ভিত্তি করে এই সময়ের আর একজন পণ্ডিত **জোহানীস শ্লিডেনাস** "Four Monarchis" নামে একখানি ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি জার্মানী, ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের শিক্ষক মহলে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল।

শ্লিডেনাশ

পাঠ্য বিষয় হিসেবে ইতিহাসের বিবর্তনে পরবর্তী অবদান হ'ল প্রখ্যাত **শিক্ষাবিদ্ কমেনিয়াসের।** তিনি শিক্ষার সমগ্র স্তরে ইতিহাসকে পাঠ্য হিসেবে গ্রহণের পক্ষে অভিমত প্রকাশ করেছেন। শুধু তাই নয়। ইতিহাসের পাঠ্যক্রম কেমন হওয়া উচিত তার একটা রূপরেখাও তিনি অঙ্কন করেছেন। তা হ'ল, প্রাথমিক স্তরে পৃথিবীর ইতিহাস, মাধ্যমিক স্তরে সামাজিক ইতিহাস এবং পরবর্তী স্তরে জাতীয় ইতিহাস পড়ানো হবে।

কমেনিয়াস্

এই সঙ্গে আর একটি নাম উল্লেখযোগ্য। তা হ'ল খ্রীষ্টিয়ান উইজী। ইনি ইতিহাস পাঠে সমসাময়িকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস হ'ল, **বর্তমানের প্রয়োজন অনুসারেই অতীতের পাঠ্য নির্বাচন করা দরকার।** তারপর সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে জার্মানীর অধ্যাপক কেলারিয়াস ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক এই তিনভাগে বিভক্ত করেন এবং এই যুগভাগের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক রচনা করেন।

উইজী

কেলারিয়াস্

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই বিদ্যালয়ে ইতিহাস পড়ানোর প্রকৃত উৎসাহ সৃষ্টি হয়। এই সময় ভলটেয়ার রচনা করলেন সভ্যতার ইতিহাস। গিবন্ লিখলেন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের কাহিনী। চার্লস রোলিন প্রকৃত নীতি শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে ইতিহাস পাঠের উপর জোর দিলেন।

এইভাবে দেখা গেল, ফ্রান্সে সমস্ত বিদ্যালয় পাঠ্যক্রমে ইতিহাস পরিপূর্ণ মর্যাদায় স্বীকৃতি পেল। জার্মানীতেও এই উদ্যোগ আরম্ভ হ'ল। ইউরোপের অন্যান্য দেশের শিক্ষাসংস্কারকগণ ইতিহাসের অপরিহার্যতা ক্রমশঃ স্বীকার করে নিলেন। ইংলণ্ডেও এই সময়েই শিক্ষার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রনায়ক ও সুনাগরিক তৈরী করার প্রয়াস শুরু হ'ল। ফলে এখানেও ইতিহাস আপন মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হ ল।

রুশো

এই শতাব্দীতেই শিক্ষাবিদ্ রুশো এক ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাসকে বিচার করতে চাইলেন। **তিনি বললেন, নির্লিপ্তভাবে মানুষকে বিচার করবার জন্যই তার অতীতকে জানতে হবে। এক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রসঙ্গের কোন ভূমিকা নেই।** কোন মূল্য নেই ঐতিহাসিকের অভিমতেরও। বরং এই অভিমত শিক্ষার্থীর নিজস্ব চিন্তাধারা বিকাশের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক স্বরূপ। কারণ সবকিছু জেনে, বিচার করে শিক্ষার্থী কোন বিষয় সম্পর্কে নিজেই যাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে এমন সামর্থ অর্জনে সাহায্য করাও শিক্ষার কাজ। এ ছাড়া রুশো সামাজিক পঙ্কিলতার বাইরে যে ব্যক্তি-মানুষ তার জীবনী পাঠের মাধ্যমে ইতিহাস জানাতে চেয়েছেন তাঁর এমিলকে।

ফ্রেডারিক দি গ্রেট

প্রুশিয়ার ফ্রেডরিক দি গ্রেট আইন করে ইতিহাসকে বিদ্যালয়ের আবশ্যিক পাঠে রূপান্তরিত করেন। তাঁর মতে, ইতিহাস একদিকে যেমন সত্যানুসন্ধানী, পাঠকের চিন্তা ও বিচার শক্তি বিকাশে সহায়ক, অন্য দিকে তেমনি নীতিজ্ঞান ও দেশের শাসকবর্গের আনুগত্য বোধ জাগ্রত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম।

জার্মানীর বেসডো বর্তমান থেকে ক্রমশঃ অতীতের দিকে পিছিয়ে গিয়ে ইতিহাস পড়াতে বলেছেন। ট্রগপ্‌ ইতিহাস পাঠে শিক্ষার উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বললেন। **ক্যাম্প্** প্রাচীন বীরত্বপূর্ণ উপকথাকেই শিশু-ইতিহাসের উপজীব্য হিসেবে গ্রহণ করতে বললেন। অন্যদিকে **সল্‌জম্যান** স্পষ্ট বলে দিলেন, "History, as it is ordinarily taught. lifts the pupil out of the society of the living and places him in the society of the dead." তিনি ইতিহাস থেকে উপাখ্যানকে বাদ দিয়ে শিক্ষার্থীর সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার কথাই বললেন।

যাই হোক অষ্টাদশ শতাব্দীতেই দেখা গেল ইতিহাস পাঠ্য বিষয় হিসেবে সর্বত্রই গৃহীত এবং ইতিহাসের পরিধি মোটামুটি মধ্যযুগ পর্যন্ত সীমিত। বিষয়বস্তুতে ছিল

বিশ্ব ইতিহাসের একটি সাধারণ পাঠ, নৈতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাইবেল বর্ণিত ইতিহাস, এবং চারিত্রিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণ থেকে অতীতের খণ্ডাংশে।

উনবিংশ শতাব্দীতে আরম্ভ হ'ল বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চা। এর থেকেই তিন শ্রেণীর মতবাদের জন্ম। **প্রথম মতবাদ হ'ল অনুবন্ধ তত্ত্ব** যার মূল প্রবক্তা হলেন হার্বার্টের অনুগামী জিলার্। এরা ইতিহাসকে কেন্দ্র করে অন্যান্য বিষয় পঠন-পাঠনের সুপারিশ করলেন।

দ্বিতীয় মতবাদ প্রজ্ঞাতত্ত্ব যার বিকাশ মূলতঃ জার্মানীতে। এই মতবাদ অনুসারে নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতির অনুসন্ধানই হ'ল ইতিহাস। এই মতবাদ ক্রমশঃ ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

তৃতীয় মতবাদ হ'ল বিজ্ঞান-তত্ত্ব যার বিকাশ হয়েছে ফ্রান্সে। এই মতবাদ অনুসারে, সত্যকে প্রকাশ করা যেহেতু সকল বিষয়েরই লক্ষ্য, সেই হেতু ইতিহাসেও যেন এর কোন ব্যতিক্রম না ঘটে।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই সময় পর্যন্ত চলেছে ইতিহাস রচনা পঠন-পাঠন সম্পর্কে পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের পর্যায়। বহু আলাপ-আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হ'ল, সামাজিক সচেতনতা ও ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা এবং বর্তমান সম্পর্কে আগ্রহশীল করাই হবে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র

আবার **প্রথম বিশ্বযুদ্ধকে** কেন্দ্র করে জাতীয় চেতনা জাগরণই হয়ে উঠ্‌লো ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য। কিন্তু যুদ্ধ শেষে জাতি-সংঘের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক সদ্ভাব সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে ব্যবহার করার প্রবণতা দেখা দিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে UNESCO-র উদ্যোগে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ স্থাপনই ইতিহাসের অন্যতম লক্ষ্য বলে চিহ্নিত হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় ইতিহাস ছাড়াও সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিবর্তনের কাহিনীও ইতিহাসে উত্তোরোত্তর অধিকতর গুরুত্ব পেতে লাগলো।

॥ পাঠ্যক্রমে ইতিহাসকে গ্রহণের যৌক্তিকতা ॥

আজ ইতিহাস সর্বদেশে সকল বিদ্যালয়ে একটি অন্যতম পাঠ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। অথচ ইতিহাস এমন একটি বিষয় যার কোন তাৎক্ষণিক বাস্তব উপযোগিতা নেই। অন্ততঃ বিভিন্ন বৃত্তি শিক্ষামূলক বিষয়ের তুলনীয় তো বটেই। তবুও ইতিহাসের এই যে বিশ্বব্যাপী সার্বজনীন স্বীকৃতি তা নিশ্চয়ই সূক্ষ্ম পর্যালোচনার অপেক্ষা রাখে। আমরা এবার এই পর্যালোচনাতেই প্রবৃত্ত হ'ব।

॥ মনস্তাত্ত্বিক দিক ॥

ইতিহাস যে রচিত হ'ল তার গোড়ার কথাটা কি ? তা হ'ল মানুষের সীমাহীন অনুসন্ধিৎসা। **মানুষের প্রবৃত্তি-ই হ'ল অদেখাকে দেখার, অজানাকে জানার।** সেই মানুষ তাই স্বভাবতঃই একদা জানতে চেয়েছিল তার পটভূমিকা, যে পটভূমিকা তাকে আজকের পর্যায়ে উন্নীত হতে সাহায্য করেছে। এই চাওয়া থেকেই জন্ম হ'ল ইতিহাস নামক বিষয়টির। মেট্‌ল্যাণ্ড যথার্থই বলেছেন ইতিহাস হ'ল "the study of man's progress from his weak shady beginning to the splendour of his present position." সুতরাং ইতিহাস যেমন মানুষের কৌতূহলকে জাগ্রত করেছে তেমনি সেই কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে সাহায্যও করছে।

অনুসন্ধিৎসা

অন্ততঃ বয়ঃসন্ধিকাল পর্যন্ত মানুষের এই কৌতূহলী মন থাকে সদা-জাগ্রত। এই সময় মানুষের মন কল্পনার ডানা মেলে উড়ে চলে যায় দেশ থেকে দেশান্তরে, কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে। মানুষের অগ্রগতির যে ধারাবাহিক কাহিনী তা এমনই লোমহর্ষক, চিত্তাকর্ষক এবং বিস্ময়কর যে মানুষের এ সময়কার কল্পনা বিলাসও এখানে পরাজিত হয়। তাই **এই কল্পনা-বিলাসকে তৃপ্ত করার যে প্রয়োজনীয়তা মনস্তত্ত্বে স্বীকৃতি পেয়েছে, ইতিহাস সেই ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।**

বয়ঃসন্ধিকালের প্রয়োজন

শুধু মাত্র কৌতূহল চরিতার্থ করাটাই বড় কথা নয়। এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যান্য প্রসঙ্গও। ইতিহাস এমন একটি সুশৃঙ্খল পদ্ধতি অনুসরণ করে যা সর্বাংশে বিজ্ঞানভিত্তিক। শিক্ষার্থীকে যদি আমরা ইতিহাসের পদ্ধতিগত দিকটির সঙ্গেও সঠিকভাবে পরিচিত করাতে পারি তাহলে **ইতিহাসের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরও একটি সুস্থ এবং সুশৃঙ্খল মানসিক কাঠামো গড়ে উঠবে।** সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে এই মানসিক কাঠামোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে।

সামগ্রিক ব্যক্তিত্ব বিকাশ

ইতিহাসের শিক্ষা হ'ল সংকীর্ণতা পরিহারের শিক্ষা। ইতিহাসের দীক্ষা হ'ল ঔদার্যের দীক্ষা। দেশ, জাতি ও সমাজের ঊর্ধ্বে যে সামগ্রিক মানবিক সত্তা তাই হ'ল শেষ কথা এবং এই সত্তার পরিপূর্ণতার জন্য কোন সংকীর্ণ ভেদাভেদের ভূমিকা নেই। জাতিগত উগ্রতা পরশ্রী-কাতরতা, পারস্পরিক বিশ্বাস-হীনতা, সংস্কারগত সংকীর্ণতা কেবলমাত্র সেই সত্তার ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সত্যের উপলব্ধি শিক্ষার্থীকেও উদার নীতিতে আস্থাশীল করে তোলে।

ঔদার্যবোধ

ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর যুক্তবাদী চিন্তাধারা, বিশ্লেষণী বুদ্ধিবৃত্তি, নিরপেক্ষ বিচারশক্তি, নৈর্বক্তিক মানসিকতা, সহনশীলতা, সংবেদনশীলতা প্রভৃতি

গুণাবলী অর্জন করতে পারে। তাছাড়া স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধি ও সত্যানুসন্ধানের প্রবৃত্তি এসব গুণাবলীও শিক্ষার্থীর জীবনে ইতিহাসের অসামান্য অবদান। এইসব গুণাবলী সামাজিক জীবনে সুস্থ জীবন যাপনের প্রয়োজনে যে একান্তই অপরিহার্য সেই সম্পর্কে সংশয় প্রকাশের কোন সুযোগই নেই।

অন্যান্য গুণাবলী

॥ সমাজতাত্ত্বিক দিক ॥

একসময় ছিল যখন ইতিহাস বলতে বুঝাতো রাজা ও রাজবংশের কাহিনী আর যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণী। কিন্তু ক্রমশঃ এল দৃষ্টিভঙ্গীর ক্ষেত্রে এক পরিবর্তন। সাম্প্রতিক দৃষ্টিভঙ্গী হ'ল, রাজা আর রাজবংশ, যুদ্ধ আর বিগ্রহ—এইসব কাহিনী আর ইতিহাসের মূল উপজীব্য বিষয় নয়, তার পরিবর্তে **মানুষ ও তার সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার সুচারু বিশ্লেষণই হ'ল ইতিহাস।** এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গীটি টেরেন্স সুন্দরভাবে বর্ণনা করে বলেছেন, "I am a man, whatever concerns man is of interest to me."

সাম্প্রতিক বিষয়

এই যে ইতিহাসের নতুন বক্তব্য তার কারণ অনুসন্ধান খুব আয়াসসাধ্য নয়। আমরা আজ যে পটভূমিকায় বসবাস করি, আমাদের স্বাভাবিক কৌতূহল হতে পারে সেই পটভূমিকার বিবর্তন সম্পর্কে স্বচ্ছ জ্ঞান অর্জন করবার। তাছাড়া যে সভ্যতা মানুষ আজ গড়ে তুলেছে তা যে বিচ্ছিন্নভাবে কোন দেশ বা জাতির সৃষ্টি নয়, কিংবা বিচ্ছিন্নভাবে কতকগুলো ব্যক্তিত্বের নিঃসঙ্গ অবদান নয়, এটা আমাদের বুঝতে হবে। সর্বোপরি **বর্তমানের ঘটনাবলীকে যদি সুচিন্তিত বিচার করতে হয় তবে সেই ঘটনাবলীর পশ্চাদ্‌পটও আমাদের জানা দরকার।** অর্থাৎ বর্তমানের নির্ভুল বিচারের জন্যও অতীত বা ইতিহাস। মর্লে তাই বলেছেন, "It is the present which really interests us ; it is the present we seek to understand and explain. I want to know what men thought and did in the 13th century not out of idle antiquarian curiosity but because the 13th century was at the root of thought and action in the 19th century." **আবার বর্তমানের সঠিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারি।** তাই ইতিহাসের অন্যতম কাজ হ'ল ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা। এই কথাটি পরিষ্কার ব্যাখ্যা করে স্যার্ জন্ সিলি বলেছেন : "I tell you that when you study history, you study not the past of England but her future. It is the welfare of the country, it is your whole interest as citizens, that is in question when you study history."

মানুষের সামগ্রিক পরিচয়

তা হলে দেখা গেল, **ইতিহাসের নতুন পরিক্রমার গতিপথ হ'ল মানুষ ও তার সমাজ জীবন।** এই নতুন গতিপথের তাৎপর্য কেবলমাত্র তাত্ত্বিকই নয়, এর **একটি ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাও রয়েছে।** আজকের গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নাগরিকদের সমাজ-সচেতনতার গুরুত্ব কোন ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আজকের শিক্ষার্থীই হ'ল আগামী দিনের নাগরিক। সুতরাং তাদের মধ্যে সমাজ সচেতনতার বীজরোপন করতে হলে তাদের সম্মুখে সমাজের সামগ্রিক চিত্রটিই পরিস্ফুট করে তুলতে হবে। ইতিহাসের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এই গুরু দায়িত্বভার নিঃশব্দে বহন করে চলেছে।

নতুনপথের ব্যবহারিক দিক

॥ বাস্তব উপযোগিতার দিক ॥

অন্যান্য বৃত্তিমূলক ব্যবহারিক বিষয়ের মত পার্থিব উপযোগিতা ইতিহাসের না থাকলেও ইতিহাস এমন কতকগুলো বাস্তব প্রয়োজন মিটিয়ে চলেছে যে তারও মূল্য উপেক্ষণীয় নয়।

গণতান্ত্রিক ভাবাদর্শ শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রতিফলিত করা, তাদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে দেশ গঠনের কাজে নিয়োজিত আজকের পৃথিবীতে যে কোন দেশের শিক্ষা-ব্যবস্থার ঈপ্সিত লক্ষ্য। গণতান্ত্রিক চেতনা জাগরণের জন্য শিক্ষার্থীকে নাগরিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। দেশপ্রেম জাগরণের জন্য তাদের সম্মুখে নিজ নিজ দেশের সামগ্রিক চিত্রটি তুলে ধরতে হবে। উভয় প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে আমরা যথেষ্ট নির্ভরতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি।

গণতন্ত্র ও দেশপ্রেম

"History furnishes to the child a splendid guide to a vast storehouse of knowledge—the great home of knowledge in which the child may search at will. এই জ্ঞান ভাণ্ডার কিসের? জ্ঞান ভাণ্ডার হ'ল মানব সংস্কৃতির ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকারের। **ইতিহাস এই উত্তরাধিকারকেই—আপন বক্ষে ধারণ করে রেখেছে অনন্তকালব্যাপী মানুষের অপরিসীম জ্ঞান-পিপাসাকে চরিতার্থ করবার জন্যে।** শিক্ষার্থী এই উত্তরাধিকারের চর্চার মধ্য দিয়েই জানতে পারবে নিজেদের প্রকৃত পরিচয়।

মানব উত্তরাধিকার অন্বেষণ

শিক্ষার্থীর সুচরিত্র গঠনে সাহায্য করাও শিক্ষার অপর একটি উদ্দেশ্য। ইতিহাস তো নিজেকে পূর্ণ করে রেখেছে কত মানুষের সাফল্য আর ব্যর্থতার অন্তহীন কাহিনী দিয়ে। এইসব কাহিনী একদিকে যেমন শিক্ষার্থীর ভেতর নীতিবোধ জাগ্রত করে, অন্যদিকে তেমনি চরিত্র-গঠনের অনুকূল সাম্যবাদের সন্ধান দেয়। কারণ ইতিহাস তো নিয়তই সত্য-সন্ধানী এবং সত্য-নিষ্ঠা যে কোন মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্।

চরিত্র গঠন

বর্তমান প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের যুগে মানব-জীবন একদিকে যেমন বিজ্ঞান-নির্ভর অন্যদিকে সেই বিজ্ঞানই তার প্রচণ্ড বিভীষিকা। যদি বিজ্ঞানকে সর্বতোভাবে কেবলমাত্র আশীর্বাদ হিসেবেই পেতে চাই, যদি পৃথিবীকে ধ্বংসের দুঃসহ বিভীষিকা থেকে অব্যাহতি দিতে চাই, তা হলে প্রয়োজন হ'ল আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি। এই সম্প্রীতি সম্প্রসারণের কাজে ইতিহাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

আন্তর্জাতিক সম্প্রীতি

শিক্ষাবিদরা বলে থাকেন, "Our great endeavour today is to train boys and girls to think and to think in an orderly dispassionate manner." **এই যে যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তির কথা বলা হ'ল ইতিহাস এই শক্তির সুষম বিকাশে বিশেষ সহায়তা করে।** প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস যে পদ্ধতিগত প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে রচিত হয় তার অনুধাবন এবং অনুসরণ শিক্ষার্থীর শিক্ষাগত ও বৌদ্ধিক বিকাশে বহুদিক থেকে সাহায্য করে থাকে।

যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তি।

॥ ইতিহাস পাঠের আবশ্যিকতা ও ঐচ্ছিকতা ॥

ইতিহাসকে যখন বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে গ্রহণ করার যৌক্তিকতা সম্পর্কে প্রশ্ন করার আর কোন অবকাশ রইলো না, তখন এল পরবর্তী প্রশ্ন: **ইতিহাসকে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে না ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা যুক্তি সঙ্গত।** এই প্রশ্নের জবাব দেবার দায়িত্বও আমাদেরই গ্রহণ করা উচিত।

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোন একটি নির্দিষ্ট দিকে বিশারদ করে তোলার প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। এর কারণও খুব দুরধিগম্য নয়। শিক্ষার বাস্তব উপযোগিতা দ্বিমুখী—প্রথমতঃ শিক্ষার্থী যেন তার লব্ধ শিক্ষার সাহায্যে ভবিষ্যৎ কর্মময় জীবনে সহজ প্রবেশাধিকার পায়। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ কর্মী-জীবন যেন সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার অনুকূল হয়। এই পারিপার্শ্বিকতায় স্বভাবতঃই সন্দেহ এসে যায় ইতিহাসের ভূমিকা সম্পর্কে।

বিশেষীকরণ শিক্ষার প্রয়োজন

এই সন্দেহের নিরসন আমরা করতে পারি দুই দিক থেকে।

প্রথমতঃ অধুনা আমরা যতই বিশেষীকরণের কথা বলি না কেন সত্যকে আমরা কখনোই এড়িয়ে যেতে পারছি না, তা হ'ল **আধুনিক জ্ঞানের ক্রমপ্রসারমান ব্যাপকতা, গভীরতা ও জটিলতার পরিপ্রেক্ষিতে সাধারণ শিক্ষার একটি পোক্ত ভিত্তিভূমি ছাড়া বিশেষীকরণের শিক্ষা কেবলমাত্র নিজের পায়ে ভর রেখে দাঁড়াতে পারে না।** প্রকৃতপক্ষে সাধারণ শিক্ষার স্তরটি হ'ল বিশেষীকরণ শিক্ষার প্রস্তুতিপর্ব। তাই এই প্রস্তুতিপর্বে ইতিহাস যে একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে

সাধারণ শিক্ষার প্রয়োজন

বিবেচিত এবং গৃহীত হওয়া উচিত সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ **বিশেষীকরণের শিক্ষার সার্থকতা নির্ভর করে গভীর মানবতাবোধের উপর।** বিশেষীকরণের শিক্ষা তো সামাজিক প্রয়োজনকেই মেটাবে। কিন্তু সেই সামাজিক প্রয়োজনটা কি তা জানার জন্য সমাজকে তো জানতে হবে। আজকের পরিবেশে যে উদ্দেশ্যহীনতা, যে গভীর হতাশাবোধ, যে জীবন-যন্ত্রণা তরুণ-সমাজকে নিয়মিত এক চূড়ান্ত অবক্ষয়ের পথে নিয়ে যাচ্ছে তার মূল কারণ হ'ল আমাদের সামাজিক মূল্যহীনতা। এবং আমরা যতক্ষণ এই মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনতে না পারছি—ততক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষাক্ষেত্রে যত পরীক্ষা-নিরীক্ষাই চলুক না কেন তা কখনোই সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারবে না। স্থতরাং এই মুহূর্তে সর্বাগ্রে প্রয়োজন হ'ল সামাজিক মূল্যবোধের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। আর এই প্রতিষ্ঠার কাজে ইতিহাসের ভূমিকা অনন্য-সাধারণ। কারণ ইতিহাস তো হ'ল সমগ্র মানব-সভ্যতা ও সংস্কৃতির এক যৌথ উত্তরাধিকার।

মানবতাবোধ জাগরণ

তাই আজ দেখি সর্বদেশে শিক্ষার একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত ইতিহাস আবশ্যিক বিষয় এবং পরবর্তী স্তরেও একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে ইতিহাসের স্থান স্থনির্দিষ্ট। আমাদের দেশেও সাম্প্রতিক কালে কোঠারী কমিশন যে স্থপারিশ করেছেন তাতেও ইতিহাসের এই ভূমিকার কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

॥ বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে ইতিহাস পাঠের লক্ষ্য ॥

আবশ্যিক হোক আর ঐচ্ছিক হোক বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের স্থান সম্পর্কে যখন আর কোন সংশয়ের অবকাশ থাকলো না, তখন আমাদের বিবেচ্য, বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে কোন্ কোন্ লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে ব্যবহার করা হবে।

আলোচনার স্থবিধের জন্য আমরা বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তিনটি ভাগে ভাগ করে নিই—প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক। কোঠারী কমিশন্ যে নতুন শিক্ষা কাঠামোর কথা বলেছেন সেখানে প্রাথমিক শিক্ষার স্থায়িত্বকাল সাত বা আট বৎসর। এই সময়কে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা হয়েছে—নিম্ন প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক। আমাদের করা প্রাথমিক ভাগটি কোঠারী কমিশনের নিম্ন-প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত বিস্তৃত। এরপর কোঠারী কমিশনের মাধ্যমিক স্তর, সেক্ষেত্রেও উপ-বিভাগ দুইটি, যথাঃ নিম্ন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক। আমাদের মাধ্যমিক ভাগ বলতে বুঝায় কোঠারী কমিশনের উচ্চ প্রাথমিক ও নিম্ন মাধ্যমিককে যুক্ত ভাবে। স্থতরাং এই স্তর বিন্যাসের উপর ভিত্তি করে এবার আমরা পরবর্তী আলোচনায় অগ্রসর হ'ব।

বর্তমান শিক্ষা কাঠামো

॥ প্রাথমিক স্তর ॥

এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা হ'ল আট থেকে দশ। তাই এই স্তরে ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য স্থির করার কালে আমাদের এই বয়ঃসীমার কথা মনে রাখতে হবে। এখন শিক্ষার্থীরা কল্পনা প্রবণ ও কৌতূহলী। কিন্তু তারা যুক্তিবাদী চিন্তা-চেতনায় সক্ষম নয়। তাই এই স্তরে **ইতিহাস চর্চার প্রথম লক্ষ্য হবে, ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহশীল করে তোলা।** তারা আগ্রহশীল হবে যদি ইতিহাসকে এখন গল্প বলার ভঙ্গিমায় পরিবেশন করা যায়। অন্ততঃ তারা এখন এটুকু বুঝুক যে তারা যে দেশে বাস করে সেই দেশেরও এক দীর্ঘ পুরানো ইতিহাস রয়েছে যা তাদের জানতে হবে বুঝতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ অতীতের খ্যাতিমান ব্যক্তিত্বের কাহিনী তাদের জানতে হবে। **লক্ষ্য হবে এই স্তরে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্ততঃ ভাল-মন্দের তারতম্য বিচারের চৈতন্যোদয় ঘটুক।** মানুষের সংসারে মানুষেরই মঙ্গল করতে গিয়ে মহাপুরুষেরা যে কত বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে এসেছেন, কত ত্যাগ অম্লান বদনে মেনে নিয়েছেন, কত ঝড়-ঝঞ্ঝা সহ্য করেছেন—এটুকু শিক্ষার্থীরা অনুভব করুক। **তাই সহজ-সরল-অনাড়ম্বর ইতিহাসই হ'ল এই স্তরের ইতিহাস।**

॥ মাধ্যমিক স্তর ॥

এই স্তরে শিক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা হ'ল এগারো থেকে চৌদ্দ বা পনের বৎসর। এখন শিক্ষার্থীর কৈশোরের কিশলয় ক্রমশঃ পর্ণে পরিণত হতে চলেছে যৌবনের শ্যামল-গৌরবে। ক্রমশঃ তারা এখন বাস্তবমুখী, তাদের চিন্তা শক্তি ও স্মৃতি শক্তি ক্রিয়াশীল। তাদের মধ্যে ক্রমশঃ এসে যাচ্ছে নিজস্ব পরিবেশ সম্পর্কে সজাগ সচেতনতা। সুতরাং এই মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই এখনকার ইতিহাস শিক্ষার লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে।

এই স্তরে ইতিহাসকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে ঘটনা ঠিক যেভাবে ঘটেছিল সেইভাবে বিবৃত করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যেন বিবর্তনের ধারাটি অনুভব করতে পারে, সমসাময়িক ঘটনা, আন্তর্জাতিকতা ও কার্য-কারণ সূত্রে ইতিহাসকে গ্রথিত করতে পারে। তাছাড়া গণতান্ত্রিক নাগরিকতা ও জাতীয়তাবোধকে বিকশিত করবার জন্য যেমন স্থানীয় ও জাতীয় ইতিহাস পাঠ হবে তারই সঙ্গে বিশ্বজনীনতা বোধও যাতে উপেক্ষিত না হয় সেইজন্য জাতীয় ইতিহাস পর্যালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-প্রসঙ্গও উত্থাপিত হবে।

এই স্তরে আর একটি দিক সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তা হ'ল এই স্তরের সঙ্গেই সাধারণ শিক্ষার স্তর শেষ হবে। এমন হতেই পারে যে কিছু সংখ্যক শিক্ষার্থী এই

স্তরের শিক্ষা সমাপন করার সঙ্গে সঙ্গেই ছাত্র জীবন সাঙ্গ করবে। কিংবা তা না করলেও পরবর্তী স্তরে ইতিহাস হবে ঐচ্ছিক বিষয় যা প্রায় বিশেষীকরণের পর্যায়ভুক্ত হবে। তাই মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাসের পাঠ এমন পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে যাতে একদিকে এই বিষয়ের অমূল্য অবদান থেকে কোন শিক্ষার্থী বঞ্চিত না হয়, তেমনি অন্যদিকে ইতিহাসকে উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

॥ উচ্চমাধ্যমিক স্তর ॥

এক্ষণে শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণভাবে বয়ঃসন্ধিকালে উপনীত। এই সময়ের যে এক অদ্ভুত মানসিকতা তার পরিচর্যা হবার মত প্রচুর সম্ভার ইতিহাস থেকেই সংগৃহীত হতে পারে। সুদূরের সান্নিধ্য লাভ, অদৃশ্যকে ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য করে তোলা, বিশ্বব্যাপী সখ্যতার প্রসার—বয়ঃসন্ধিকালের এইসব প্রবৃত্তি অনায়াসে ইতিহাস মিটিয়ে দিতে পারে।

তাই এই স্তরে ইতিহাসকে হতে হবে যুক্তিবাদী মননশীলতায় প্রাজ্ঞ ও তীক্ষ্ণ সমাজ-দ্রষ্টা। শিক্ষার্থীর সীমাহীন কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য ইতিহাসের পদ্ধতির সঙ্গে যেন তার পরিচয় হয় তেমন সুযোগ সৃষ্টি করে দিতে হবে। এক কথায় এই স্তরে প্রথমে ইতিহাসের মৌল লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করতে হবে। তারপর ইতিহাস পাঠের সাহায্যে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি বৃত্তির যথাযথ রূপায়ণ করতে হবে। সর্বশেষে উচ্চতর পর্যায়ে ইতিহাস চর্চার উপযোগী করে তোলার জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাসের পদ্ধতি সম্পর্কেও তাদের অবহিত করতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

ইতিহাসের পাঠ্যক্রম

॥ বিষয়-সংকেত ॥

ভূমিকা—পাঠ্যক্রম রচনার কয়েকটি সাধারণ নীতি—বিষয়-বিন্যাস সম্পর্কীত কয়েকটি পদ্ধতি—জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি—কালচার ইপক্ মতবাদ—বিষয় সংগঠন সম্পর্কীত কয়েকটি পদ্ধতি—পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে নব প্রবর্তিত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম।

"The ideal of the teacher should be to so plan his history courses as to give pupils a broad sweep of historical development and not to drill them in the details of any one of the sources of study."

—*Tout.*

॥ ভূমিকা ॥

বিদ্যালয়ের সামগ্রিক পাঠ্যক্রমে ইতিহাসের অবস্থিতি সুনিশ্চিত হলেও ইতিহাসের নিজস্ব পাঠ্যক্রম রচনার কাজটি কিন্তু খুব সহজসাধ্য নয়। কারণ ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে কতকগুলো মৌল সমস্যা যেগুলো আদৌ উপেক্ষণীয় নয়, বরং সেই সমস্যা সমূহের যথাযথ সমাধান খুঁজে পাওয়া গেলে প্রাথমিক কাজটিই আরও জটিলতার আবর্তে যায় হারিয়ে। এই সমস্যাগুলো হ'ল **বিষয় নির্বাচনের সমস্যা** বা problem of selecting materials, **বিষয়বস্তুর স্তর বিন্যাসের সমস্যা** বা problem of grading materials এবং **বিষয়বস্তুর সংগঠনের সমস্যা** বা problem of organising materials.

॥ বিষয় নির্বাচনের সমস্যা ॥

॥ Problem of Content Organisation ॥

প্রথমেই আসা যাক বিষয় নির্বাচনের সমস্যা প্রসঙ্গে। **ইতিহাসের কর্মক্ষেত্র যেমন ব্যাপক তেমনি বিস্তৃত।** বিশ্ব-প্রসঙ্গ, জাতীয়, স্থানীয় ও আঞ্চলিক প্রসঙ্গ—এর কোনটাকেই ইতিহাসের পরিধির বাইরে রাখা যায় না। আবার যেমন আছে রাজনৈতিক ইতিহাস তেমনি আছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস। এর কোনটার মূল্যই আমরা লঘু করে দেখতে পারি না।

বিষয়-বৈচিত্র

তারপর রয়েছে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে **মানসিক গঠনের বৈচিত্র।** এই বৈচিত্রকে অবজ্ঞা করেও পাঠ্যক্রম রচিত হতে পারে না, বিশেষ করে আধুনিক শিক্ষা যখন মনোবিজ্ঞানকেই ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে।

এর সঙ্গেই জড়িয়ে আছে **মূল্য ও উপযোগিতার সমস্যা।** একদিকে শিক্ষার্থীকে যেমন বিশ্বজনীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তেমনি অন্যদিকে তার মধ্যে দেশাত্মবোধও জাগ্রত করতে হবে। এরই ফাঁকে ইতিহাসের কার্য-কারণ সূত্রটিও স্পষ্ট করে তুলতে হবে। আবার শিক্ষার্থীকে সমসাময়িকতার সঙ্গে পরিচিত করাতে হলে প্রকৃত ঘটনা ও উর্বর কল্পনা এবং যথার্থ বাস্তবতা ও উদ্দেশ্যমূলক প্রচারের মধ্যে প্রভেদটুকু আবিষ্কার করার পদ্ধতিও শিক্ষার্থীকে জানতে হবে।

[মার্জিনে: ...ল্য ও উপযোগিতার সমস্যা]

সর্বশেষে যে **বাস্তব পরিস্থিতি** আমরা কখনো বিস্মৃত হতে পারি না তা হ'ল : বিদ্যালয়ের শিক্ষাকালের সামগ্রিক দৈর্ঘ, বিভিন্ন স্তরে ইতিহাসের জন্য নির্দিষ্ট সময়সীমা, শিক্ষোপকরণের লভ্যতা এবং তা ব্যবহারের সুযোগ, সুযোগ্য শিক্ষকের উপস্থিতি প্রভৃতি। এসব উপাদানের উপর ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার সমস্যা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

[মার্জিনে: ...াস্তব সমস্যা]

॥ বিষয়বস্তুর স্তর বিন্যাসের সমস্যা ॥

নির্বাচিত বিষয় বস্তুকে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে বিভক্ত করা—এও এক কঠিন সমস্যা। এই ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে লক্ষ্য করতে হবে **বিষয়-বস্তু যে স্তরের জন্য বিন্যস্ত হ'ল সেই বিষয়-বস্তু সেই স্তরের উপযোগী কি না।** শিক্ষার্থীর সামগ্রিক মানসিক কাঠামোর উপর ভিত্তি করেই বিষয়-বস্তুর স্তর বিন্যাস হওয়া উচিত। আবার এই কাজ করতে গিয়ে আমাদের আর একটি দিকে সযত্ন নজর রাখতে হবে। তা হ'ল, এই নীতি অনুসারে বিষয়বস্তুর স্তর বিন্যাস করতে গিয়ে যেন **ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতার ধর্ম এবং ইতিহাসের কার্য-কারণ-সূত্র-উপেক্ষিত না হয়।** তাহলে আমরা ইতিহাসের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'ব, ইতিহাসের মর্মবাণী হবে অবহেলিত। তাই ইতিহাসের বিষয় বস্তুর স্তর বিন্যাসের প্রশ্ন নিয়ে সৃষ্টি হয়েছে নানান মতবাদের। সেইসব মতবাদ আমরা পরবর্তী কালে আলোচনা করছি।

॥ বিষয়বস্তুর সংগঠনের সমস্যা ॥

অন্যান্য সমস্যার অনুপাতে বিষয়বস্তুর সংগঠনের সমস্যাটি জটিল নয়। যদি বিষয় বস্তু সুচিন্তিত ও সুনিশ্চিত ভাবে নির্বাচন করা যায় এবং যদি সেই বিষয় বস্তুর স্তর বিন্যাসের সমস্যার মীমাংসাও হয়ে যায় তবে বিষয়বস্তুর সংগঠনও প্রয়োজনভিত্তিক

হতে পারে। তবে এই প্রসঙ্গে ঐ একটি কথাই আবারও উচ্চারণ করতে হচ্ছে। তা হ'ল **শিক্ষার্থীর মানসিকতা**। এক্ষেত্রেও এই মানসিকতার প্রতি সুবিচার একান্তই বাঞ্ছিত।

॥ পাঠ্যক্রম রচনার কয়েকটি সাধারণ নীতি ॥

॥ Principles for Curriculum Construction ॥

পাঠ্যক্রমের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে একটি সুন্দর তুলনার মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে: "A good curriculum should have the virtues of a good house. It must be convenient, well-planned, appropriate to its locality, presenting a sensible and orderly appearance, contributing by these things to the possibility of a full life for those who live in it" এই দিক থেকে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনাকালে যেন কয়েকটি সাধারণ নীতির সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে সেদিকে আমাদের তৎপর থাকতে হবে। সেই সাধারণ নীতিগুলো হ'ল :—

(এক) এই **পাঠ্যক্রম যেন ইতিহাস পাঠের মৌল লক্ষ্য পূরণের সহায়ক হয়**। পাঠ্যক্রমে এমনসব বিষয়ের সন্নিবেশ করা হবে যা ইতিহাস চর্চাকে তাৎপর্য মণ্ডিত করে তুলবে।

(দুই) পাঠ্যক্রম প্রণয়নে যেন **ইতিহাসের নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকে**। "The history of the human race is the history of growth," এই 'growth' শব্দটি সীমাহীনতার প্রতীক। যেদিন আমাদের অগ্রগতি স্তব্ধ হয়ে যাবে সেদিন ইতিহাসও তার চলার ছন্দ হারিয়ে জড়ে রূপান্তরিত হবে।

(তিন) পাঠ্যক্রম রচনাকালে **শিক্ষার্থীর মানসিক গ্রহণ সামর্থ্যও বিবেচনা করতে হবে**। এদিক থেকে পাঠ্যক্রম প্রণেতার বিবেচ্য হ'ল, শিক্ষার্থী কতটুকু গ্রহণ করতে পারে এবং কতটুকু তার গ্রহণ করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে যাদের উদ্দেশ্যে এই পাঠ্যক্রম রচিত তাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হলেই পাঠ্যক্রমের সাফল্য সূচিত হবে।

শিক্ষার্থীর মানসিকতা

(চার) বলা হয়েছে Each generation must rewrite the history written by preceding generations. সত্যানুসন্ধান যদিও ইতিহাসের প্রধানতম লক্ষ্য তবু ইতিহাসের সত্য চিরকালীন সত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য। আর এটাই স্বাভাবিক। কারণ ঐতিহাসিক যেন অতন্দ্র প্রহরী অতীতের সন্ধানে। তাই আজকের গৃহীত সিদ্ধান্ত আগামীকাল বাতিল করবার প্রয়োজন স্বভাবতঃই আসতে পারে। **এই পরিবর্তনের প্রতিফলন যেন ইতিহাসের পাঠ্যক্রমেও থাকে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।** তাহলে শিক্ষার্থীরা ইতিহাসের প্রগতিবাদী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে।

পরিবর্তনশীলতার প্রতিফলন

(পাঁচ) **পাঠ্যক্রমের বিভিন্ন স্তরে যেন বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি না হয়।** অর্থাৎ পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে বর্তমান জ্ঞানের আবার বর্তমান জ্ঞানের সঙ্গে পরবর্তী জ্ঞানের পারস্পরিক সম্পর্ক ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয়।

বিভিন্ন স্তরে সংহতি সাধন

॥ বিষয়-বিন্যাস সম্পর্কিত কয়েকটি পদ্ধতি ॥

পাঠ্যক্রম রচনা সম্পর্কে যে নীতিগুলির কথা উল্লেখ করা হ'ল তার ভিত্তিতে তাত্ত্বিক দিক থেকে কতকগুলো পদ্ধতি বিশেষ জনপ্রিয়। এবার আমরা এই পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব।

॥ জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি ॥

॥ Biographical Method ॥

ইতিহাসতো মানুষেরই ইতিহাস আর সেই মানব গোষ্ঠীর মধ্যে যাঁরা অধিকতর কর্ম ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন যাঁরা মানব-সভ্যতার অগ্রগতিতে অবিস্মরণীয় অবদান রেখে গিয়েছেন তাঁদের জীবন-বৃত্তান্তের পর্যালোচনাতো প্রকারান্তরে ইতিহাসেরই পর্যালোচনা। এই বক্তব্য থেকেই জন্ম হ'ল জীবনী-ভিত্তিক পদ্ধতির।

মৌল তত্ত্ব

এই পদ্ধতির সূত্রপাত হয়েছিল প্রাচীন কালেই। বহু পূর্বেই **প্লুতার্ক** বলেছিলেন, "I fill my mind with the sublime images of the best and greatest men" **রুশোও** তাঁর এমিলের ইতিহাস চর্চার জন্য জীবনী পাঠই সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা বলেই চিহ্নিত করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে এই পন্থা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে অনুসৃত হতে থাকে। **তথাপি এই পদ্ধতির প্রবক্তা হিসেবে কার্লাইলই সমধিক পরিচিত।**

পূর্বকথা

কার্লাইলের মতে "The history of what man has accomplished in this world is at bottom the history of the great men." তাঁর বিশ্বাস **প্রত্যেক মহামানবই তাঁর সময়ের যোগ্যতম প্রতিনিধি।** প্রতিটি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাই মহামানবদের কর্মযজ্ঞের মধ্য দিয়েই সাফল্য অর্জন করে। **ভিক্টর কজিন** তাই বলেছেন, "Great men sum up and represent humanity." পারিপার্শ্বিকতার প্রস্তুতি যতই থাকুক না কেন মহামানবের উদ্যোগ ব্যতীত নিষ্ফল হয়ে যায় যেমন **ডঃ স্পার্কের** ভাষায় "However magnificent the set, it is lifeless without players." অতএব জীবনী চর্চার মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সম্মুখে ইতিহাসের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করা যেতে পারে।

কার্লাইলের মতবাদ

॥ এই পদ্ধতি প্রয়োগের স্বপক্ষে যুক্তি ॥

এই পদ্ধতি প্রয়োগের পক্ষে প্রথম বক্তব্য হ'ল সকুমার মতি শিক্ষার্থীদের পক্ষে ইতিহাসের বিমূর্ত চেতনাকে উপলব্ধি করা সহজ সাধ্য নয়। কিন্তু একজন ব্যক্তি বিশেষের কার্য-কলাপ তাদের পক্ষে শুধু সহজ-বোধ্যই নয়, হৃদয়-গ্রাহ্যও বটে।

ব্যক্তি জীবন সহজবোধ্য

দ্বিতীয়তঃ **বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মানসিকতায় বীর পূজার প্রবণতা অতিশয় সুস্পষ্ট।** জীবনী পাঠ তাদের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানসিক চাহিদাকে সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ করে তুলতে পারে। মহামানবদের জীবনী পাঠে তারা এতটা আপ্লুত হয় যে মহাপুরুষদের সাফল্যে তারাও আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়, আর ব্যর্থতায় বেদনায় উদ্বেলিত হয়। পাঠ্য বিষয়ের সঙ্গে এমন একাত্মবোধই তো সাফল্যের সূচক।

তৃতীয়তঃ **জীবনী পাঠের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর নীতি-শিক্ষার সূত্রপাত হতে পারে।** হৃদয় বৃত্তির প্রসারতা, মানসিক উন্নতি ও চরিত্র গঠন ঐতিহাসিক জীবনী পাঠের তাৎপর্য এখানেই।

চতুর্থতঃ **মহাপুরুষের জীবনী বহুলাংশে ঐতিহাসিক বিতর্কের উর্ধ্বে।** ফলে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান পরবর্তীকালে মিথ্যে প্রমাণিত হবার সুযোগ এক্ষেত্রে অত্যন্ত সীমিত।

পঞ্চমতঃ **জীবনী চর্চার মধ্য দিয়েই ইতিহাসকে শ্রেণীকক্ষে জীবন্ত করে তুলতে পারা যায়।** যে অতীত দৃশ্য নয়, স্পর্শনীয়ও নয় তার সজীব স্পন্দন ও স্পর্শ শিক্ষার্থী পেতে পারে জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে।

॥ এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিপক্ষে যুক্তি ॥

প্রথমতঃ **মানব সভ্যতা হ'ল বিশ্বমানবের যৌথ সৃষ্টি এবং যৌথ সম্পত্তি।** কেবল মহামানবেরাই নয়, কত অগণিত জানা-অজানা মানুষের মৃত্যুঞ্জয়ী অবদানের ফলেই গড়ে উঠেছে এই সভ্যতা ইতিহাস তার বিস্তারিত খবর রাখে না। কিন্তু রাখে না বলেই এই সভ্যতার বিবর্তনে একমাত্র মহাপুরুষেরাই সত্যি—এমন সিদ্ধান্ত অযৌক্তিক এবং অসঙ্গত। ঘাটে তাই এই পদ্ধতিকে অগণতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করেছেন।

অগণতান্ত্রিক

দ্বিতীয়তঃ **মহামানবেরাও তাঁদের সময়েরও যথাযোগ্য নন।** ঘাটে এই প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করে বলেছেন, "Their very greatness shows that they are far above the average humanity of their times. They are usually rebels and occasionally martyrs." অর্থাৎ মহাপুরুষেরাও কখনো সীমাবদ্ধতার উর্ধ্বে নন।

মহাপুরুষেরা যোগ্য প্রতিনিধি নন।

তৃতীয়তঃ **মহাপুরুষেরা মহান্, কিন্তু তাঁদের মহত্ব তো সর্বপ্লাবী নয়।** সমাজ জীবনের যে বিচিত্র ও বহুমুখী গতিবিধি তার সমগ্রতার রূপকার মহাপুরুষেরা হতেই পারেন না। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র সম্পর্কেই স্বীকার করেছেন "জানি, আমার কবিতা/ গেলেও বিচিত্র পথে/হয় নাই সে সর্বত্রগামী/।"

মহাপুরুষের মহত্বের সীমাবদ্ধতা

চতুর্থতঃ **কেবল জীবন-ভিত্তিক পদ্ধতি ইতিহাসের ধারাবাহিকতাকে বিঘ্নিত করে।** ইতিহাসে এমন সময় স্বাভাবিক ভাবেই আসে যখন সেই সময়কে প্রতিফলিত করার মত মহাপুরুষ থাকেন না। এই পদ্ধতি অনুসারে, এই সময়কে তাহলে আমাদের বাদ দিয়ে যেতে হয়। কিন্তু তা কখনোই বাঞ্ছিত নয়।

ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় বাধা

পঞ্চমতঃ শিক্ষার্থীর যে বীর পূজার প্রবণতা জীবনী পাঠের পদ্ধতিকে উৎসাহিত করেছিল সেই প্রবণতাকে অত্যধিক প্রশ্রয় দিলে তা **শিক্ষার্থীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বিরাট প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে।** অন্ততঃ আধুনিক মনোবিজ্ঞানীদের এই অভিমত।

অত্যধিক বীর পূজার কুফল

ষষ্ঠতঃ শিক্ষার্থীকে **সময় সচেতন করে তোলাও ইতিহাস পাঠের অন্যতম লক্ষ্য।** কিন্তু জীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে সঠিকভাবে এই সচেতনতা জাগ্রত করা যায় না।

সময়-জ্ঞান বিকাশে বাধা

॥ এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কিত সতর্কতা ॥

সমালোচনা যাই হোক, জীবনী-ভিত্তিক পাঠের সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান হবার কোন কারণ নেই। আবার এই পদ্ধতির ব্যর্থতাগুলিকেও অবজ্ঞা করবার নয়। সুতরাং প্রশ্ন হ'ল কিভাবে সতর্ক হলে আমরা এই পদ্ধতির ব্যর্থতাকে কমিয়ে আনতে পারি।

প্রথমতঃ **শুরুতেই কোন্ কোন্ মহাপুরুষ পড়ানো হবে তা স্থির না করে আগে ঘটনাবলীকে বাছাই করতে হবে।** তারপর সেই ঘটনাবলীকে পরিস্ফুট করবার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তিদের নির্বাচন করতে হবে। জনগণ এই প্রসঙ্গেই বলেছেন, "Biography can on the whole be made more historical by making it more biographical, grouping men about events rather than events about men and by studying men first of all as men.

প্রথম ঘটনা নির্বাচন

দ্বিতীয়তঃ কেউই যেহেতু তার সময়ের সর্বদিকের পরিচয় বহন করেন না, তাই সমাজের সার্বিক পরিচয় দেবার প্রয়োজন অনুসারেই ব্যক্তি নির্বাচন করতে হবে।

তৃতীয়তঃ একজন ব্যক্তিজীবনে প্রতিষ্ঠিত হন কখনোই কুসুমাস্তীর্ণ পথ বেয়ে নয়। তাঁকেও অনেক বাধা বিঘ্ন পেরিয়ে আসতে হয়। সুতরাং কোন ব্যক্তির জীবনী পাঠকালে যেন তাঁর প্রতিবন্ধকতার পরিচয় মেলে তেমন ব্যক্তিদেরও নির্বাচন করতে হবে।

সমগ্র পরিচয় বহনকারী পরিচয়

চতুর্থতঃ জীবনীর অর্থ যেন ঠাকুরমায়ের ঝুলি হয়ে না যায় সে সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হতে হবে। মনে রাখতে হবে আমরা এক ব্যক্তি জীবনের সেই দিকগুলো সম্পর্কেই আগ্রহান্বিত যে দিকগুলো বৃহত্তর সমাজ-জীবনকে প্রভাবান্বিত করেছিল। তাই জীবন-কাহিনী নির্বাচন কালে আমাদের এ সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে।

সমাজভিত্তিক ব্যক্তি পরিচয়

পঞ্চমতঃ জীবনী ভিত্তিক পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে ইতিহাসের ধারাবাহিকতার ক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হবে, তা বিবরণ দানের মধ্য দিয়ে পূর্ণ করে তুলতে হবে।

ষষ্ঠতঃ প্রাথমিক স্তরে জীবনীভিত্তিক পদ্ধতি ইতিহাস চর্চায় বিশেষ উপযোগী হলেও পরবর্তী স্তরে এই পদ্ধতিকে সহায়ক পাঠ রূপেই গ্রহণ করতে হবে। কারণ "The biographical method is possessed of a great human appeal and has thus a rosy future in the domain of higher learning. Biography with all its short-comings is sure to survive as an efficient instructional method at almost all stages for the great personal element it is possessed with.

পরবর্তী স্তরে সহায়ক পাঠ

॥ কালচার-ইপক্ মতবাদ ॥

॥ Culture Epoch Theory ॥

ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন ও সংগঠনের ক্ষেত্রে **কালচার ইপক্ মতবাদ এক মনোবিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি।** বহু পূর্বে এই মতবাদের জন্ম হলেও এর তুলনা মূলক প্রয়োগ এক সাম্প্রতিক ঘটনা। এই মতবাদ সম্পর্কে **প্রথম বলেন হার্বার্টের শিষ্য জিলার।** কিন্তু জিলার নির্দেশিত পথে ইতিহাস পাঠন ও পঠন সম্ভব ছিল না। ইতিহাসে এই তত্ত্বের প্রয়োগ ভিন্নমুখী।

জিলার

ইতিহাসে এই মতবাদের প্রয়োগ সম্পর্কে দু রকম ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রথম ব্যাখ্যা **স্ট্যান্‌লি হলের।** তিনি বলেছেন **মানবসভ্যতা ক্রমবিকাশের ধারাবাহিকতার বিভিন্ন স্তরের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা করা হবে।** তার কারণ সভ্যতার পাঠ্যক্রম ক্রমবিকাশের সঙ্গে ব্যক্তি-মানুষের ক্রমবিকাশের এক অপূর্ব সঙ্গতি রয়েছে। তাঁর মতে, মাতৃগর্ভে শিশুর জীবন যেন জনজীবের অধ্যায়। তারপর শিশু ক্রমশঃ স্বেচ্ছাচারী ও স্বার্থপর, এই স্তর যেন আদিম মানুষের বর্বর জীবন-যাপন প্রণালীরই অনুরূপ।

হল্ এর মতবাদ

তারপর শিশু হামাগুড়ি দেয়, মারামারি করে। এটা হ'ল গুহাবাসী মানুষের জীবন-যাত্রারই রোমন্থন। একটা সময় শিশু রক্ত, আগুন ইত্যাদি গল্প শুনতে ভালবাসে। এই ভালবাসা যেন তার যে রক্ত পিপাসু বর্বরতার উত্তরাধিকার তারই এক অদ্ভুত মনোবিজ্ঞানী তৃপ্তিবোধ। তারপর ক্রমশঃ শিশুর যুক্তিবোধ প্রবল হয়, সৃজনশীল শক্তির বিকাশ হতে থাকে। এটা হ'ল মানব সভ্যতার পরিপূর্ণতার স্তর।

এইভাবে শিশু তার নিজের জীবন যাত্রার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তরকেই অতিক্রম করে আসে। তাই স্ট্যান্লী হলের অভিমত হ'ল, **ইতিহাসের পাঠ্যক্রম যদি সঙ্গতির দিকগুলোর অনুসারী হয় তা হলে ইতিহাস শিক্ষা হবে মনোবিজ্ঞান সম্মত।** সুতরাং হলের সুপারিশ হ'ল, প্রাথমিক স্তরে পাঠ্য হবে প্রাচীন ইতিহাস, তারপর মধ্য যুগের ইতিহাস আর উচ্চস্তরে আধুনিক ইতিহাস।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যার প্রবক্তা হলেন **অধ্যাপক লরী**। তিনি স্পষ্ট করেই বলেছেন: The childhood of history is but for the child, the boyhood of history for the boy, the youthhood of history for the youth and the manhood of history for the man." তিনি তাঁর এই বক্তব্যকে দাঁড় করিয়েছেন এক তত্ত্ব দিয়ে। তিনি হলের সভ্যতার ক্রমবিকাশের স্তরের কথা না বলে বললেন **ঐতিহাসিক চেতনার ক্রমবিকাশের স্তরের কথা**। তিনি বলেছেন, ঐতিহাসিক চেতনা বিকাশের তিনটি স্তর। প্রথম স্তর গল্প, উপকথা ও রোমাঞ্চকর কাহিনীরা। দ্বিতীয় স্তর হ'ল সমালোচনা নির্ভর। তৃতীয় স্তর বিজ্ঞান ধর্মী। ইতিহাস-চিন্তার এই ক্রমবিকাশের উপর ভিত্তি করেই ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা করতে হবে। কারণ লরীর অভিমত অনুসারে, "History can not be reasoned history to boy even at the age of seventeen it is only partially so, but it can always be an epic, a drama and a song."

লরীর মতবাদ

যাই হোক এই মতবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে তা শিক্ষাবিদ্দের আকৃষ্ট করেছিল। কারণ এই মতবাদে শিক্ষার্থীর ইচ্ছে—অনিচ্ছে, আগ্রহ-আকাঙ্ক্ষার প্রতি মর্যাদা আরোপ করা হয়েছে। কর্নেস এই মতবাদ নিয়ে বাস্তব প্রয়োগের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালিয়ে ছিলেন।

কিন্তু এই মতবাদ সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। যারা এই মতবাদের বিরোধীতা করেন তাঁদের বক্তব্য হল:

প্রথমতঃ শিশু যখনই জন্মাক না কেন, শিশু শিশুই। আর বর্বর যুগের হলেও তখনকার মানুষ একজন পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তি। তাই জন্সন্ বলেছেন "An adult savage whatever his stage of culture is after all an adult and a child, however modern is after all child." সুতরাং উভয়ের মধ্যে মিল অমিলের সন্ধান তো একেবারেই

শিশু ও পূর্ণ বয়স্ক ব্যক্তির ব্যবধান

অকারণ। দ্বিতীয়তঃ **সকল জাতি ক্রমিক অগ্রগতির ক্ষেত্রে একই ধারা অনুসরণ করে চলে না।** তাহলে আজকের সভ্য সমাজেও অনুন্নত সম্প্রদায় বলে কিছু থাকতো না। তৃতীয়তঃ **সমগ্র মতবাদ বড় বেশী কল্পনা-নির্ভর।** বাস্তব-পরিস্থিতির সঙ্গে এই মতবাদের সঙ্গতি খুঁজে পাওয়াই অত্যন্ত কষ্টকর।

কল্পনা-নির্ভর

কিন্তু এইসব সমালোচনা সত্ত্বেও এই মতবাদ একেবারেই উপেক্ষণীয় নয়। এই মতবাদেই ইতিহাস পঠন-পাঠন ব্যবস্থার কতকগুলো সুবিধে হয়।

প্রথমতঃ এই মতবাদের সারাৎসারটুকু গ্রহণ করেই শৈশবাবস্থা থেকে বাল্যকাল পর্যন্ত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনার কাজটি সহজতর হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ এই মতবাদ প্রবর্তিত হবার ফলেই ইতিহাস কেবল মাত্র বুদ্ধিবৃত্তির অনুশীলনের মাধ্যমের পরিবর্তে তাকে আরও বাস্তব ও কর্মভিত্তিক করে তোলার উদ্যোগ আরম্ভ হয়। এটি ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি অবিস্মরণীয় অবদান। তৃতীয়তঃ ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীর অভিরুচিকে মর্যাদা দেবার প্রয়োজনীয়তা এই মতবাদ থেকেই স্বীকৃতি পায়। চতুর্থতঃ এই মতবাদ থেকেই অনুভূত হয় যে ইতিহাস শিক্ষকের পক্ষে কেবলমাত্র বিষয় বস্তু সম্পর্কে পাণ্ডিত্য অর্জনই শেষ কথা নয়, ইতিহাসকে জীবন্ত, বাস্তব ও ক্রিয়াশীল করে তোলার জন্য তার নৃতত্ত্ব বিদ্যা সম্পর্কেও কথঞ্চিৎজ্ঞানার্জন করা অতীব প্রয়োজনীয়।

পাঠ্যক্রম রচনার সহজ সূত্র-বাস্তব ও কর্মভিত্তিক করার সুযোগ, শিক্ষার্থীর অভিরুচির মর্যাদা, নৃতত্ত্ব-বিদ্যার গুরুত্ব।

॥ বিষয়-সংগঠন সম্পর্কীত কয়েকটি পদ্ধতি ॥

বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়ে গেলে পরবর্তী প্রশ্ন, কি ভাবে বিষয়বস্তুকে সাজালে তা শিক্ষার্থীর কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠবে। এই প্রশ্নের সমাধান করতে গিয়ে জন্ম হয়েছে কতকগুলো পদ্ধতির। এবার আমরা সেই পদ্ধতিগুলো আলোচনা করব।

॥ সময়ানুক্রমিক পদ্ধতি ॥
॥ Chronological Method ॥

সময়ের ধারাবাহিকতাকে অনুসরণ করে ইতিহাসের বিষয়বস্তুকে বিন্যস্ত করার যে পদ্ধতি তাকেই বলা হয় সময়ানুক্রমিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতির প্রবক্তাদের মতবাদ কালচার ইপক্ মতবাদের অনুসারী। তাঁরাও বলেন প্রাচীনকাল থেকেই শিশুদের ইতিহাস শিক্ষার সূত্রপাত হওয়া উচিত। কেননা তাতে শিশুর মানসিকতার প্রতি যথোচিত মর্যাদা আরোপ করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ইতিহাসকে কতকগুলো যুগে বিভক্ত করতে হবে। তবে লক্ষ্য রাখতে হবে **এই যুগ বিভাগ যেন বেশ বিস্তৃত এবং যুক্তিসিদ্ধ হয়,** যেন এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের ব্যবধানটুকু স্পষ্ট বুঝা যায়।

সংজ্ঞা

॥ সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে **বিষয়বস্তুর বিন্যাস অনেক সহজ সাধ্য হয়ে যায়।** ঘটনার পারম্পর্য আর সময়-চেতনা যা ইতিহাস পাঠের অপরিহার্য অঙ্গ তা এই পদ্ধতির মাধ্যমে অনায়াসে জাগ্রত করা যায়।

সহজ বিষয় বিন্যাস

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতি অনুসারে **এক যুগের সঙ্গে অন্য যুগের সম্পর্ক সহজেই শিক্ষার্থীর সম্মুখে উন্মোচন করা যায়।** ফলে তারা সুন্দর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনুভব করতে পারে।

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি অনুসারে বিদ্যালয়ের প্রতিস্তরেই নতুন নতুন বিষয়ের সন্নিবেশ করা হবে বলে শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও কৌতূহল কখনো নির্বাপিত হবে না। ফলে আদর্শ পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে যা অপরিহার্য তারই যোগান হবে অফুরান।

॥ সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির অসুবিধা ॥

প্রথমতঃ যে মূল আদর্শের উপর ভিত্তি করে এ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে সে সম্পর্কেই সন্দেহ আছে। ইতিহাস প্রাচীনকালের হলেই তা হবে সহজ ও সাধারণ আর আধুনিক কালের হলেই হবে জটিল এমন একটি সহজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ যোগ্য নয়। প্রত্যেক যুগেরই নিজস্ব জটিলতা রয়েছে, নিজস্ব সমস্যা রয়েছে এবং সেই সমস্যার সমাধানের চেষ্টাও সবার নিজস্ব, তার সঙ্গে অন্য কেউ তুলনীয় নয়।

আদর্শ সম্পর্কে মতভেদ

দ্বিতীয়তঃ **কেবলমাত্র সময়ানুক্রম ছাড়া বিষয়বস্তু সংগঠনের অন্য কোন নীতি নেই।** তাই ইতিহাস শিক্ষার মধ্য দিয়ে কোন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে শিক্ষার্থীকে পৌঁছে দেওয়া এই পদ্ধতি অনুসারে অত্যন্ত দুঃসাধ্য।

তৃতীয়তঃ যেহেতু এক একটি সময়সীমা এক এক শ্রেণীতে অতিক্রম করে যাবে শিক্ষার্থীরা, এবং যেহেতু সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে সেই সময় সীমার পুনরালোচনার আর সুযোগ থাকে না সেইহেতু **শিক্ষার্থীরা স্বাভাবিকভাবেই বহুপূর্বে অর্জিত জ্ঞান বিস্মৃত হতে পারে।**

পূর্বজ্ঞান বিস্মৃত হবার সম্ভাবনা

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর রুচি প্রবণতার প্রতি বিন্দুমাত্র লক্ষ্য রাখার চেয়ে সময়ানুক্রমিকতার প্রতি সতর্কতা রক্ষা করা হয় বেশী।

॥ এককেন্দ্রিক পদ্ধতি ॥
॥ Concentric Method ॥

সময়ানুক্রমিক পদ্ধতির উল্টোটাই হ'ল এককেন্দ্রিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে একই পাঠ্য বিষয় ক্রমশঃ সরলতা থেকে গভীরতর ও পূর্ণতর বিশ্লেষণে অগ্রসর হওয়া হবে। এই পদ্ধতির দাবী হ'ল, এ ভাবেই শিশুর শারীরিক ও মানসিক স্তরের ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা হবে। কারণ

সংজ্ঞা

এ পদ্ধতিতে জ্ঞানবৃত্তের কেন্দ্রে থাকবে শিশু। শিশু ক্রমশঃ বয়োপ্রাপ্ত হবে, ক্রমশঃ জ্ঞানবৃত্তও সম্প্রসারিত হবে।

কিন্তু এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে গেলে কতকগুলো বাস্তব অসুবিধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়।

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি অনুসারে **ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় বহু ঘটনার সমাবেশে এক কংকাল যেন**, এখানে প্রাণের উষ্ণ স্পর্শ পাবার কোন সুযোগ নেই।

দ্বিতীয়তঃ **একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির ফলে বিষয়বস্তু তার নিজস্ব অভিনবত্ব এবং বৈচিত্র্য থেকে বঞ্চিত হয়।** ফলে শিক্ষার্থীর নতুন বিষয় জানার আগ্রহ স্তিমিত হয়ে আসে, ইতিহাস পাঠে তার উদ্দীপনার অভাব ঘটে।

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীদের সময় সচেতন করে তোলা সহজসাধ্য নয়।

কিন্তু এইসব সমালোচনাও অত্যন্ত স্পর্শকাতরতা দোষে দুষ্ট। সুস্থভাবে বিচার করলে দেখা যায়, প্রকৃতপক্ষে সমগ্র বিদ্যালয় জীবনে **একই ইতিহাস দু'বারের বেশী পুনরালোচিত হয় না।** এবং এটা কখনো অতিরিক্ত পুনরাবৃত্তি প্রবণতার পরিচায়ক নয়।

আবার একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এই পদ্ধতিতে বিঘ্নিত হবে এমন সমালোচনাও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বিষয়বস্তু বিন্যাসে বৈচিত্র্য কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর উপরই নির্ভর করে না, নির্ভর করে বহুলাংশে বিষয়বস্তু উপস্থাপনে নৈপুণ্যের উপর।

॥ বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি ॥
॥ Topical Method ॥

সংজ্ঞা

সময়ানুক্রম অনুসারে যেমন ইতিহাসের বিষয় বিন্যাস হতে পারে তেমনি প্রত্যেকটি সময়ানুক্রমকে আবার কতকগুলো যুগে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন সময়ানুক্রম অনুসারে ভারতের ইতিহাসকে প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে ভাগ করা যায়, তেমনি প্রাচীন যুগকে মৌর্য যুগ, গুপ্ত যুগ প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা যায়। আবার মৌর্য যুগকে মৌর্যযুগের শাসন ব্যবস্থা, মৌর্যযুগের শিল্প কলা প্রভৃতি উপভাগে বিভক্ত হতে পারে। এই ক্ষুদ্র যুগ বিভাগকেই বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি বলা হয়।

হপ্‌ট নির্দেশিত পাঠ্যক্রম

১৮৪১ সালে পেস্তালৎসী পন্থানুসারী **হপ্‌ট (Haupt)** বিষয়ানুক্রম অনুসারে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচনা করেন। এই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী বিদ্যালয়ের প্রথম বৎসরে মহামানবদের গৃহজীবন, দ্বিতীয় বৎসরে তাঁদের সামাজিক জীবন, তৃতীয় বৎসরে রাজনৈতিক নেতাদের রাজনৈতিক জীবন, চতুর্থ বৎসরে ধর্মীয় নেতাদের ধর্মীয় জীবন, পঞ্চম বৎসরে শিল্পী ও

বৈজ্ঞানিকদের দৃষ্টান্তসহ বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিবরণ ও ষষ্ঠ বৎসরে সাধারণ কালানুক্রমিক ইতিহাস পড়ানো হবে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রভাব ব্যাপকভাবে অনুসৃত হতে থাকে এবং এরই সূত্র ধরে একক পদ্ধতির জন্ম হয়।

প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসের শিক্ষককে বিষয়ানুক্রমিক পদ্ধতি অনুসরণ করতেই হয়। তিনি যা কিছুই পড়ান না কেন তাকে পাঠদানের সুবিধার জন্য পাঠ্যবিষয়কে সময়ানুক্রম রক্ষা করে কতকগুলো ভাগে ভাগ করে নিতেই হয়।

॥ প্রতিগামী পদ্ধতি ॥

॥ Regressive Method ॥

এই পদ্ধতি অনুসারে বর্তমান থেকে ক্রমশঃ পিছিয়ে যেতে হবে। ইতিহাসের তাৎপর্য হ'ল বর্তমানকে ব্যাখ্যা করা। বর্তমানকে জানতে হলে জানতে হবে তার অতীতকে। আবার সেই অতীতকে জানতে হলে জানতে হবে তারও অতীতকে। এই পদ্ধতি এক সর্বজন বিদিত মনোবিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে। তা হ'ল, জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়া।

॥ দোলক পদ্ধতি ॥

॥ Pendulum Method ॥

বর্তমানকে জানার জন্য যখন অতীতকে জানতে হবে তখন বর্তমানের সঙ্গে অতীতের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপনার প্রয়োজন একান্তই অপরিহার্য। তাই দোলক **পদ্ধতিতে বলা হয়েছে ইতিহাস পাঠের সময় সর্বক্ষণ বর্তমানের সঙ্গে অতীতের, অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়েই আমাদের অগ্রসর হতে হবে।** কিন্তু এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য চলতে পারে তাও সর্বক্ষণ নয়, তাৎক্ষণিক প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে। কিন্তু এই পদ্ধতি অবলম্বন করে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম প্রণয়ন সম্ভব নয়।

॥ ক্রমগতির ধারানুসরণ পদ্ধতি ॥

॥ Lines of Development ॥

বর্তমান কালে বিজ্ঞানভিত্তিক ইতিহাস চর্চার ফলে ইতিহাস ক্রমশঃই তত্ত্ব ও তথ্য বহুল হয়ে উঠেছে। কিন্তু তথ্য সমৃদ্ধ এই ইতিহাসকে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে পরিবেশন করতে গিয়ে এক সংকটের সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাস শিক্ষার ক্ষেত্রে। তাই সৃষ্টি হ'ল নতুন নতুন পদ্ধতি এই সংকটকে অতিক্রম করার তাগিদে। এমনি এক অভিনব পদ্ধতি হ'ল ক্রমগতির ধারানুসরণ পদ্ধতি।

প্রয়োজনীয়তা

এই পদ্ধতির মূল প্রবক্তা হলেন **Prof. Jaffreys.** তাঁর বক্তব্যই হ'ল "a definite thesis to establish a particular standpoint and illustrate its implications. তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন ইতিহাস হ'ল সমাজের ক্রমিক অগ্রগতির এক ধারাবাহিক বিবরণ। তাই ইতিহাসকে বুঝতে হলে ধারাবাহিকতার প্রবাহকেই সঠিকভাবে অনুসরণ করতে হবে। তাঁর ভাষায়, "History is a study of social development and by the historical sense we mean a habitual disposition to see the whole historical process or some selected part or aspect of it, in its developmental perspective.

Prof. Jaffreys-এর অভিমত

এই পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিরুচির বিচারে কতকগুলো বিষয় আমাদের বেছে নিতে হবে। বিষয়, যেমন বাসগৃহ, যানবাহন, ব্যবসা-বাণিজ্য পোষাক-পরিচ্ছদ, প্রভৃতির বিশ্বব্যাপী বিবর্তনের ধারাবাহিক বিবরণ। শিক্ষার্থী যত বেশী পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হবে ততবেশী বিষয়গত গভীরতার দিকেও লক্ষ্য রাখা হবে। অর্থাৎ শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই বিষয় নির্বাচন করা হবে এবং সেই বিষয়ের উপস্থাপনাও হবে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার প্রসঙ্গ স্মরণে রেখেই।

পদ্ধতির কার্যকারিতা

॥ এই পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক পদ্ধতিকেই স্বীকৃতি জানানো হয়। এখানে ঘটনার উত্থাপন কেবল ঘটনার তাগিদেই আসে না, বরং প্রতিটি ঘটনার পরিবর্তনগুলোকে চিহ্নিত করে বিভিন্ন সংগঠন ও বৃহৎ আন্দোলনের গতিপ্রকৃতিকেই স্পষ্ট করে তোলে।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাসের উৎস সন্ধানে এই পদ্ধতি যে পথের প্রদর্শক, সেই পথ সংকীর্ণ হতে পারে, কিন্তু পথটি জটিলতা বর্জিত। ফলে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেই পথ ধরে ভ্রমণ এক সুখকর অভিজ্ঞতা।

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতির দৃষ্টিকোণই একটি সুস্পষ্ট বিষয়বস্তুকেন্দ্রিক। Prof. Jaffreys অভিমত হ'ল, "It supplies a central theme from which subsidiary investigations can radiate as far as time and pupils' intelligence allow."

চতুর্থতঃ বিপুল তথ্য সম্ভারে পরিপূর্ণ ইতিহাসকে কি ভাবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পক্ষে উপযোগী করে তোলা যায় এই সমস্যার এক সুযোগ্য সমাধান হ'ল এই পদ্ধতি। প্রকৃতপক্ষে এই পদ্ধতি মূল আবেদনকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে সমাজবিদ্যা নামক বিষয়টি।

॥ এই পদ্ধতির অসুবিধা ॥

ক্রমগতির ধারানুসরণ পদ্ধতির সমালোচনা করে বার্স্টন এবং গ্রীণ বলেছেন, "We cannot use this concept of history as a principle of a bridgement of history for school syllabuses and if we did and reduced history to the study of the roots of the present, we should get an erroneous picture of the actual development of institutions, since this kind of study of their history would take them from their full context in different periods in the past."

বিচ্ছিন্নতার প্রবণতা

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে **শাসনতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস যথাযোগ্য মর্যাদা থেকে বঞ্চিত হয়।**

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে **ইতিহাস একটি নির্দিষ্ট বিষয়-কেন্দ্রিক হয়ে যাওয়ায় ইতিহাসের সামগ্রিকতা এখানে বিঘ্নিত হয়।**

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতিতে **বর্তমানেরই অধিকতর প্রাধান্য স্বীকৃত।** অতীত নিজস্ব আবেদন হারিয়ে কেবলমাত্র বর্তমানের পশ্চাদ্‌পট হিসেবেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করে।

॥ গ্রথিতকরণ পদ্ধতি ॥
॥ Patch Method ॥

এই পদ্ধতির **প্রবক্তা হলেন মিস্ মার্জরী রিভস্।** এই পদ্ধতির মূল কথা হ'ল গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একত্রে গ্রথিত করা। এই বিষয়গুলি নির্বাচিত হবে শিক্ষার্থীর বয়স, যোগ্যতা ও মানসিকতা অনুসারে। এই পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগের জন্য আমাদের কতকগুলো সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। যেমন:

প্রথমতঃ **বিষয়ের গ্রন্থনা হতে হবে যথেষ্ট সুচিন্তিত।** গ্রন্থনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে দুই দিকে—শিক্ষার্থীদের উপযোগিতার দিক আর গ্রথিত বিষয়ের গুরুত্ব। এই উভয় প্রয়োজনের মধ্যেই ভারসাম্য স্থাপন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ যেহেতু এই পদ্ধতির লক্ষ্য হ'ল অতীত সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কল্পনা-শক্তিকে সমৃদ্ধ করা এবং তাদের যুক্তিগ্রাহ্য চিন্তাধারা বিকশিত হতে সহায়তা করা সেইহেতু **তেমন সব বিষয় নির্বাচন করতে হবে যেখানে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের চমৎকার বৈপরীত্য রয়েছে।**

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষক "should choose any theme, possibly a sequence of events or a biography or a visual representation which **symbolises the spirit of the age.**"

চতুর্থতঃ একটি সামগ্রিক ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে **এই পদ্ধতিতে বিষয়-বস্তুর নির্বাচন প্রয়োজনীয়।**

॥ এই পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে **শিক্ষা ব্যাপক ও মূর্ত হয়ে ওঠে**। ফলে বিভিন্ন প্রকার উপকরণের ব্যবহার এখানে সম্ভব হয়, ইতিহাস হয়ে ওঠে সজীব ও জীবন্ত।

দ্বিতীয়তঃ প্যাচ পদ্ধতি দাবী করে যে এর মাধ্যমেই **একটি নির্দিষ্ট যুগের সত্যিকারের পরিচয়টি পরিস্ফুট হয়।**

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি অনুসরণ করলে **শিক্ষার্থী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে পরবর্তী যুগ সম্পর্কে জানতে কৌতুহল বোধ করে।** বিভিন্ন যুগের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কটি খুব স্বাভাবিক ভাবেই শিক্ষার্থীর কাছে স্বচ্ছ হয়ে যায়।

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতির আকর্ষণী শক্তি এতটাই যে **শিক্ষার্থীর সঙ্গে অতীতের এক গভীর একাত্মবোধ জাগ্রত হয়।** ফলে ইতিহাস সেখানে এক পরম সত্য রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

॥ একক পদ্ধতি ॥
॥ Unit Method ॥

ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের সংগঠন সম্পর্কীত যে-সব পদ্ধতি প্রচলিত তার মধ্যে একক পদ্ধতি ক্রমশঃই অধিকতর জনপ্রিয় হয়ে উঠ্ছে। ইতিহাসের বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশগুলিকে যদি সুচিন্তিতভাবে কতকগুলো বৃহত্তর অংশ ঘনপিনদ্ধ করা যায় তাহলে শিক্ষক যেমন তাঁর পাঠ-পরিকল্পনায় বিচক্ষণতার স্বাক্ষর রাখতে পারেন তেমনি শিক্ষার্থীরাও তাদের পাঠ্য-বিষয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা করতে পারে।

॥ সংজ্ঞা ॥

কিন্তু একক পদ্ধতি বলতে আমরা কি বুঝি? এ সম্পর্কে বহু পণ্ডিত বহু মত প্রকাশ করেছেন। আমরা কেবল ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে দুটো মতের উল্লেখ করছি।

জন্সন্ প্রদত্ত সংজ্ঞা

প্রথমে **জন্সন্** এককের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন, "A unit is a segment of experience which is cut out for study; within it method is employed. It is my understanding that every unit is a project. It is a project in the sense that one projects inquiry into it. Furthermore, every unit has a topic, theme or central tendency or whatever name you choose to call it, otherwise it could have no unity. Every unit is a contract, or obligation to study how the things which it contains are related, how they work, how cause and effect are identified and related and how a conclusion is reached at. Every unit is also a problem, a problem of significance and meaning in some unknown or less than thoroughly known phase of human experience.

আবার জারোলিমেক বলেছেন একক হ'ল "a means of organising materials for instructional purposes which utilizes significant subject-matter content involves pupils in learning activities through active participation intellectually and physically and modifies the pupils behaviour to the extent that he is able to cope with new problems and situations more competently".

জারোলিমেকের অভিমত

এই দুইটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে একটি এককের যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য থাকা উচিত তা হ'ল :

(এক) বিষয়-বস্তু হবে তাৎপর্য মণ্ডিত।

(দুই) প্রত্যেকটি একক শিক্ষার্থীদের দেহে ও মনে সক্রিয়ভাবে শিখন-কার্যে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহিত করবে।

(তিন) শিক্ষার্থী যেন যে কোন নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে পারে, যে কোন নতুন সমস্যার মোকাবিলা করতে পারে—শিক্ষার্থীর আচরণগত তেমন পরিবর্তন ত্বরান্বিত করাই প্রতিটি এককের লক্ষ্য।

॥ এককের প্রকার ভেদ ॥

সাধারণতঃ একক দু' ধরনের হতে পারে : **বিষয়-সমৃদ্ধ একক** বা Resource Unit আর **শিক্ষাদান মুখী একক** বা Teaching Unit। বিষয়-সমৃদ্ধ এককগুলো বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষার জন্যই তৈরী করা হয় এবং শিক্ষকেরা প্রয়োজনীয় তথ্য এখান থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। আর শিক্ষাদানমুখী এককগুলো বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নিজস্ব প্রয়োজন অনুসারে গঠিত হয়। বিষয়-সমৃদ্ধ একক সম্পর্কে বলা হয়েছে, "The resource unit is a teacher's guide to planning and action. In effect, it is blue print of suggestions and resources for developing a theme, problem or topic.

তবে যে কোন ধরনের এককের গঠনটি হবে এ রকম :—

(এক) এককের নামকরণ

(দুই) এককের উদ্দেশ্য নির্ধারণ

(তিন) সম্ভাব্য প্রস্তুতিমূলক কর্ম নির্দেশনা

(চার) সম্ভাব্য পরবর্তী বিস্তৃত কর্ম নির্দেশনা

(পাঁচ) উদ্দেশ্য কেন্দ্রিক বিষয়-বস্তু বিন্যাস

(ছয়) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ

(সাত) লব্ধ অভিজ্ঞতার বিবরণ

(আট) মূল্যায়ন।

॥ একটি ভাল ইতিহাসের এককের বৈশিষ্ট্য ॥

(এক) **এককের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হবে।** মনে রাখতে হবে, ইতিহাসের একক যেন ইতিহাসের বৃহত্তর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের সহায়ক হয়। একক যেন শিক্ষার্থীর সমস্যা সমাধানের মানসিকতা, সংঘবদ্ধভাবে কাজ করবার মত সহমর্মিতা বোধ, বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহারের সক্ষমতা, বিভিন্ন ঐতিহাসিক মৌল ধারণা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্য করে। (দুই) **একক যেন শিক্ষার্থীর কৌতূহল নিবৃত্তির উপযোগী হয়।** সুতরাং এককে অবশ্যই শিক্ষার্থীর শক্তি ও সামর্থের কথাও বিবেচনা করতে হবে। ব্যক্তিগত বৈষম্যের কথা স্মরণ রেখে এককটি এমনভাবে গঠন করতে হবে যেন বিভিন্ন কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গোষ্ঠীগত লক্ষ্যও সাধিত হয়। (তিন) **ইতিহাসের যে সব বিভিন্ন উপকরণ ও কর্মপন্থা আছে তার ব্যবহারের সুযোগ যেন এককে থাকে।** যেমন: বিবিধ উপকরণের প্রয়োগ, ঐতিহাসিক স্থান পরিভ্রমণ, আলোচনা ও মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে স্থিরীকৃত লক্ষ্যের মূল্যায়ন।

উদ্দেশ্য

কৌতূহলের নিবৃত্তি

উপকরণ ব্যবহারের সুযোগ

(চার) **যে গতিশীলতাই ইতিহাসের প্রধান ধর্ম সেই গতিশীলতা যেন এককেরও অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হয়।**

॥ একক পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ **গণতান্ত্রিক আচরণবিধি, আদর্শ ও পদ্ধতি সম্পর্কে সঠিক উপলব্ধি অর্জিত হতে পারে একক পদ্ধতির মাধ্যমে।** এই পদ্ধতিই শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী বিচার-শক্তি, সমস্যা সমাধান-উপযোগী চিন্তাশক্তি আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে যথোচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সামর্থ প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে।

আচরণগত পরিবর্তন

(দুই) একক পদ্ধতির সাহায্যে ইতিহাসের বিষয়-বস্তু বিন্যস্ত হবার ফলে **শিক্ষার্থীর পক্ষে সমগ্র বিষয়-বস্তুর অন্তর্নিহিত সম্পর্ক অনুধাবন সহজ সাধ্য হয়।**

(তিন) ইতিহাসের সমগ্র বিষয়-বস্তু একই সঙ্গে অধ্যয়ন সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে **একক হ'ল এই বিষয়-বস্তুর এক সম্পূর্ণ যুক্তিবাদী বিভাজন।**

॥ সমাজতাত্ত্বিক পদ্ধতি ॥

॥ Sociological Method ॥

ইতিহাস-চর্চার সাম্প্রতিক প্রবণতা হ'ল সমাজ-বিবর্তনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করা। এ কারণে কেহ কেহ ইতিহাসকে সমাজ-বিজ্ঞানেরই অঙ্গ হিসেবে

গ্রহণ করেছেন। তাদের মতে, আধুনিক সামাজিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে অতীতের ঘটনাবলী আলোচনা করতে হয়। সমাজের বর্তমান রূপের পেছনে আছে তার অর্থ নৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক এবং মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিকা। তাই এই পটভূমিকার বিচার বিশ্লেষণ ব্যতিরেকে আধুনিক সমাজ-ব্যবস্থাকেও বুঝা যেতে পারে না।

এইসব পণ্ডিতেরাই **বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের বিষয়-বস্তুকে সমাজকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত করার কথা বলেছেন।** কিন্তু কঠোর ইতিহাস-বেত্তা যাঁরা, তাঁরা ইতিহাস সম্পর্কে এই সমাজ প্রধান মতবাদকে মেনে নিতে চান না।

॥ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহে নব প্রবর্তিত ইতিহাসের পাঠ্যক্রম ॥

১৯৭৪ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। ফলে প্রচলিত হয়েছে দ্বাদশ বর্ষব্যাপী মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা। কিন্তু এই পরিবর্তন কেবল কাঠামোগত নয়, পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রেও এসেছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তর। ইতিহাসের পাঠ্যক্রমও এই রূপান্তরের প্লাবন থেকে অব্যাহতি পায় নি।

নতুন কাঠামো ও ইতিহাস

শিক্ষার যে নতুন কাঠামো প্রবর্তিত হয়েছে সেখানে প্রথম দশ বৎসরকাল সাধারণ শিক্ষাকাল বলে চিহ্নিত। এই সাধারণ শিক্ষাকালে ইতিহাস একটি আবশ্যিক বিষয় হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। অবশ্য ইতিহাস নামক বিষয়টির নাম আর ইতিহাস রাখা হয় নি, **এর নতুন নামকরণ হয়েছে ভারত ও ভারতজন কথা বা India and her people.** ষষ্ঠ মান থেকে এই নতুন বিষয়টির পাঠ্যক্রম এক ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। নতুন পাঠ্যক্রমটি হ'ল এ রকম :—

৬ষ্ঠ মান :—বাংলাদেশের ইতিহাস। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের জন্ম পর্যন্ত।

৭ম মান :—ভারতের ইতিহাস। সিন্ধু সভ্যতা থেকে আরম্ভ করে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত।

৮ম মান :—ভারতের ইতিহাস। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু থেকে ভারতের স্বাধীনতা লাভ পর্যন্ত। এরই সঙ্গে রয়েছে, এই সময়ের মধ্যে বহির্ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

৯ম মান :—ভারতের ইতিহাস। প্রাচীনকাল থেকে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকাল পর্যন্ত।

১০ম মান :—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস। স্বাধীন ভারতীয় সংবিধান ও ভারতীয় নাগরিকদের অধিকার ও কর্তব্য।

এক ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে এই যে নতুন পাঠ্যক্রম নির্ধারিত হ'ল এর যৌক্তিকতা বিচার একান্তই প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই বিচারের মানদণ্ড হবে কি? এই মানদণ্ড

স্থির করার উদ্দেশ্যে আমরা শিক্ষায় অগ্রসর কয়েকটি দেশের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের প্রতি আলোকপাত করতে চাই।

॥ ইংলণ্ড ॥

প্রথমেই ইংলণ্ডের কথাতেই আসা যাক্। এদেশে পুঁথিগত মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য দু'ধরনের মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে, যথা: মডার্ণ স্কুল ও গ্রামার স্কুল। দুই স্কুলের ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের মধ্যে তারতম্য রয়েছে। যেমন **চার বৎসর ব্যাপী মডার্ণ স্কুলের মাধ্যমিক শিক্ষার** প্রথম তিন বছর শিক্ষার্থীদের ইংলণ্ড ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের পোষাক পরিচ্ছদ, যানবাহন, বাসগৃহ প্রভৃতির বিবর্তন সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হয়। শেষ বৎসরে শিক্ষার্থীরা রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থ নৈতিক থেকে সাম্প্রতিক সমস্যাবলীর সঙ্গে পরিচিত হয়।

গ্রামার স্কুলে শিক্ষাকাল অধিকতর দীর্ঘ, শিক্ষার্থীগণও অধিকতর মেধাবী। এখানে প্রথম দুই বৎসর প্রাগৈতিহাসিক ও প্রাচীন যুগের সঙ্গে ১৭১৪ পর্যন্ত ইংলণ্ডের ইতিহাস পড়ানো হয়। পরবর্তী বৎসরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস। এর পরের বৎসর আবার ইংলণ্ডের ইতিহাস। পঞ্চম বৎসরে বিস্তৃতভাবে ইউরোপের ইতিহাস। ষষ্ঠ বর্ষ থেকে ইংলণ্ড, ইউরোপ ও বিশ্ব ইতিহাসের সামগ্রিক পাঠ।

॥ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ॥

শিক্ষার প্রথম নয় বৎসর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণতঃ ইতিহাস একটি পৃথক বিষয় হিসেবে পঠিত হয় না। পরবর্তী তিন বৎসরে পড়ানো হয় উপনিবেশ, আমেরিকার ইতিহাস ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মকথা। তারপরের দুই বৎসর আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন। এর পরের বছর পৃথিবীর সামগ্রিক ইতিহাস। সর্বশেষে বিশ্ব ইতিহাসের পটভূমিকায় আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসের গভীরতর পাঠ।

॥ ফ্রান্স ॥

ফ্রান্সে বারো বৎসর বয়সে প্রথম ইতিহাসের পাঠ্য হ'ল প্রাগৈতিহাসিক কথা ও রোম সাম্রাজ্যের পতন পর্যন্ত প্রাচীন যুগের কথা। এর পরের বৎসর মধ্যযুগ। তার পরের বৎসর ১৭৮৯ সাল পর্যন্ত ইউরোপের ইতিহাস। তারপর এক বৎসর ১৭৮৯ সাল থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইতিহাস। এরপর এক বৎসর বিশ্বব্যাপী বিশেষ করে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিস্তৃতি। শেষ দুই বৎসরে বিশ্ব পটভূমিকায় ফ্রান্সের ইতিহাস সম্পর্কে গভীরতর পাঠ।

॥ সোভিয়েট রাশিয়া ॥

সোভিয়েট রাশিয়ার ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের লক্ষ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে "The curriculum in history reflects the demand that history be interpreted

as a single process governed by certain laws that the teaching of history be used on scientific explanations of facts, of causes and effects, and descriptions of important events and historical person ages." এই দৃষ্টিকোণ থেকে সোভিয়েট ইতিহাসের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত বিষয় হ'ল : জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধারা, প্রাক্-বিপ্লব যুগে এদিক থেকে সোভিয়েট বিজ্ঞানীদের অবদান ও তাঁদের জীবন কথা, সোভিয়েট বিপ্লবের ইতিহাস।

॥ এই পটভূমিকায় পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসের নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে আলোচনা ॥

একমাত্র সোভিয়েট রাশিয়া বাদ দিলে অন্যান্য তিনটি য়ুরোপীয় দেশের ইতিহাসের পাঠ্যক্রম থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে তারা নীতিগতভাবে ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন, জাতীয় সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে চেয়েছে তেমনি অন্যদিকে বিশ্ব-পটভূমিকায় নিজ নিজ দেশের ভূমিকাটি স্থির করার উদ্যোগও নেওয়া হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে সাধারণতঃ এটাই হ'ল ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী। ইতিহাসের পরিধি যদি সমগ্র মানব-সমাজ পর্যন্ত বিস্তৃতই না হ'ল, বৃহত্তর মানবতাবাদই যদি ইতিহাসে মর্যাদা না পেল তবে সে ইতিহাস শুধু বিকৃতই নয়, মানব-উত্তরাধিকারকেই অস্বীকার করার অপপ্রয়াস মাত্র।

কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আমরা কি করলাম! প্রথমেই দেখা যাচ্ছে **ইতিহাস নামক বিষয়টি এতদিন পর আমরা সমগ্র পাঠ্যক্রম থেকে নির্বাসন দিলাম।** হয়তো আগামী দশ বৎসর পর শিক্ষার্থীগণ বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাস নামক কোন বিষয়ের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর ওয়াকিবহাল থাকবে না। এখন ইতিহাসের নতুন নামকরণ হয়েছে ভারত ও ভারতজন কথা। কিন্তু এই নতুন নামকরণের মধ্যেই ইতিহাস তার নিজের সত্তাকে হারালো। কারণ ইতিহাস বলতে আমরা যে বৃহৎ পটভূমিকার অনুরণন পেতাম, ইতিহাস বলতে যে বৃহত্তর মানব-উত্তরাধিকারকে বুঝাত, ইতিহাস যে উদার উন্মুক্ত দিগন্তে অবাধবিচরণের সুযোগ দিত, এক্ষণে সেই অনুরণন আর স্পন্দিত হবে না, বৃহত্তর মানব উত্তরাধিকার ক্ষুদ্র উত্তরাধিকারে রূপান্তরিত হবে, দিগন্তও তার এখন অবাধ এবং উন্মুক্ত নয়। নতুন নামকরণের মধ্য দিয়ে এক সংকীর্ণতার বোধই বারংবার বিক্ষত করছে ইতিহাস নামক বিষয়টিকে। সবচেয়ে বিস্ময়ের হ'ল, বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে দাঁড়িয়ে জাতীয় নীতি হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রীতির কথা ঘোষণা করেও আমরা কি করে এমন সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রাখতে পারলাম।

ইতিহাসের নামকরণে পরিবর্তন

এবং এই সংকীর্ণতা যে কতদূর পরিব্যাপ্ত তা আরও বেশী পরিষ্কার হয়ে যায়

যখন আমরা দৃষ্টিপাত করি ইতিহাস পড়ানোর নতুন উদ্দেশ্যের প্রতি। বলা হয়েছে :

The main objectives of teaching history will be :

(1) To inculcate the love of the motherland, reverence for its past and a belief in its' future destiny as the home of a united co-operative society based on love, truth and justice.

(2) To awaken in the pupil proper understanding of his social and geographical environment and an urge to improve it.

(3) To develop the basic concept of India as a land of unity in diversity and strengthen the growth of national solidarity.

(4) To broaden the pupil's mind so to develop mutual respect for various religious and culture patterns.

ইতিহাস-চর্চার নতুন নীতি

(5) To imbibe and develop the individual and social virtues that make a man a reliable associate and trusted neighbour.

(6) To develop a sense of the rights and responsibilities of citizenship and inspire a sense of pride and dignity in personal honesty.

এই যে নবনির্দেশিত নীতি এখানে যা কিছু করতে চাওয়া হয়েছে সবই একান্ত ভারতবর্ষ কেন্দ্রিক। কিন্তু এতকাল পর এক অধ্যয়ন ও গবেষণার পর কি ফল এই দাঁড়ালো যে সমগ্র বিশ্ব থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করে এনে যা কিছু ভারতীয় তার উপরই গুরুত্ব আরোপ করলেই ভারতের ভারতীয়ত্বই তীব্র হয়ে উঠবে, যা কিছু ভারতীয় তার সবই অদ্ভুত, বোধ ও প্রজ্ঞার আলোয় সমুজ্জল হয়ে উঠবে? শুধু একটি কথাই জানতে ইচ্ছে করে, ইতিহাসের এইসব লক্ষ্য নির্দেশনার সঙ্গে কি আমাদের বহু বিঘোষিত জাতীয় নীতি সামঞ্জস্য রক্ষা করে?

এবার একটু পাঠ্যক্রমের দিকে তাকানো যাক। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্য হিসেবে বলা হয়েছে প্রাচীন যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস। খুব ভাল কথা, আমরা বুঝতে পারছি, স্বদেশের প্রতি প্রেম জাগরণের জন্য আঞ্চলিক প্রেমের ভূমিকা। কিন্তু বাংলাদেশ যার পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস এখনো রচিত হয় নি, কিংবা যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাও মতদ্বৈধতার ঊর্ধ্বে নয় বিশেষ করে একথা প্রযোজ্য প্রাচীন কাল সম্পর্কে এমন সংশয়-সংকুল বিষয় কি সুকুমার মতি শিক্ষার্থীদের পক্ষে অনুধাবন করা সহজ সাধ্য?

ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যক্রম

তাছাড়া পুস্তক-রচনার যে আয়তনের (পৃষ্ঠা সংখ্যার দিক থেকে) কথা বলা

হয়েছে তাও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। কারণ অত ক্ষুদ্র আয়তনের মধ্যে এত দীর্ঘ ইতিহাসের সন্নিবেশ করার অর্থ অসংখ্য ঘটনাবলীর ঠাঁস বুনানো।

পাঠ্যপুস্তকের আয়তন

বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ কে পেতে পারে? অপরিণত বালক-বালিকারা নিশ্চয়ই নয়।

তাই বাংলাদেশের ইতিহাস পাঠ্যক্রম রচনার ক্ষেত্রে আরও বেশী যুক্তিবাদী বাস্তববাদী হওয়ার প্রয়োজন ছিল বলে আমরা মনে করি।

আবার অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম রচনাকালে পাঠ্যক্রম প্রণেতাগণ সম্ভবতঃ অকস্মাৎ বিশ্ব-প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সজাগ হয়ে উঠেছিলেন। তাই শেষ অধ্যায়ে পনেরো পৃষ্ঠার মধ্যে ১৭০৭ থেকে ১৯৪৭ সালের মধ্যবর্তী কালের গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ করতে বলা হয়েছে। **কিন্তু এইসব ঘটনাবলীর সঙ্গে ভারতের ঘটনাবলীর সম্পর্ক-স্থাপনা হবে কিভাবে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা নেই।** ফলে মনে হয় প্রসঙ্গটি যেন ভারতের ইতিহাসের উপর খানিকটা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আরোপিত, স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

অষ্টম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম

দশমশ্রেণীর পাঠ্যক্রমে জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এটা প্রশংসনীয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সংবিধান ও নাগরিকতা সম্পর্কে যে অধ্যায় দুটি যুক্ত হয়েছে তাও সময়োচিত।

দশম শ্রেণীর পাঠ্যক্রম

তবে সপ্তম থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যেহেতু ভারতের ইতিহাসেরই দুবার পুনরাবৃত্তির সুযোগ রাখা হয়েছে সেক্ষেত্রে ইতিহাসের বৃহত্তর মূল্যবোধগুলোকে কিভাবে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের মধ্য দিয়ে আরও বেশী মর্যাদা দেওয়া যায় সে সম্পর্কে এখনো বিচার বিশ্লেষণের সুযোগ আছে বলে আমরা মনে করি।

ইতিহাসের বৃহত্তর মূল্যবোধ

পঞ্চম অধ্যায়

ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি

॥ বিষয়-সংকেত ॥

পদ্ধতির প্রয়োজন—উৎকৃষ্ট পদ্ধতির লক্ষণ—পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ—বর্ণনামূলক পদ্ধতি—অনুসন্ধানমূলক পদ্ধতি—কর্মমূলক পদ্ধতি—কয়েকটি পদ্ধতির আলোচনা—স্থানীয় ইতিহাস ও তার ব্যবহার—ইতিহাসে মোট দান প্রথা ॥

"Even the best curriculum and the most perfect syllabus remain dead unless quickened into life by the right methods of teaching and the right kind to teachers."

—*Secondary Education Commission*

"Method forms the most important link in the total learning chain which has on one hand the goals and purposes and on the other result and values."

'The history teacher must be fully conversant with the different methods of teaching in the same way as a soldier is to be conversant with the various weapons of fighting."

॥ পদ্ধতির প্রয়োজন ॥

॥ Necessity of Method ॥

শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাদান পদ্ধতির উপযোগিতা অপরিসীম। শিক্ষার উদ্দেশ্য গৃহীত হয় সুচিন্তিত ভাবে। তারপর সেই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার প্রয়োজনে রচিত হয় পাঠ্যক্রম। আর পাঠ্যক্রমের নির্ভুল বাস্তবায়ন সম্ভব হয় সঠিক পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে। **সমগ্র শিক্ষার ব্যবস্থাপনার এক প্রান্তে আছে শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্য প্রান্তে শিক্ষা লব্ধ ফলশ্রুতি এবং উভয় প্রান্তের সংযোগ হ'ল পদ্ধতি।** পদ্ধতির মধ্য দিয়েই শিক্ষার শুভাশুভ নির্ধারণ এবং গুণগত পরিমাপ সম্ভব হয়।

ইতিহাস শিক্ষককেও বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে হয়। বহু পদ্ধতির মধ্যে ঠিক কোন্ পদ্ধতিটি কোথায় ও কখন প্রযুক্ত হবে তা স্থির করবেন শিক্ষক

নিজের বিচার বুদ্ধির সাহায্যে। কারণ কোন একটি পদ্ধতিকে সর্বোৎকৃষ্ট বলে কখনো অভিহিত করা যায় না। আসলে পদ্ধতি হ'ল একটি পন্থা একটি মাধ্যম যার সাহায্যে শিক্ষক তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার শিক্ষার্থীর ভেতর সঞ্চারিত করবেন। তাই সঠিক পদ্ধতি নির্বাচন ও তার যথার্থ প্রয়োগ এক অতীব জরুরী প্রশ্ন।

জ্ঞান বিনিময়ের মাধ্যম

এছাড়া পদ্ধতির গুরুত্বের অন্য দিকও রয়েছে। শিক্ষকের অনেক অসামর্থ্য অক্ষমতা আবৃত হয়ে যেতে পারে যদি তিনি তাঁর পদ্ধতির প্রয়োগে আশানুরূপ সাফল্য লাভ করতে পারেন। বলা হয় যোগ্য শিক্ষকের সামর্থ্য এক জন্মগত ক্ষমতা। কিন্তু আজকের দিনে যখন শিক্ষার সার্বজনীন অধিকার সর্বজন স্বীকৃত এবং স্বীকৃতির সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ হচ্ছে তখন কেবলমাত্র 'born teacher'দের জন্যই আমাদের অপেক্ষা করলে চলবে না, প্রয়োজন মেটাবার তাগিদে শিক্ষক তৈরী করেও নিতে হবে। বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনে সাহায্য করে আমরা বহু সংখ্যক যোগ্য শিক্ষকের সংস্থান করতে পারি।

অক্ষমতার পরিপূরক

সবরকম পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষকের অবহিত হবার আর একটি দিকও রয়েছে। তা হ'ল, শিক্ষাদান যদিও একটি নৈমিত্তিক কর্ম তবু এই কর্ম থেকে যেন প্রাণের সজীব স্পর্শ যাতে কখনো বিচ্যুত না হয় সেদিকে তৎপর থাকা প্রয়োজন। প্রয়োজন মত নিত্য-নতুন পদ্ধতির ব্যবহারের মধ্য দিয়ে যেমন শ্রেণীকক্ষে একঘেঁয়েমি দূর করে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা যায় তেমনি শিক্ষাদান কর্মও হবে প্রাণ-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ।

শিক্ষার সজীবতা বজায় রাখা

॥ উৎকৃষ্ট পদ্ধতির লক্ষণ ॥

পদ্ধতি যেখানে বহুসংখ্যক সেখানে স্বভাবতঃই প্রশ্ন আসে কোন একটি পদ্ধতির কার্যকারিতা বিচার করা হবে কেমন করে? একটি পদ্ধতির উপযোগিতা নির্ধারণের মান দণ্ড হবে:

প্রথমতঃ যে পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের অপরিসীম কৌতূহলে উদ্দীপ্ত করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ যে পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাঞ্ছিত মূল্যবোধ জাগ্রত করতে পারে এবং তাদের কর্মের প্রতি যথাযথ মনোভাব বিকাশে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ, যে পদ্ধতি বিচারহীন মুখস্থ করার পরিবর্তে শিক্ষার্থীদের বিষয়ের গভীরে অবগাহন করতে উৎসাহিত করে।

চতুর্থতঃ, যে পদ্ধতি ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও অধ্যবসায়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের গভীরতর জ্ঞানের অন্বেষণে প্রবৃত্ত করে।

পঞ্চমতঃ, যে পদ্ধতি শিক্ষার্থীদের **প্রকৃত ঐতিহাসিকের অনুরূপ কর্ম পদ্ধতি** অনুসরণে উদ্বুদ্ধ করে।

ষষ্ঠতঃ, যে পদ্ধতি শ্রেণী কক্ষের গতানুগতিক পরিবেশ অপসারিত করে **এক ভিন্নতর পরিবেশ রচনায়** সাহায্য করে।

॥ পদ্ধতির শ্রেণী বিভাগ ॥

বহুকাল পর্যন্ত এমন একটা ধারণা বদ্ধমূল ছিল যে ইতিহাস হ'ল অন্ধ ভাবে গলাধঃকরণ করবার মত একটি বিষয়। এই মতের সমর্থক যাঁরা তাঁরা কখনো ইতিহাসের ভেতর গভীরতর কোন ধারার সন্ধান পান নি, কিংবা ইতিহাস তাঁদের কাছে এমন কোন তথ্যবাহী বিষয় হিসাবেও স্বীকৃত হয় নি যে কারণে কোন স্বতন্ত্র পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজন হয়। কিন্তু উল্টো দিকে আর এক দল বললেন, একটি স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে ইতিহাসের বিশেষ মর্যাদা যদি স্বীকার করে নিতে আমাদের কোন কুণ্ঠা না থাকে তা হলে সেই বিষয়কে প্রাণবন্ত এবং হৃদয়গ্রাহী করে তোলবার প্রয়াস আমাদের চালিয়ে যেতেই হবে। এই প্রয়াসকেই সার্থক করে তুলতে পারে ইতিহাস পঠন ও পাঠন কালে অভিনব পদ্ধতি অনুসরণের মধ্য দিয়ে। তাই ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করে তোলার প্রয়োজনে তাঁরা আধুনিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করবার কথা বললেন। ফলে ইতিহাস পঠন ও পাঠনের ক্ষেত্রে দেখা গেল বিভিন্ন বিচিত্র অনুসরণের প্রবণতা।

বর্তমানে ইতিহাস শিক্ষাদান কালে যে সব পদ্ধতি গ্রহণ করা হয়ে থাকে প্রয়োগ প্রকৃতি অনুসারে আমরা তাদের তিনটি প্রধান ভাগে ভাগ করে নিতে পারি যথা :—

(এক) **বর্ণনা মূলক পদ্ধতি বা Narrative Method.**

(দুই) **অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতি বা Investigative Method.**

(তিন) **কর্ম মূলক পদ্ধতি বা Activity Method.**

কিন্তু এই প্রধান ভাগগুলি প্রত্যেক বিভাগের নিজস্বতাকে স্বকীয়তাকে যথেষ্ট পরিষ্কার করছে না। তাই প্রত্যেকটি ভাগের স্বাতন্ত্র্যকে পরিস্ফুট করার উদ্দেশ্যে, এবং প্রত্যেক পদ্ধতিকে শ্রেণী কক্ষে প্রয়োগোপযোগী করে তোলার প্রয়োজনে পৃথক পৃথক পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে।

যেমন বর্ণনামূলক পদ্ধতি বলতে বুঝায়, মৌখিক পদ্ধতি, পাঠ্য পুস্তক পদ্ধতি, বিতর্ক ও আলোচনা পদ্ধতি, সমাজীকৃত পাঠচর্চা পদ্ধতি ইত্যাদি।

অনুসন্ধান মূলক পদ্ধতি বলতে বুঝায় আবিষ্কার পদ্ধতি, উৎস পদ্ধতি, ঐতিহাসিক পদ্ধতি, ডাল্টন পদ্ধতি প্রভৃতি।

কর্মমূলক পদ্ধতি বলতে বুঝায় প্রকল্প পদ্ধতি, একক পদ্ধতি, শিক্ষামূলক ভ্রমণ প্রভৃতি।

এবারে আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল এবং তাদের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা করব।

[এক] ॥ মৌখিক পদ্ধতি ॥
॥ Oral Method ॥

জনসন্ বলেছেন, "school history must, in the main, be presented as readymade information." বিষয় হিসেবে ইতিহাস জটিল ও বিমূর্ত। অথচ এই জটিল ও বিমূর্ত বিষয়কে সহজ ও বাস্তব করে তোলা সত্যিই এক আয়াসসাধ্য প্রয়াস। আর এই প্রয়াসকে সফল করে তোলার প্রধান দায়িত্ব গ্রহণ করবেন ইতিহাস-শিক্ষক। তিনিই জনসনের ইচ্ছে অনুযায়ী ইতিহাসকে 'readymade information' এ রূপান্তরিত করতে পারবেন। এই উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যে পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন তা হ'ল **মৌখিক পদ্ধতি**। যেহেতু এ ক্ষেত্রে শিক্ষক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রেণীর উপযোগী করে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্যকে পরিবেশন করেন তাই এই পদ্ধতিকে **বক্তৃতাধর্মী পদ্ধতি** বা **Lecture Method** অথবা **গল্পবলা পদ্ধতি** বা **Story telling Method**ও বলা হয়। অস্বীকার করার উপায় নেই, বিদ্যালয়ের একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত এই পদ্ধতি বিশেষ কার্যকরী এবং এই পদ্ধতির সাহায্যেই শিক্ষার্থীদের ইতিহাস সম্পর্কে অধিকতর আগ্রহশীল করে তোলা যায়।

॥ মৌখিক পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি সু-প্রযুক্ত হলে **শিক্ষার্থীগণ ইতিহাস সম্পর্কে অধিকতর কৌতূহলী হবে**। শিক্ষক শিক্ষার্থীর নিবিড় সান্নিধ্যে থেকে তার ব্যক্তিগত প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাসকে সজীব করে তোলার মত যথোচিত ব্যবস্থা নিতে পারেন।

কৌতূহল জাগ্রত করা

দ্বিতীয়তঃ **পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠায় যে ইতিহাস অচল, অনড়, মৃতবৎ, শিক্ষকের কণ্ঠে সেই ইতিহাস হয়ে ওঠে সজীব প্রাণোচ্ছল এবং এইটেই** স্বাভাবিক। তাই বলা হয়েছে, "The printing word and the visual symbols are effective only upto a point. It is the living voice of the teacher that touches the chord of understanding and opens the gates of reality. এই কাজে শিক্ষক যত বেশী সার্থক, শিক্ষার্থীর কল্পনা সম্পদের সমৃদ্ধি তত বেশী।

ইতিহাসকে জীবন্ত করা

তৃতীয়তঃ ইতিহাস পঠন-পাঠনের কাজে এই পদ্ধতির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ **এই পদ্ধতির সাহায্যেই অযথা কালক্ষেপ না করে পূর্ব ঘটনার সঙ্গে পরবর্তী ঘটনার যোগাযোগ অনায়াসেই স্থাপন করা যেতে পারে**। এ ছাড়া রয়েছে অন্য কয়েকটি দিক। তা হ'ল ইতিহাসের তথ্য বহুলতা, কোন কোন ক্ষেত্রে এ সব তথ্যের পারস্পরিক বিরোধীতা কিংবা কোন দুর্বোধ্য তথ্যের সরলীকরণের প্রয়োজনীয়তা ও

বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সংযোগ রক্ষা

ধরনের বহুবিধ সমস্যা যা ইতিহাস পঠন-পাঠন কালে যে কোন সময়েই সৃষ্টি হতে পারে তার সহজ সমাধান পাওয়া যেতে পারে একমাত্র এই পদ্ধতিরই যথাযথ ব্যবহারের মধ্য দিয়ে।

চতুর্থতঃ ইতিহাস চর্চার অন্যতম ফলশ্রুতি হ'ল **সত্যবাদিতা, সহমর্মিতা, সহনশীলতা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ সাধন।** মৌখিক পদ্ধতির সাহায্যে বিভিন্ন ঐতিহাসিক কাহিনী উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে আমরা সহজে শিক্ষার্থীর এইসব গুণাবলী বিকাশে সহায়তা করতে পারি। এই বক্তব্যে জোরালো সমর্থন জানিয়ে অধ্যাপক জার্ভিস বলেছেন, "The story is adding in the formation of ideals of conduct and so is contirbuting to the development of child's character and personality.

কয়েক গুণের বিকাশ

পঞ্চমতঃ এই পদ্ধতি প্রয়োগের আর একটি সুবিধে হ'ল **শিক্ষক পারিপার্শ্বিকতা অনুসারে শিক্ষার্থীর বয়স ও সামর্থ বিবেচনা করে শ্রেণীকক্ষে বিষয় বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন।** ইতিহাসের ক্ষেত্রে এটি একটি জরুরী প্রশ্ন। একই বিষয় বিদ্যালয়ের একাধিক শ্রেণীতে পাঠ্য থাকতে পারে। কিন্তু সব ক্ষেত্রে উপস্থাপন নিশ্চয়ই একই ধরনের হবে না। এই যে ব্যতিক্রম তাকে যদি স্পষ্ট করে তুলতে হয়, তাকে যদি কার্যকরী করতে হয় তবে শিক্ষক অনায়াসেই এই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে পারে।

প্রয়োজন অনুযায়ী বিষয়-বস্তু নির্ধারণ

।। মৌখিক পদ্ধতির অসুবিধা ।।

প্রথমতঃ **মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রধান ভূমিকা এতদূর সম্প্রসারিত যে শিক্ষার্থীর ভূমিকা এখানে একান্তই গৌণ।** শিক্ষক বিষয় বিশ্লেষণে মনপ্রাণে এতটা নিবিষ্ট থাকেন যে তাতে শিক্ষার্থীর প্রতি যথোচিত যত্নবান হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কেবল কথার মালা পর পর সাজিয়ে বিষয় উপস্থাপিত হবার ফলে শিক্ষার্থীর স্বাভাবিক কারণেই ধৈর্যচ্যুতি ঘটতে পারে।

শিক্ষকের অত্যধিক প্রাধান্য

দ্বিতীয়তঃ **মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষকের সর্বময় কর্তৃত্বের ফলে শিক্ষার্থী তার নিজস্ব তাগিদে সক্রিয় হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।** ফলে শিক্ষার্থী নিজের উদ্যোগকে উৎসাহিত করার পরিবর্তে শিক্ষকের উপর ক্রমশঃ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

তৃতীয়তঃ **মৌখিক পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী ইতিহাসের শিক্ষাকে বাস্তব জীবনে প্রতিফলিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।** ফলে এই পদ্ধতিতে শিক্ষা বাস্তব নির্ভর হওয়ার পরিবর্তে সর্বতোভাবে তাত্ত্বিক ভাবাপন্ন হয়ে যায়।

চতুর্থতঃ **মৌখিক পদ্ধতির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে সুযোগ্য শিক্ষকের যথেষ্ট দক্ষতার উপর।** কিন্তু আজকের ক্রম-সম্প্রসারণশীল শিক্ষার জগতে সর্বদাই এমন যোগ্যতা সম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাবে একথা জোর দিয়ে বলা যায় না।

যোগ্য শিক্ষকের অভাব

পঞ্চমতঃ **এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর নবলব্ধ জ্ঞানের সঠিক মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও যথেষ্ট প্রতিবন্ধকতা রয়েছে।** কারণ এ পথে যেমন একদিকে ব্যক্তি বৈষম্যের প্রতি যথোচিত সুবিচার করা সম্ভব হয় না তেমনি অন্যদিকে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীর নিজস্ব অগ্রগতি কতটুকু হ'ল তাও পরিমাপ করা যায় না।

মূল্যায়নের অসুবিধা

॥ এই পদ্ধতির অসুবিধেগুলো দূর করার উপায় ॥

সমালোচনা যাই হোক না কেন ইতিহাস শিক্ষাদান করার প্রয়োজনে মৌখিক পদ্ধতির ভূমিকাকে কখনো অগ্রাহ্য করা যায় না। আবার এই পদ্ধতি সম্পর্কীত অসুবিধেগুলোও নস্যাৎ করার নয়। সুতরাং প্রয়োজন হ'ল এমন ব্যবস্থার সন্ধান যাতে আমরা এই পদ্ধতি প্রয়োগের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকগুলো যতটা সম্ভব অপসারণ করতে পারি।

এদিক থেকে **শিক্ষককে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে তার বক্তৃতা মঞ্চ হ'ল একটি শ্রেণীকক্ষ, কোন জন সমাবেশ নয়।** সুতরাং সহজ-লভ্য প্রশংসাসূচক অব্যয় কখনোই তার লক্ষ্য হতে পারে না। বরং উল্টোদিকে সর্বদাই শিক্ষার্থীর মানসিকতাকে দৃষ্টির সম্মুখে রেখে বক্তব্য বিষয়ের ভাব ও ভাষা শিক্ষকের স্থির করে নিতে হবে।

শিক্ষকের বক্তৃতা

দ্বিতীয়তঃ **এই কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন শিক্ষকের যথেষ্ট পূর্ব প্রস্তুতি।** আলোচ্য বিষয় উপস্থাপনের জন্য আয়োজন, উপস্থাপন কৌশল, তারপর আলোচ্য বিষয়ের পুনরালোচনা—প্রভৃতি প্রত্যেকটি স্তর সম্পর্কেই শিক্ষককে পরিপূর্ণভাবে সজাগ ও সচেতন হয়ে আসতে হবে।

শিক্ষকের প্রকৃতি

তৃতীয়তঃ **শিক্ষককে সচেষ্ট হতে হবে যাতে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করেও শিক্ষার্থীকে যেন সক্রিয়ভাবে পাঠদান প্রক্রিয়ায় সামিল করা যায়।** আলোচনা চলাকালীন প্রশ্নোত্তরের ব্যবস্থা, শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার প্রভৃতি কৌশল অবলম্বন করা হলে শিক্ষার্থী মৌখিক পদ্ধতিতেও সজাগ ও সতর্ক থাকবে।

শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা

চতুর্থতঃ **শিক্ষক সতর্ক থাকবেন যেন তাঁর বিষয়বস্তু সর্বদাই শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।** এটা অত্যন্ত জরুরী বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে। কারণ এটা হতেই পারে যে ইতিহাসের একই বিষয়বস্তু বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীর পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভু'ক্ত।

শিক্ষার্থীর মানসিকতার সঙ্গে সঙ্গতি

পঞ্চমতঃ **এই পদ্ধতিতে শিক্ষককে বিষয়বস্তুর সঙ্গে আন্তরিক সখ্যতা স্থাপন করতে হবে।** কিন্তু তাই বলে ইতিহাস যেন কখনো বিকৃত না হয়। জার্ভিস এই প্রসঙ্গে বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন, "Historical stories, whether they be facts or legends, must be formulated by a truthfulness which is higher than more accuracy of incidents."

বিষয়-বস্তু সম্পর্কে নিষ্ঠা

[দুই] ॥ পাঠ্য পুস্তক পদ্ধতি ॥

॥ Text Book Method ॥

কোন নতুন বিষয় নিয়ে কেবলমাত্র শ্রেণীকক্ষে আলোচনা কখনোই যথেষ্ট হতে পারে না। বিশেষ করে ইতিহাসের মত বিষয় যেখানে তথ্যের বাহুল্য সর্বদাই রয়েছে সে ক্ষেত্রে শ্রেণীকক্ষে আলোচনার পর প্রয়োজন পুনরালোচনা। এই পুনরালোচনার প্রয়োজন মেটানো যায় পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে। তাই বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় পাঠ্য পুস্তক প্রায় অপরিহার্য। এই পাঠ্য পুস্তককে কেন্দ্র করে যে শিক্ষাদান পদ্ধতি তাই পাঠ্য পুস্তক পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষাদান কার্য পাঠ্য পুস্তককে অবলম্বন করে অগ্রসর হয়।

॥ এই পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে **স্মৃতিশক্তির চর্চা হয় নিয়মিত।** ইতিহাসে স্মৃতি শক্তির যে প্রয়োজন রয়েছে তাতো আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি।

পাঠ্যাভ্যাস

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে **শিক্ষার্থীর গ্রন্থ পাঠ্যাভ্যাস তৈরী হয়।** শুধু তাই নয়। কোন একটি গ্রন্থ পাঠ করে কিভাবে তার ভেতর থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয় সে পদ্ধতিও শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পারে।

তৃতীয়তঃ এ পথেই **শিক্ষার্থীর মনন, চিন্তন ও অনুধাবন শক্তি ক্রমশঃ বিকশিত হতে থাকে।** শিক্ষার্থী ক্রমশঃ যুক্তি বিন্যাসী পথ বেয়ে বৃহত্তর জ্ঞানের সন্ধানে অগ্রসর হতে থাকে।

॥ এই পদ্ধতির অসুবিধা ॥

অর্থহীন মুখস্থ করার প্রবণতা

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি প্রয়োগের ফলে **শিক্ষার্থীদের অর্থহীন মুখস্থ করার প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।** বিষয়গত তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করার পরিবর্তে শিক্ষার্থী কেবল নির্বোধ গলাধঃকরণ করতে উৎসাহী হয়। ফলে বিষয়টি তার নিজস্ব আবেদন হারিয়ে এক অবোধ তত্ত্বে রূপান্তরিত হয়।

বিচারশক্তি বিকাশে বাধা

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নিজস্ব **বিচারবোধকে শাণিত করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।** শিক্ষার্থী পাঠ্য পুস্তকের মতামত দ্বারাই প্রভাবিত হয়। কিন্তু এমন অবস্থা প্রকৃত ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রে এক বিরাট প্রতিবন্ধক। কারণ বিভিন্ন তথ্য থেকে সত্যটুকুকে আবিষ্কার করাই হ'ল ইতিহাস চর্চার প্রাথমিক শর্ত।

॥ অসুবিধেগুলো দূর করার উপায় ।

প্রথমতঃ বিদ্যালয়ে কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তককে পাঠ্য-পুস্তক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রথা পরিত্যাগ করতে হবে। এর পরিবর্তে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত উপযুক্ত শ্রেণীর পুস্তকের তালিকা দিয়ে দেওয়া হবে।

দ্বিতীয়তঃ ঐ তালিকা অনুযায়ী পুস্তক যেন বিদ্যালয় গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে, যেন তারা বিভিন্ন লেখকের লেখা পুস্তক পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ হয়।

তৃতীয়তঃ এ বিষয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ ভাবে সাহায্য করতে পারেন। ইতিহাসের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর কোন্ কোন্ গ্রন্থকারের বই শিক্ষার্থীদের পড়া উচিত সে সম্পর্কে তিনি তাদের নিয়মিত উপদেশ দিতে পারেন।

চতুর্থতঃ বিভিন্ন বই পাঠ করে শিক্ষার্থীরা যেন নিজস্ব বক্তব্য খাতায় তুলতে সক্ষম হয় সেদিকেও নজর দিতে হবে। এ পন্থায়ই শিক্ষার্থীদের স্বাধীন চিন্তা শক্তি ও বিচার শক্তির বিকাশ হতে পারে।

[তিন] ॥ আলোচনা পদ্ধতি ॥
॥ Discussion Method ॥

ইতিহাস চর্চার প্রয়োজনে আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম। পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে তাদের আদান-প্রদানের মধ্য দিয়ে একটি সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছানো—এটি এমন একটি পদ্ধতি যা কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয় বৃহত্তর সামাজিক জীবনের প্রয়োজনে একান্তই অপরিহার্য। আর ইতিহাস? যেখানে মতানৈক্য খুবই স্বাভাবিক, তথ্যের ব্যাখ্যা স্বভাবতই অপরিহার্য সেখানে আলোচনার গুরুত্ব আমরা সহজেই অনুধাবন করতে পারি।

কিন্তু প্রকৃত পক্ষে আলোচনা বলতে নিছক বাক্য বিস্তারকে বুঝায় না। কিংবা এটি এমন একটি স্বাভাবিক পদ্ধতি নয় যাকে আমরা সহজাত বলতে পারি। প্রকৃত পক্ষে আলোচনা এমন একটি অভ্যাসগত পদ্ধতি যা আমাদের আলোচনার গুরুত্ব চর্চার মধ্য দিয়ে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে অর্জন করতে হয়। আলোচনা চলাকালে বক্তব্যে কত বৈপরীত্যের সৃষ্টি হয়, কত যুক্তির দুর্গপ্রাকার বিস্তৃত হয়, কিন্তু মত প্রতিষ্ঠার কত প্রাণপণ প্রয়াস চালানো হয়। কিন্তু সব প্রয়াসের শেষে কেমন চমৎকার একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়।

তাই আলোচনা পদ্ধতি কোন পূর্ব সিদ্ধান্ত নির্ভর নয়, বরং সিদ্ধান্তের সন্ধান বা কোন সিদ্ধান্তের যথার্থতা বিচারই হ'ল আলোচনা পদ্ধতি। ইতিহাস শিক্ষণের প্রয়োজনে নিম্নোক্ত উদ্দেশ্যসমূহ সাধনে আমরা আলোচনা পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি :—

(এক) আমাদের সমস্ত কর্ম পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য।

(দুই) সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের আদান-প্রদানের উদ্দেশ্যে।

(তিন) সংগৃহীত বিভিন্ন তথ্যের মূল্য পরিমাপ করার প্রয়োজনে।
(চার) কোন একটি ধারণা (idea) সম্পর্কে পরিষ্কার মত গড়ে তোলার জন্যে
(পাঁচ) ইতিহাস চর্চায় অধিকতর আগ্রহশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে।
(ছয়) সম্পন্ন কর্মের সঠিক মূল্যায়নের প্রয়োজনে।

এই আলোচনা পদ্ধতি বিভিন্নভাবে প্রযুক্ত হতে পারে। যেমন, সমষ্টিগতভাবে খোলাখুলি আলোচনা, সমষ্টিগত ভাবে প্রথাগত আলোচনা, প্যানেল আলোচনা, বিতর্ক সভা, আলোচনা চক্র বা সিম্পোজিয়াম প্রভৃতি।

॥ আলোচনা পদ্ধতির প্রয়োগ কৌশল ॥

এই পদ্ধতির যথাযথ রূপায়ণের জন্য প্রয়োজন যথাযথ পরিকল্পনার। এই পরিকল্পনার স্তর হ'ল **তিনটি**। যথা: **প্রস্তুতি, আলোচনা ও মূল্যায়ন।**

সার্থক আলোচনার জন্য শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েরই যথেষ্ট মাত্রায় প্রস্তুত হতে হবে। সমগ্র আলোচনাটির পরিচালক হিসেবে শিক্ষক বিচার্য বিষয়টি সম্পর্কে গভীর ও সূক্ষ্ম ভাবে অধ্যয়ন করবেন। বিষয়টির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে তাকে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করতে হবে। আলোচনা যাতে লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয় সে কারণে তাকে সমগ্র বিষয়টিকে যুক্তিযুক্তভাবে সাজাতে হবে। আলোচনা সুপরিচালিত করার উদ্দেশ্যে আলোচনার পথ নির্দেশক কতকগুলো নির্দেশনা তিনিই স্থির করে দেবেন। এইভাবে যথার্থ প্রস্তুতির উপরই একটি আলোচনার সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে।

প্রস্তুতির স্তর

এরপর এল প্রকৃত আলোচনার স্তর। এইস্তরে প্রথম কথাটি হ'ল, শিক্ষক তার চলনে-বলনে এমন পরিবেশ রচনা করবেন যেন তার শিক্ষার্থীরা সহজ ও স্বাভাবিকভাবে, নির্ভীক ও নির্দ্বিধায় আপন মনের ভাবটি প্রকাশ করতে কোন রকম কুণ্ঠাবোধ না করে। **গণতান্ত্রিক পারিপার্শ্বিকতাই হ'ল সার্থক আলোচনার প্রাথমিক শর্ত।** অবশ্য শিক্ষককে শ্রেণী শৃঙ্খলার বিষয়েও বিশেষ সতর্ক হতে হবে। শিক্ষার্থীগণ যেন অবাধে পরস্পরের বক্তব্য শুনতে পারে এমনভাবে শ্রেণী বিন্যাস করে নিতে হবে। তারপর প্রয়োজন হ'ল শ্রেণীকক্ষে একটি আন্তরিক পরিমণ্ডল রচনা। **আলোচনা আক্রমণাত্মক না হয়ে যেন সহযোগিতামূলক হয়, পরমত সহিষ্ণু হয়, শিক্ষককে সে সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে।**

প্রকৃত আলোচনার স্তর

সর্বশেষ স্তর হ'ল মূল্যায়নের স্তর। যে বিষয় নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছিল তার উপর কতটা আলোকপাত যথাযথভাবে করা সম্ভব হ'ল তার বিচার করতে হবে এই স্তরে। এই বিচারও কখনো বিক্ষিপ্ত বা উদ্দেশ্য বিহীন হতে পারে না। তাই যথাযথ বিচারের প্রয়োজনে আমরা তিনটি লক্ষ্য স্থির করে নিতে পারি। প্রথমতঃ যে বিষয় নিয়ে আলোচনা হ'ল সেই বিষয় সম্পর্কে

মূল্যায়নের স্তর

শিক্ষার্থীর জ্ঞান কতটা তা পরিমাপ করা। দ্বিতীয়তঃ আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ অর্থাৎ তার আলোচনা কতটা তথ্য ভিত্তিক ও নৈর্বক্তিক হ'ল তার পরিমাপ করা। তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন করা।

॥ আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা ॥

বলাই বাহুল্য আলোচনা পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। **আলোচনা চক্রের নেতা হিসেবে তাঁর অন্যতম কাজ হ'ল আলোচনায় অংশ গ্রহণকারী সকল সদস্যের আন্তরিক সহযোগিতা সংগ্রহ করা।** এটি একটি জরুরী দায়িত্ব। কারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে ব্যক্তি বৈষম্য। কেউ হয়তো অন্তর্মুখী, কেউ বহির্মুখী। কিন্তু সবাইকে সক্রিয় করে তোলার মধ্য দিয়েই শিক্ষকের সাফল্য বহুলাংশে সূচিত হবে।

সবাইকে সহযোগী করা

তারপর শিক্ষককে লক্ষ্য রাখতে হবে, **আলোচনা যেন কখনো বিপথগামী না হয়।** তবে এ কাজেও তিনি কখনো আপন কতৃত্বকে জোর করে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করবেন না। আলোচনার প্রয়োজন হলে শিক্ষক এমনভাবে হস্তক্ষেপ করবেন যেন শিক্ষার্থীরা স্পষ্টই অনুভব করতে পারে যে তাদের আলোচনা লক্ষ্যচ্যুত হচ্ছে।

আলোচনাকে সঠিক পথে পরিচালনা

সমগ্র আলোচনায় যেন **আন্তরিকতার স্পর্শটুকু সর্বদাই সজীব থাকে এটাও শিক্ষকের লক্ষ্যণীয়।** এরজন্য প্রয়োজন হ'ল পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মনোভাব।

এককথায় শিক্ষক এই পদ্ধতিতে কেবলমাত্র একজন সংগঠক পরিচালকই নয়, তিনি হলেন একজন সক্রিয় অংশগ্রহণকারীও বটে।

॥ আলোচনা পদ্ধতির সুবিধা ॥

এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই একজন সক্রিয় অংশীদার হিসেবে দায়িত্বশীল। সেই সুবাদে এই পদ্ধতির সুবিধেগুলো সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রথমতঃ **এই পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সততার সঙ্গে সত্যানুসন্ধানী হতে উদ্বুদ্ধ করে।** ফলে শিক্ষার্থী নিজস্ব তাগিদে নতুন নতুন তথ্য সংগ্রহ করে এবং পারস্পরিক আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে নিজের ক্রটিগুলো সংশোধন করে নিতে পারে। এ পথেই শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ ক্রমশঃ নিশ্চিত হয়।

সততা ও সত্যানুসন্ধিৎসা

দ্বিতীয়তঃ **পারস্পরিক সমঝোতার মধ্য দিয়ে নতুন জ্ঞান অর্জনের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।** আর এই জ্ঞান কখনোই আরোপিত নয়, বরং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি সঞ্জাত।

তৃতীয়তঃ সংঘবদ্ধভাবে বৌদ্ধিক বিকাশে এই পদ্ধতির অবদান লক্ষ্যণীয়। ব্যক্তিগত উদ্যোগে যে জ্ঞানার্জন দীর্ঘ শ্রম ও সময় সাপেক্ষ, যৌথভাবে সেই জ্ঞান স্বতোৎসারিত এবং সহজ লভ্য।

চতুর্থতঃ আত্ম-মূল্যায়নে এই পদ্ধতি বিশেষ সাহায্যকারী। আলোচনার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী অনুভব করে যে তার অধীত বিষয় কতটা গভীর এবং সূক্ষ্ম। আলোচনার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী নিজস্ব বিশ্বাসের যৌক্তিকতা বিচার করে দেখতে পারে।

আত্ম-মূল্যায়ন

পঞ্চমতঃ আলোচনার মধ্য দিয়েই বিচার্য বিষয়ে নতুন নতুন ক্ষেত্র উদ্‌ঘাটিত হয়। ফলে শিক্ষার্থী স্বাভাবিক ভাবেই অনুপ্রাণিত হয় নবাবিষ্কৃত ক্ষেত্রগুলো নিয়ে অধিকতর অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করতে।

ষষ্ঠতঃ এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি, বিচারশক্তি, তার পরমত সহিষ্ণুতা তার সহযোগিতার মনোভাব প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো যেতে পারে।

সপ্তমতঃ শিক্ষকের দিক থেকে এই পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। আলোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষক প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন দিক থেকে পরিমাপ করতে পারেন। এই পরিমাপ শিক্ষককে তার নির্ধারিত দায়িত্ব পালনে বিশেষভাবে সাহায্য করে। এই পরিমাপের উপর ভিত্তি করেই তিনি যেমন একদিকে উন্নতমানের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারেন তেমনি অন্যদিকে যারা পশ্চাদপদ তাদেরকেও টেনে তোলবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

শিক্ষকের সুবিধা

।। আলোচনা পদ্ধতির অসুবিধা ।।

প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা অত্যন্ত সময় সাপেক্ষ। ফলে বিভিন্ন শ্রেণীর জন্য নির্ধারিত পাঠ্যক্রম এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতিতে প্রস্তুতি পর্বের গুরুত্ব এতটাই বেশী যে সেক্ষেত্রে কোনরকম ঔদাসীন্য বা অবহেলা থাকলে সমগ্র আলোচনাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ বর্তমানে প্রতি শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য যেমন, সেক্ষেত্রে এই পদ্ধতির প্রয়োগ বাস্তব দিক থেকে অসুবিধা জনক। এমনটা হতেই পারে যে হয়তো প্রতিটি শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণ হয়তো সম্ভব হ'ল না। শিক্ষকের পক্ষেও সকলের প্রতি সমান মনোযোগী হওয়াও সহজ নয়।

শিক্ষার্থীর সংখ্যাধিক্য

তবে এই প্রসঙ্গে শেষ কথাটি হ'ল, ইতিহাস হ'ল একটি জটিল ও বিমূর্ত বিষয়।

তাই নিম্ন শ্রেণীর অপরিণত শিক্ষার্থীর পক্ষে এই পদ্ধতিতে সার্থক অংশ গ্রহণ সম্ভব নয়। বরং সেই তুলনায় অনেকখানি সাফল্য আশা করা যায় উচ্চতর শ্রেণীতে। কিন্তু সেখানেও এই পদ্ধতির নিয়মিত প্রয়োগ সহজসাধ্য নয়। আমরা এর পরিবর্তে নৈমিত্তিকতায় বৈচিত্র সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মাঝে মাঝে উপযুক্ত বিষয় নির্বাচন করে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারি।

[চার] ॥ সক্রেটিক পদ্ধতি ॥
॥ Socratic Method ॥

প্রশ্নোত্তর পদ্ধতির গুরুত্ব

প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর পূর্বজ্ঞান বা নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষা করার পদ্ধতি সর্বজন বিদিত এবং বহু প্রচলিত। প্রকৃতপক্ষে যে কোন পদ্ধতিই আমরা অনুসরণ করি না কেন সর্বক্ষেত্রেই প্রশ্নোত্তরের একটি নির্দিষ্ট ভূমিকা সর্বজন স্বীকৃত। অল্প সময়ে এবং অতি সহজে শিক্ষার্থীর সামর্থ পরিমাপ করার সহজতর কোন পন্থা আর নেই, প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি ছাড়া।

প্রশ্নের শ্রেণী বিভাগ

কিন্তু বিচার্য হ'ল প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য কি? উত্তরে বলা চলে প্রশ্ন সাধারণতঃ তিন ধরনের হতে পারে। প্রথমতঃ পরীক্ষামূলক প্রশ্ন বা testing question, দ্বিতীয়তঃ শিক্ষামূলক প্রশ্ন বা training question, সর্বশেষে শৃঙ্খলা-মূলক প্রশ্ন বা disciplinary question. প্রতিটি ভাগকে আবার বিভিন্ন উপভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে।

সক্রেটিসের প্রশ্ন

প্রশ্ন করার পদ্ধতিকে যে কতটা সার্থক ভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে তার প্রমাণ গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস। তিনি দেশের জনগণকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে প্রশ্নোত্তর পদ্ধতিই গ্রহণ করেছিলেন। তাই তাঁর নাম অনুসারে প্রচলিত হয়েছে সক্রেটিক পদ্ধতি। এবার এই পদ্ধতিটি বিশ্লেষণ করা যাক্।

সক্রেটিসের প্রশ্নের বিভিন্ন স্তর

সক্রেটিস অপরকে নিজের মতে নিয়ে আসার জন্য প্রশ্নোত্তর পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। **তাঁর পদ্ধতির ছিল তিনটি স্তর।** প্রথম স্তরে তিনি প্রশ্নের মাধ্যমে অন্যের মতকে প্রকাশ করতে বাধ্য করতেন। দ্বিতীয় স্তরে প্রশ্নের মাধ্যমেই তিনি অন্যের মতকে নাকচ করে দিতেন। তৃতীয় ও সর্বশেষ স্তরে তিনি প্রশ্নের মাধ্যমেই নিজের মতামতকে প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট হতেন।

বলা হ'ল সক্রেটিস্ অনুসৃত এই পন্থা আমরা ইতিহাস শিক্ষাদান ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারি। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই পদ্ধতিতে ইতিহাসের সত্যানুসন্ধান কার্যে নিযুক্ত হতে হবে। তবে প্রশ্নগুলোকে হতে হবে যথাযথ, সত্যানুসন্ধানী এবং উদ্দেশ্যপূর্ণ। তাহলে ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর ভুল ধারণাগুলো ভেঙ্গে যাবে। এছাড়া এ

পদ্ধতি সুপ্রযুক্ত হলে ক্রমান্বয়ে শিক্ষার্থী তার নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে সচেতন হবে এবং তার ফলে সে ধীরে ধীরে অধিকতর জ্ঞানার্জনে উৎসাহী হয়ে উঠ্‌ছে।

[পাঁচ] ॥ আবিষ্কার পদ্ধতি ॥
॥ Heuristic Method ॥

ইতিহাসের পদ্ধতি এক দুরূহ পদ্ধতি এবং ইতিহাসের সত্যও এক আপেক্ষিক সত্য। তাই ঐতিহাসিক সত্যকে যেমন চরমতম সত্য বলে মেনে নেবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই তেমনি সেই সত্যকে কষ্টি পাথরে যাচাই করে নেবার তাগিদে ইতিহাসের পাঠককে ইতিহাসের পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হতে হবে। এই কারণেই ঐতিহাসিকের সিদ্ধান্তকে অন্ধভাবে মেনে নেওয়ার অর্থ পরবর্তী জীবনে বিচারহীন ভাবে পরের মতকে মেনে নেবার প্রবণতাকেই উৎসাহিত করা। তাই যা একান্তভাবে বাঞ্ছিত তা হ'ল বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণও ঐতিহাসিকের কর্মপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হয়ে ইতিহাস আবিষ্কারের কৌশলটি আয়ত্ত করবে। এই মতবাদ থেকেই জন্ম হয়েছে আবিষ্কার পদ্ধতির।

ঐতিহাসিক সত্য ও পদ্ধতি

এই পদ্ধতির মূল কথা হ'ল, **শিক্ষার্থীগণ বিভিন্ন তথ্য থেকে আপন উদ্যোগে ইতিহাস আবিষ্কার করবে।** কালচার ইপক্ মতবাদের তাত্ত্বিকেরা যেমন ডারুউইন বা স্ট্যানলি হল্ বলেছেন যে মানব জাতি তো নিজের অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধিৎসাকে কাজে লাগিয়ে সত্যকে জেনেছেন। এ কথা যখন বৃহত্তর মানব-জাতি সম্পর্কে সত্য তখন ব্যক্তি-জীবনের ক্ষেত্রেও এই সত্যের ব্যতিক্রম ঘটার কোন কারণ নেই।

পদ্ধতির মূলকথা

এই পদ্ধতিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়কেই স্বাধীন ভাবে চিন্তা করতে হয়। এই চিন্তালব্ধ যে জ্ঞান তাই হ'ল প্রকৃত জ্ঞান। জ্ঞান অর্জনের এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থী ইতিহাসে বৈজ্ঞানিক কর্মপন্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে। প্রকৃতপক্ষে **সক্রিয় কর্মোদ্যোগই হ'ল আবিষ্কার পদ্ধতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।** এই পদ্ধতিতে প্রথম হ'ল কোন একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে চিন্তা, তারপর চিন্তালব্ধ ফলশ্রুতি নিয়ে বিচার-বিবেচনা, বিচার-বিবেচনা থেকেই জাগ্রত হয় অধিকতর জানার আকাঙ্ক্ষা বা অনুসন্ধিৎসা আর এই পদ্ধতির শেষ হ'ল নিত্য নতুন জ্ঞানার্জনের আনন্দানুভবে।

পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য

প্রকৃতপক্ষে আবিষ্কার পদ্ধতি কোন স্পষ্ট পদ্ধতি নয়, **বরং একে আমরা একটি শিক্ষানীতি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।** ইতিহাস শিক্ষার একটি নীতি হিসেবে এখানে বক্তব্য যতটা স্বচ্ছ ও স্পষ্ট, একটি শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবে ততটা নয়। তাই এই পদ্ধতির মূল কথাটিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয়েছে আরও নানাবিধ পদ্ধতির।

[ছয়] ॥ উৎস পদ্ধতি ॥

॥ Source Method ॥

বিজ্ঞান ভিত্তিক ইতিহাস চর্চা আরম্ভ হ'ল যেদিন—সেইদিন থেকে বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদান নিয়ে শুরু হ'ল ক্রমবর্ধমান গবেষণা। ঐতিহাসিক দেখলেন, সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনার একমাত্র মাধ্যম হ'ল বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের যথাযথ অন্বেষণ, বিচার এবং মূল্যায়ন। **যথার্থ উপাদানের উপরই নির্ভর করে ইতিহাস রচনার যথার্থতা।** তাই ঐতিহাসিককে জানতে হয়, ইতিহাসের উৎস কি এবং কেমনভাবে ঐ সব উৎসকে রচনায় প্রয়োগ করা যায়।

উৎস কি?

তা হলে এই যখন ইতিহাস রচনার কলা কৌশল, তখন প্রয়োজন হ'ল একজন শিক্ষার্থীর ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে এই কৌশলটি আয়ত্ত করার। তাকে জানতেই হবে কেমন ভাবে বিভিন্ন উপাদান থেকে ইতিহাস রচিত হয়। এই অনুভব থেকেই সৃষ্টি হ'ল উৎস পদ্ধতির, ইতিহাস শিক্ষাদান ব্যবস্থায় যার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক অবদান অপরিসীম। তাই বলা হয়েছে "Correct history teaching means not only providing the pupil a background of historical knowledge, but also an insight into the meaning and significance of history and the ability to continue his studies for himself."

তাই বিদ্যালয় স্তরেই এমন কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে **যেন শিক্ষার্থীরা জানতে পারে ইতিহাস কি এবং কেমন ভাবে নির্ভুল ইতিহাস চর্চা করা যেতে পারে।** তাই শিক্ষার্থীদের উৎস ব্যবহার পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। অবশ্য এটা কখনোই আশা করা যায় না যে এই চর্চাকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে যেন প্রত্যেক শিক্ষার্থী একজন করে ক্ষুদে ঐতিহাসিকে রূপান্তরিত হয়। বরং ইতিহাস শিক্ষায় এই পদ্ধতি প্রয়োগের লক্ষ্য হবে উৎস ব্যবহারের মধ্য দিয়ে:

উৎস পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্র

(এক) শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন করা।

(দুই) শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিচার বোধকে জাগ্রত করা।

(তিন) তথ্য সংগ্রহ করার এবং সংগৃহীত তথ্যকে ব্যাখ্যা করার পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষার্থীকে পরিচিত করা।

(চার) অতীতকে সজীব এবং প্রাণবন্ত করে শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপন করা।

(পাঁচ) শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তিকে সমৃদ্ধ করে অতীতের নব-নির্মাণে উদ্বুদ্ধ করা।

(ছয়) সঠিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস চর্চায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

এখন প্রশ্ন হ'ল উৎস বলতে কি বুঝায়। উৎস বলতে বুঝায় সেইসব স্মৃতিচিহ্ন

যেগুলো অতীতের সাক্ষ্য বহন করে। প্রকৃতপক্ষে যে তৈরী করা ইতিহাস আমরা পাই সেখানে অতীতের কোন প্রত্যক্ষ স্পর্শ নেই। এই ইতিহাস ঐতিহাসিক আবিষ্কার করেছেন অতীতের স্মৃতি চিহ্নগুলোকে বিচার-বিশ্লেষণ করে, এবং এই স্মৃতিচিহ্নগুলো হ'ল সীমাহীন। আমরা আমাদের সুবিধে অনুযায়ী তাদের তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যথা: **প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান** বা archaeological source, **সাহিত্যগত উপাদান** বা literary source এবং **মৌখিক উপাদান** বা Oral tradition.

উৎসের শ্রেণী বিভাগ

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে আবার তিনটি উপভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম, **স্মৃতিস্তম্ভ-মূলক**—যেমন মহেঞ্জদড়ো-হরপ্পার ধ্বংসাবশেষ, প্রাচীন অট্টালিকা, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, রাজপ্রাসাদ প্রভৃতি। দ্বিতীয়, **শিলালিপি**, ইত্যাদি, তৃতীয় **বিভিন্ন যুগে প্রচলিত মুদ্রা**।

সাহিত্যগত উপাদানেরও রয়েছে বিভিন্ন ভাগ। যেমন, প্রথমেই আসে **ধর্মীয় রচনাবলী**। তারপর **ধর্মনিরপেক্ষ রচনাবলী**। এই বিভাগের এক্তিয়ারভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তি বিশেষের রচনাবলী যেমন, তেমনি বিভিন্ন সময়ে ঘোষিত সরকারী নির্দেশনামাও। সর্বশেষে বিভিন্ন বিদেশী পরিব্রাজকদের বিবরণ।

সাহিত্যগত উপাদান

মৌখিক উপাদান সমূহ প্রধানতঃ স্থানীয় ইতিহাস রচনাতেই বিশেষ কার্যকরী। প্রচলিত কথা ও কাহিনী এই পর্যায়ভুক্ত।

এইসব উপাদানগুলোকে আবার গুরুত্ব অনুসারে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা, **মৌলিক-উপাদান বা** primary source **এবং গৌণ উপাদান বা** secondary source. মৌলিক উপাদান বলতে বুঝায় সেইসব উপাদান যার রচয়িতাগণ ঘটনাটির সঙ্গে কোন না কোন ভাবে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। যেমন রাষ্ট্রীয় দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন আইন-কানুন, আত্ম-জীবনী ইত্যাদি। গৌণ উপাদান বলতে বুঝায় সেইসব উপাদান যার রচয়িতাগণ ঘটনাটির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত না হলেও তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই নিজেদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন। উদাহরণ বিভিন্ন যুগে রচিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক রচনাবলী।

মৌলিক ও গৌণ উপাদান

আমাদের পরবর্তী বিবেচ্য বিষয় হ'ল **বিভিন্ন প্রকারের উপাদানের নির্ভরযোগ্যতা**। যেহেতু উপাদানের উপর ভিত্তি করেই রচিত হয় ইতিহাস সে কারণে উপাদান কতটা বিশ্বাসযোগ্য, কতটা নির্ভরযোগ্য তার উপরই নির্ভর করে রচিত ইতিহাসের সার্থকতা বা ব্যর্থতা। তাই ঐতিহাসিককে বিশেষ যত্নের সঙ্গে উপাদানগুলিকে বাছাই করে নিতে হয়।

উপাদানের নির্ভর-যোগ্যতা

এই বাছাই কাজের জন্য বহুপ্রকার পদ্ধতি প্রচলিত। তার মধ্যে কয়েকটি

উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, ঐতিহাসিককে প্রথমে যাচাই করে দেখতে হয় যে **উপাদানের প্রথম উৎস যেখানে সেখানে কোন ব্যক্তিগত সংস্কার ছিল কি না।** উদাহরণ স্বরূপ বাণভট্টের হর্ষচরিত। এখানে বাণভট্টের প্রকাশ্য লক্ষ্যই ছিল হর্ষবর্ধনের গুণকীর্তন। সুতরাং এমন রচনা কখনো নৈর্বক্তিক হতে পারে না তাতো আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি। তারপর ঐতিহাসিককে বিচার করতে হবে যে **তাঁর সংগৃহীত উপাদানে কোন সময়গত বিচ্যুতি আছে কি না।** এরই সঙ্গে তিনি আরও লক্ষ্য করবেন যে **তাঁর আলোচ্য বিষয় নিয়ে কোন মতদ্বৈধতা আছে কি না।** থাকলে তিনি সকল প্রকার মতামতের সঙ্গে অবহিত হবেন এবং ক্রমশঃ নিজস্ব মতামত গড়ে তুলতে চেষ্টা করবেন।

উপাদান নির্বাচন পদ্ধতি

॥ উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ ॥

এই হ'ল উৎস পদ্ধতির তাত্ত্বিক দিক্‌। এবার আমাদের আলোচ্য এই পদ্ধতির ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ কেমন করে এই পদ্ধতি আমরা শ্রেণীকক্ষে প্রয়োগ করতে পারি।

অস্বীকার করার উপায় নেই আমাদের দেশের শিক্ষকেরা বিদ্যালয়ে নানাবিধ অসুবিধাকে মেনে নিয়ে তাঁদের দায়িত্ব পালন করেন। যেমন বিদ্যালয়ে সময়ের স্বল্পতা, উপকরণের অভাব, শিক্ষার্থীদের বৌদ্ধিক ও মানসিক অপরিপক্বতা, অতিদীর্ঘ পাঠ্যক্রম প্রভৃতি। কিন্তু এসব প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও যা আমাদের শিক্ষকেরা করতে পারেন তা হ'ল, **তিনি নিজে কেবলমাত্র পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করে ইতিহাস পড়াবেন না** এবং প্রতিটি আলোচনার শেষে **ভাল ভাল ঐতিহাসিকের রচনা পড়তে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করবেন।** অবশ্যই এইসব রচনা হবে গৌণ উপাদান। কিন্তু গৌণ উপাদানের সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরেই শিক্ষার্থী কৌতূহলী হবে মৌলিক উপাদানের সান্নিধ্য পেতে। এ ছাড়া সারা বৎসরে অন্ততঃ দু/একটি বিষয়ের পাঠ সম্পূর্ণ উৎস পদ্ধতির উপর নির্ভর করে দেওয়া যেতে পারে। এতে শিক্ষার্থী উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ-কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হবে।

বর্তমান অবস্থা ও তার উন্নয়ন

এ ছাড়া নৈমিত্তিক পাঠদান কার্যেও আমরা উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ করতে পারি বেশ চাতুর্যের সঙ্গে। যেমন শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। কিংবা উপস্থাপনের স্তরে শিক্ষক তাঁর আলোচ্য বিষয়কে বিশ্বাসযোগ্য ও মর্মস্পর্শী করে তোলার জন্য এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারেন। ঔরঙ্গজেবের চরিত্র আলোচনা প্রসঙ্গে যদি তাঁর ভাইদের কাছে লেখা ঔরঙ্গজেবের চিঠিগুলো শিক্ষক পড়ে শোনান তবে কি শ্রেণীকক্ষে একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচিত

নৈমিত্তিক কাজে উৎস পদ্ধতির ব্যবহার

হবে না? একইভাবে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে অভিযোজন স্তরে। আসল কথা হ'ল, উৎস পদ্ধতির সাহায্যে "Students are not expected to reconstruct history for themselves. Nor is it our intention to lead students to do original research work. The study of sources is intended to be an adjunct to the study of the text book."

॥ উৎস পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রকৃত ইতিহাস চর্চার সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচিত করবার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির ভূমিকা অসামান্য।

অতীতকে জীবন্ত করা

প্রথমতঃ মৃত **অতীতকে শ্রেণীকক্ষে জীবন্ত করে তুলতে উৎস পদ্ধতি বিশেষভাবে সহায়ক**। এই পদ্ধতিতে ইতিহাস কখনোই কতকগুলো রূপকথা বা কতকগুলো কল্পিত কাহিনীর সংকলনে আবদ্ধ থাকে না।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতি কেবলমাত্র **শিক্ষার্থীর কৌতূহল নিবৃত্ত করে না**, সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক হ্যাস্‌লক্‌-এর ভাষায় "Source method gives the children an insight into the methods by which history has been built up."

যুক্তি ও বিচার বোধ তীব্র করা

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি **শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধ ও বিচারবোধকে সুতীক্ষ্ণ করে তোলে**। সাধারণভাবে উপাদানের কোন গুরুত্বই নেই যতক্ষণ না তাকে কার্যকারণ সূত্রে গ্রথিত করা যায়। এই গ্রন্থনার যে প্রক্রিয়া তা অনুধাবনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর যুক্তিবোধ ও বিচার বোধ ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

চতুর্থতঃ **উৎস পদ্ধতি কতকগুলো মানসিক গুণাবলী অর্জনে সাহায্য করে**। যেমন সুচিন্তণ, কল্পনা শক্তি, তুলনামূলক বিচার ও বিশ্লেষণ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ-সামর্থ, নিজেকে প্রকাশ করার সামর্থ ইত্যাদি।

পঞ্চমতঃ **প্রকৃত ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল রচনায় উৎস পদ্ধতি অতুলনীয়**। কে. ডি. ঘোষ যথার্থই বলেছেন, "The sources vitalize history to the child by giving him the associations and atmosphere of the past. ডঃ কীটিংও বলেছেন যে ঐতিহাসিক পরিবেশ রচনায় উৎস পদ্ধতিই একমাত্র পদ্ধতি।

॥ উৎস পদ্ধতির অসুবিধা ॥

প্রথমতঃ **বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ব্যবহার করতে পারে এমন উৎস সহজলভ্য নয়**।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতির **প্রয়োগগত আঙ্গিকও বেশী জটিল**। ফলে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষার্থীগণের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি প্রযুক্ত নাও হতে পারে।

তৃতীয়তঃ **এই পদ্ধতির প্রয়োগের জন্য শিক্ষকদেরও বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত হওয়া দরকার।** প্রকৃতপক্ষে আমাদের শিক্ষকেরা ইতিহাস রচনাশৈলীর সঙ্গে আদৌ পরিচিত নয়। এটি একটি বিরাট প্রতিবন্ধক।

চতুর্থতঃ বহু রকমের উপাদান থেকে সঠিক এবং প্রয়োজনীয় উপাদানটি বেছে নেওয়াও খুব সহজ নয়।

এই পর্যায়ে আমাদের শেষ কথা হ'ল, যেমন বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে গবেষণাগার ব্যবহার করে প্রত্যেকটি শিক্ষার্থীকে আমরা একজন বৈজ্ঞানিকে রূপান্তরিত করতে চাই না, তেমনি অন্ধভাবে উৎস পদ্ধতি প্রয়োগ করে প্রত্যেককে ঐতিহাসিকে পরিণত করার লক্ষ্য আমাদের কখনোই থাকবে না। মনে রাখতে হবে, The road travelled is more important than the destination reached." এ কথাটি মনে রেখেই আমাদের উৎস পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে তৎপর থাকতে হবে।

[সাত] ॥ অবেক্ষণ পাঠচর্চা ॥
॥ Supervised Study ॥

অবেক্ষণ পাঠচর্চার পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে আর্থার বিনিং ও ডেভিড্ বিনিং বলেছেন, "By supervised study we mean the supervision by the teacher of a group or of a class of pupils as they work at their desks or around their tables." এই পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি কর্মসূচীর নির্দেশ দেন। শিক্ষার্থীগণ আপন উৎসাহে সেই কর্মসূচীর রূপায়ণে নিমগ্ন থাকে। শিক্ষক তাদের সান্নিধ্যেই থাকেন। তিনি শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন মত তাদের উপদেশ ও নির্দেশ দেন, সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্য রাখেন যাতে শিক্ষার্থীগণ নিজেদের সমস্যা সমাধানে যেন কখনো লক্ষ্যভ্রষ্ট না হন। ম্যাক্সওয়েল ও কিল্‌জার মতে, "Supervised study is the effective direction and oversight of the silent study and laboratory activities of pupils."

সংজ্ঞা

এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে **ইতিহাসের জন্য আলাদা করে কক্ষের প্রয়োজন।** সেই কক্ষ হবে সুসজ্জিত। সেখানে শিক্ষার্থীদের যেমন বসবার ব্যবস্থা থাকবে তেমন থাকবে পাঠাগার, যেন শিক্ষার্থীরা নিজেদের প্রয়োজনমত পুস্তক পেতে পারে।

॥ অবেক্ষণ পাঠচর্চা পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ গতানুগতিক শ্রেণীশিক্ষণ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। **শিক্ষার্থী নিজেদের তাগিদে এই পদ্ধতিতে অনেক বেশী সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ পায়।**

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষককে যেহেতু শিক্ষার্থীর নিবিড় সান্নিধ্যে থাকতে হয় সেইহেতু

তাদের পারস্পারিক সম্পর্ক মধুর হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে নিবিড় সান্নিধ্যের সুযোগে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারেন।

তৃতীয়তঃ এই **পদ্ধতিতে পরস্পরের মধ্যে একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।** শিক্ষার্থীগণ যে কেবল শিক্ষকের সাহায্য নিয়ে থাকে তাই নয়, নিজেদের অসুবিধায় তারা সহপাঠীদের সাহায্যও নেয়। এইভাবে পারস্পরিক সহমর্মিতার মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনা বিকশিত হয়।

চতুর্থতঃ যেহেতু শিক্ষকের সহযোগিতা সহজ লভ্য সেইহেতু **এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন ঐতিহাসিক তথ্য অতি অল্প সময়ে নিভু‍র্লভাবে আয়ত্ত করা যায়।**

পঞ্চমতঃ **শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দিগন্তও ক্রমশঃ উন্মোচিত হয়।** তার জ্ঞান পিপাসা তীব্র থেকে তীব্রতর হয়।

॥ অবেক্ষণ পাঠচর্চা পদ্ধতির অসুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি থেকে স্বল্প মেধা সম্পন্ন ও অনগ্রসর শিক্ষার্থীরা কতটা সুবিধা পেতে পারে সে সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ করার কারণ আছে।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতি **সময় সাপেক্ষ ও ব্যয় বহুল।** কেননা এর জন্য প্রয়োজন পৃথক ইতিহাস কক্ষ। আবার একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচী সুচারুরূপে সম্পন্ন করাও সময় সাপেক্ষ।

তৃতীয়তঃ বিদ্যালয়ের **নিম্নশ্রেণীতে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।**

॥ শিক্ষকের ভূমিকা ॥

এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাকে হতে হবে সুকৌশলী ও দক্ষ পরিচালক। তার নিজের ব্যাপক ও বিস্তৃত প্রস্তুতিও প্রয়োজন এই পদ্ধতিতে। কারণ শিক্ষার্থীর যে কোন সমস্যা সমাধানে তাকে সর্বক্ষণই সজাগ ও সচেতন থাকতে হবে। তার যোগ্যতা ও প্রস্তুতির উপর এই পদ্ধতির সাফল্য বহুলাংশে নির্ভরশীল।

[আট] ॥ প্রকল্প পদ্ধতি ॥
॥ Project Method ॥

ইতিহাসকে যদি বাস্তব দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থবহ করে তুলতে হয় তবে কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি আমাদের অনুসরণ করা কর্তব্য। প্রকল্প পদ্ধতি এধরনের এক কর্মকেন্দ্রিক পদ্ধতি।

আমেরিকান্ শিক্ষাবিদ্ জন্ ডিউই-র প্রয়োগবাদকে ভিত্তি করে প্রকল্প পদ্ধতির জন্ম। এই পদ্ধতির মূল কথাটি হ'ল, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে কোন একটি বিষয়ের সত্যতা নিরূপণ। কিলপ্যাট্রিক এই পদ্ধতির সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছেন: A project is a whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment.

সংজ্ঞা

ষ্টিভেনসন্ এই বলে মত প্রকাশ করেছেন, "It is a problematic act carried to completion in its natural setting." এই সংজ্ঞা দুইটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী সৃজনশীল কর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে বাস্তব পরিবেশে নিজ লক্ষ্যপূরণে উদ্যোগী হয়। এই পদ্ধতি চলমান জীবন ও সমাজ নির্ভর এবং এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী যে কোন বাহ্যিক প্রভাব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে আপন কর্তব্য পালনে অগ্রসর হয়।

॥ প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ ॥

পরিবেশ রচনা

প্রকল্প পদ্ধতি প্রয়োগের **প্রথম স্তর হ'ল প্রয়োজনীয় পরিবেশ রচনা**। পরিবেশ বলতে বুঝায় এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি যখন শিক্ষার্থীগণ স্বতঃ প্রণোদিত হয়ে কোন একটি কর্মোদ্যোগে প্রবৃত্ত হবে। শিক্ষক আলাপ-আলোচনা বা চিত্তাকর্ষক শিক্ষা-উপকরণ প্রদর্শনের সাহায্যে এমন পরিবেশ রচনা করবেন।

প্রকল্প নির্বাচন

দ্বিতীয় স্তর হ'ল **একটি প্রকল্প নির্বাচন**। এই প্রকল্প অবশ্যই পাঠ্য বিষয় বহির্ভূত হবে না। এবং প্রকল্প নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের অবাধ স্বাধীনতা দিতে হবে। কেননা নিজেদের নির্বাচিত প্রকল্পকে সার্থক করে তুলতে স্বভাবতঃই শিক্ষার্থীদের আগ্রহ থাকবে অপরিসীম। তবে এই নির্বাচনে শিক্ষক নিশ্চয়ই প্রয়োজনীয় উপদেশ ও নির্দেশ দেবেন।

উদ্দেশ্য নির্ণয়

তৃতীয় স্তর হ'ল **নির্বাচিত প্রকল্পের উদ্দেশ্য নির্ণয়**। কারণ যে কোন কর্মের সুচারু সম্পাদনের জন্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা জরুরী। কেন একটি নির্দিষ্ট প্রকল্প গ্রহণ করা হ'ল তার কারণগুলো শিক্ষার্থীগণ আলাপ-আলোচনার মাধমে স্পষ্ট করে নেবেন।

পরিকল্পনা প্রণয়ন

চতুর্থ স্তর হ'ল **প্রকল্পটি সার্থক রূপায়নের জন্য পকিল্পনা প্রণয়ন**। বিশৃঙ্খলভাবে কোন কাজ সুসম্পাদিত হতে পারে না। তাই প্রয়োজন পরিকল্পনার। এই পদ্ধতিতে পরিকল্পনাটিও তৈরী করবে শিক্ষার্থীগণ। তারা নিজেরা প্রকল্পটির বিভিন্ন দিক নিয়ে শলা-পরামর্শ করবে। তারপর একটি পরিকল্পনা রচনা করবে। এ ক্ষেত্রেও শিক্ষক থাকবেন প্রয়োজন মত পরামর্শদানের জন্য প্রস্তুত হয়ে। প্রকল্পটি রূপায়নের জন্য শিক্ষার্থীগণ নিজেদের কয়েকটি দলে বিভক্ত করে নেবে এবং প্রত্যেক দলের উপর অর্পিত থাকবে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ভার।

পঞ্চম স্তর হ'ল **পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্প রূপায়ন**। এইবার শিক্ষার্থীগণ সত্যিকারের কাজে নামবে। নিজেদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে এবার তারা অগ্রণী হয়েছে। বাস্তবক্ষেত্রে কোন কাজে সাফল্য অর্জনের জন্য প্রয়োজন পারস্পরিক সংযোগিতা ও সহমর্মিতাবোধ এবং এক অখণ্ড সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গী। নিখুঁতভাবে আবদ্ধ কর্ম সমাপনই হবে এই স্তরে একমাত্র লক্ষ্য।

ষষ্ঠ স্তর হ'ল **সম্পাদিত প্রকল্পের মূল্যায়ন**। কাজ শেষ হবার পর শিক্ষার্থীগণ এবার একত্রিত হয়ে বিচার বিবেচনা করবে, যে উদ্দেশ্য সম্মুখে রেখে তারা কাজে নেমেছিল তার কতটা সার্থক হ'ল, কোথায় তারা ব্যর্থ হ'ল তাদের ব্যর্থতার কারণ কি কি, তাদের সাফল্যইবা কতটুকু। এইভাবে আত্ম-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে তারা নিজেরাই নিজেদের কাজের মূল্যায়ন করবে।

সপ্তম ও সর্বশেষ স্তর হ'ল **সম্পাদিত কর্মের পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধকরণ**। এই কাজের বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। এই বিবরণ হ'ল প্রকৃতপক্ষে অর্জিত অভিজ্ঞতার ফসল। যদি বিবরণ সংরক্ষণের ব্যবস্থা না করা হয় তবে, অর্জিত অভিজ্ঞতা হারিয়ে যায় বিস্মৃতির অতল গর্ভে। ফলে ক্রমান্বয়ে সংরক্ষিত এইসব বিবরণ বিদ্যালয়ের ইতিহাস রচনায় সাহায্য করে, বর্ষে বর্ষে নবাগত ছাত্রদলকে নতুন নতুন কর্মপ্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করে।

।। প্রকল্প পদ্ধতির সুবিধা ।।

প্রথমতঃ এই পদ্ধতি হ'ল **মনোবিজ্ঞান সম্মত শিখন-প্রণালী**। এই পদ্ধতির সাহায্যে শিক্ষার্থীদের যে জ্ঞান অর্জিত হয় তা হয় দীর্ঘস্থায়ী।

দ্বিতীয়তঃ এই পদ্ধতি **শিক্ষার্থীর সুপ্ত সৃজনশীল সামর্থ্যকে উৎসাহিত করে**। এই পদ্ধতিতে পুঁথিগত জ্ঞানটাই বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল পুঁথিগত জ্ঞানকে বাস্তব প্রয়োগের মধ্য দিয়ে যাচাই করা। এটা এই পদ্ধতির বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবদান।

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতি **শিক্ষার্থীর সামাজিক সত্বার বিকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করে**। দলবদ্ধ হয়ে কাজ করার মধ্য দিয়ে এই সত্বার বিকাশ সহজ হয়ে ওঠে।

শিক্ষকের সুবিধা

চতুর্থতঃ শিক্ষকের কাছেও এই পদ্ধতির উপযোগিতা অপরিসীম। খুব **নিরাসক্ত ভাবে দূর থেকে তিনি তাঁর প্রতিটি ছাত্রকে নিবিষ্ট হয়ে লক্ষ্য করতে পারেন**, প্রত্যেকের সামর্থ-অসামর্থ সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। তাঁর এই জানা পরবর্তী কার্যক্রমে তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

আদর্শ মূল্যায়ন পদ্ধতি

পঞ্চমতঃ এই পদ্ধতিতে মূল্যায়নের যে ব্যবস্থা তা সত্যি সত্যিই আদর্শ স্থানীয়। শিক্ষার্থীগণ নিজেদের কাজের মূল্যায়ন নিজেরাই করবে এরচেয়ে আদর্শ ব্যবস্থা আর কি হতে পারে? শিক্ষার্থীগণ নিজেদের সাফল্যে নিজেরাই যেমন সুখানুভব করবে তেমনি নিজেরাই নিজেদের ত্রুটি আবিষ্কার করে তা সংশোধনে উদ্যোগী হবে।

॥ প্রকল্প পদ্ধতির অসুবিধা ॥

প্রথমতঃ প্রকল্প পদ্ধতিতে যেন কেমন একপেশে দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে। এমনটা হতেই পারে যে শিক্ষার্থীগণ ঐতিহাসিক স্থান এমন করে মোগল স্থাপত্য সম্পর্কে সূক্ষ্ম জ্ঞান অর্জন করলো, অথচ তারা মোগল বংশের অন্যান্য দিক সম্পর্কে অনবহিতই থেকে গেল।

সামগ্রিক দৃষ্টি বিকাশে বাধা

দ্বিতীয়তঃ শিক্ষার উচ্চতর পর্যায়ে এই পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষাদান সম্ভব কি না সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কেন না এই স্তরে বিষয়গত জ্ঞান যতটা বিমূর্ত ও জটিল রূপ ধারণ করে সেক্ষেত্রে প্রকল্প পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নাও হতে পারে।

তৃতীয়তঃ এই পদ্ধতির সার্থক রূপায়নের জন্য যে ধরনের যোগ্য ও বিশেষ শিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন তেমন শিক্ষক সর্বদাই সহজলভ্য নয়।

যাই হোক আসল কথা হ'ল, কর্মনিষ্ঠা। তা থাকলে যে কোন প্রতিবন্ধকতাই কখনো বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

[নয়] ॥ সমস্যা পদ্ধতি ॥
॥ Problem Method ॥

ইতিহাস শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যা পদ্ধতির একটি নিজস্ব আবেদন রয়েছে। কারণ ইতিহাস বিষয়টিই একটি সমস্যা সংকুল বিষয়। ঐতিহাসিকেরা যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করেছেন তা প্রমাণ করা অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু তাঁরা সমস্যা সমাধানে যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন তার সঙ্গে পরিচয় থাকলে ইতিহাসের বিভিন্ন গতি প্রকৃতি আমরাও অনুধাবন করতে পারি। এখানেই সমস্যা পদ্ধতির নিজস্ব আবেদন।

একটি স্বতন্ত্র পদ্ধতি হিসেবে সমস্যা পদ্ধতি হ'ল নতুন তথ্য আবিষ্কারের এক কৌশল। এই পদ্ধতি সমস্যা নিরসনকামী এক সাধারণ প্রক্রিয়া নয়, বরং এই পদ্ধতি এমন এক দূরদৃষ্টি সম্পন্ন মানসিক প্রক্রিয়ার সহায়ক যে, "it is learning to utilise conceptually adequate modes of thought, it is learning the art of predictive reasoning, of manipulating knowledge to make it fit new tasks."

সংজ্ঞা

কিন্তু তাই বলে সমস্যা পদ্ধতি এবং প্রকল্প পদ্ধতি একই পংক্তিভুক্ত নয়। উভয় পদ্ধতির অন্তর্নিহিত পার্থক্য নির্দেশ করে আর্থার বিনিং ও ডেভিড বিনিং বলেছেন, "The problem method differs from the project in that the emphasis in it is on the mental solution reached rather than on a practical accomplishment. Project method demands a practical accomplishment in a real situation and the problem method emphasises the mental conclusion that is drawn."

সমস্যা ও প্রকল্প পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য

অর্থাৎ সমস্যা পদ্ধতি মানসিক চিন্তা-চেতনা ও ক্রিয়াশীলতার উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করে।

॥ সমস্যা পদ্ধতির প্রয়োগ ॥

পরিবেশ রচনা

প্রকল্প পদ্ধতির মত সমস্যা পদ্ধতিতেও **উপযুক্ত পরিবেশ রচনার প্রয়োজন রয়েছে।** যথোচিত পরিবেশে শিক্ষক এমন সুকৌশলে প্রসঙ্গটি উত্থাপন করবেন যে শিক্ষার্থীগণ স্বতঃপ্রণোদিত হবে সেই প্রসঙ্গের অন্তর্নিহিত সমস্যাটিকে অনুসন্ধান করতে।

তথ্য সংগ্রহ

সমস্যার অনুসন্ধান শেষ হ লে পরবর্তী স্তরে **শিক্ষার্থীগণ সেই সমস্যার সমাধান কল্পে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে।** তারপর তথ্যগুলো নিয়ে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার ও বিবেচনা করবে এমন ভাবে যেন তাদের বিচার-বিবেচনা সমস্যা সমাধানের সহায়ক হয়।

এরপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীগণ তাদের **সমস্যার কয়েকটি সম্ভাব্য সমাধান অন্বেষণে প্রবৃত্ত হবে।**

এইবার তারা সেইসব সম্ভাব্য সমাধানের যৌক্তিকতা ও যথার্থতা বিচার করবে নানান দৃষ্টিকোণ থেকে। এক্ষেত্রে এমনও হ'তে পারে যে তারা তাদের সম্ভাব্য সমাধানে তৃপ্ত না হয়ে নতুন সমাধান অনুসন্ধানে তৎপর হবে।

এই প্রক্রিয়াতেই তারা সঠিক সমাধানটি খুঁজে পাবে। কিন্তু সঠিক সমাধানটি খুঁজে পাবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাজ হবে **সেই সমাধানটিকে যুক্তি-তর্কের ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করার।**

সর্বশেষ স্তরে তারা তাদের সমগ্র কার্যাবলীকে লিপিবদ্ধ করবে।

॥ সমস্যা নির্বাচনের পদ্ধতি ॥

সমস্যা পদ্ধতিতে প্রকৃত সমস্যা নির্বাচনই একটি দুরূহ কাজ। কাজটি বহুলাংশে প্রয়োগ কলা-কৌশল নির্ভর। এ সম্পর্কে কয়েকটি নীতি নির্দেশ করা যেতে পারে।

প্রথমতঃ সমস্যাটি হবে বৌদ্ধিক দিক থেকে শিক্ষার্থীর কাছে একটি চ্যালেঞ্জের মত। সমস্যাটি শিক্ষার্থীর বুদ্ধিবৃত্তিকে এমন ভাবে উদ্দীপিত করবে যে সে যেন সমস্যাটিকে কার্য-কারণ সূত্রে যাচাই করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ সমস্যাটির সমাধান করবার মত প্রয়োজনীয় উপাদান যেন সহজ লভ্য হয়।

তৃতীয়তঃ সমস্যাটি শিক্ষার্থীর কৌতূহলকে এমনভাবে উদ্বুদ্ধ করবে যে শিক্ষার্থীর কৌতূহল কেবল ঐ সমস্যার সমাধান করেই তৃপ্ত হবে না, বরং আরও গভীর ও ব্যাপক সমস্যা সমাধানে তাকে উৎসাহিত করবে।

॥ সমস্যা পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয় তার প্রভাব তার সমগ্র জীবনে সুদূর প্রসারী। সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে যে যে প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'তে হয় তার ধারণাগত, বুদ্ধিগত ও আচরণগত পরিবর্তন সাধনে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে।

দ্বিতীয়তঃ সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীর যুক্তিবাদী চিন্তাশক্তির বিকাশে সহায়তা করে। তথ্য বহুলতার মধ্য থেকে সত্যটিকে যাচাই করে আবিষ্কার করার ক্ষমতা শিক্ষার্থী অর্জন করে।

তৃতীয়তঃ সমস্যা পদ্ধতি শিক্ষার্থীকে সকল সংকীর্ণতা পরিহার করে তাকে সহনশীল করে তোলে। তারমধ্যে স্বনির্ভরতার প্রত্যয়বোধ জাগ্রত হয়।

চতুর্থতঃ এই পদ্ধতি শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে। এখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের আরোপিত শাসন-ভার থেকে অব্যাহতি পেয়ে স্বনির্ভর হবার সুযোগ পায়। শিক্ষকও অযথা পীড়নের পরিবর্তে শিক্ষার্থীর নির্দেশক হিসেবে আপন দায়িত্ব পালন করেন। কোন বাধ্যবাধকতা নেই, অথচ এক সহযোগিতার মনোভাব পরস্পরকে নিবিড় সান্নিধ্যে আসতে সাহায্য করে।

॥ সমস্যা পদ্ধতির অসুবিধা ॥

প্রথমতঃ উপযুক্ত সমস্যা নির্বাচনই এক সমস্যা। কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে যুক্তির চেয়ে আবেগই প্রাধান্য পায়।

দ্বিতীয়তঃ সমস্যা পদ্ধতি এমন স্তরে পৌঁছে যেতে পারে যেখানে এই পদ্ধতি কক্ষচ্যুত হয়ে আলোচনা পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হবার আশঙ্কা থাকে।

যাই হোক, সমস্যা পদ্ধতি কেবলমাত্র একটি শিক্ষাদান পদ্ধতিই নয়, এই পদ্ধতিতে আমরা ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচন করতে পারি এবং তাকে সংগঠিতও করতে পারি।

[দশ] ॥ একক পদ্ধতি ॥
॥ United Method ॥

একক পদ্ধতি একটি সর্বাধুনিক পদ্ধতি। সমস্যা পদ্ধতির মত এই পদ্ধতিও কেবলমাত্র শ্রেণী-শিক্ষণের ক্ষেত্রেই নয়, ইতিহাসের বিষয়বস্তু নির্বাচনেও যথেষ্ট সাহায্যকারী। ১৯২৬ সাল মরিসন সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রস্তাব করেন।

পদ্ধতির মূলকথা

একক পদ্ধতিতে একটি মূল বক্তব্যকে একক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তারপর সেই বক্তব্যকে কেন্দ্র করে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করা হয়। যেমন জাতীয়তাবোধ ও আন্তর্জাতিক চেতনা পরস্পর বিরোধী নয়—এটি হ'ল একটি একক। এখন এই এককটিকে ঘিরে পক্ষে বা বিপক্ষে ইতিহাসের বিশাল ও বিস্তৃত ক্ষেত্র থেকে তথ্য সংগৃহীত হবে। তারপর সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে।

॥ একক পদ্ধতির প্রয়োগ বিধি ॥

প্রথমে **একটি একক নির্বাচন করতে হবে এবং ঐ একক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করে তুলতে হবে।** এই স্তরে লক্ষ্যণীয় হ'ল এককটি যেন শিক্ষার্থীদের বয়স বুদ্ধি ও মানসিক স্তরের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে।

তারপর এককটির উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে হবে।

এরপর এককটিকে শিক্ষার্থীদের অনুধাবনযোগ্য করে উপস্থাপন করতে হবে এবং তাদের কি কি কাজ করতে হবে সে সম্পর্কে পরিষ্কার নির্দেশ দিতে হবে।

॥ একক পদ্ধতি ও শিক্ষকের ভূমিকা ॥

একক পদ্ধতিতে শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি হার্বার্টের পঞ্চ-সোপানের নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত।

(১) অনুসন্ধান

এই পঞ্চসোপানের প্রথম সোপান হ'ল **অনুসন্ধান** বা **exploration.** এই স্তরে শিক্ষক কয়েকটি অভীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা করবেন এবং এই পূর্বজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই একক নির্বাচন করবেন।

(২) উপস্থাপন

দ্বিতীয় সোপান হ'ল **উপস্থাপন** বা **presentation.** এবার শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বুঝাবার মত করে সমগ্র এককটি ব্যাখ্যা করবেন, এবং তারা ঠিকমত বিষয়টি বুঝলো কি না তা নৈর্বক্তিক প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষক জেনে নেবেন। সঙ্গে সঙ্গে 'guide sheet'-এ শিক্ষার্থীদের কর্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেবেন।

তৃতীয় সোপান হ'ল **আয়ত্তীকরণ** বা **assimilation.** এবার শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের নির্দেশানুসারে এককটি সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করবে। এ কাজ শিক্ষার্থীগণ ব্যক্তিগত অথবা যৌথভাবে সম্পন্ন করবে।

চতুর্থ সোপান হ'ল **সমন্বয় সাধন** বা **organisation.** এই স্তরে সংগৃহীত তথ্যাবলী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে এবং তথ্যাবলী যুক্তি পরম্পরায় বিন্যস্ত করা হবে।

পঞ্চম সোপান হ'ল **পুনরালোচনা** বা **recitation.** শেষ স্তরে শিক্ষার্থীগণ একত্রিত হয়ে পরস্পরের অভিজ্ঞতা ও অভিমত নিয়ে আলোচনা।

॥ সমালোচনা ॥

একক পদ্ধতি প্রয়োগের সবচেয়ে বড় বিঘ্ন হ'ল, **এখানে একটি স্থিরীকৃত সিদ্ধান্তকে সামনে রেখে অগ্রসর হতে হয়।** স্বাভাবিক কারণেই দেখা যায় শিক্ষার্থীগণ ঐ সিদ্ধান্তকেই স্বীকার করে তথ্য চয়ন করে, সিদ্ধান্তকে অগ্রাহ্য করবার মত মানসিক চ্যালেঞ্জ নিয়ে নয়।

তাছাড়া একক পদ্ধতি **ইতিহাসের ধারাবাহিকতা** বজায় রেখে সমগ্র পাঠ্যক্রম অনুসরণ করা সম্ভব নয়। এটাও একটি বড় প্রতিবন্ধক।

শিক্ষকের প্রাধান্য

সর্বোপরি **এই পদ্ধতিতে শিক্ষকের প্রাধান্য বড় বেশী স্বীকৃত**। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষক সবকিছুই স্থির করে দেন, শিক্ষার্থীদের কর্তব্য শুধু শিক্ষক-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করে অগ্রসর হওয়া। ফলে শিক্ষার্থীর স্বকীয় সত্বা বিকশিত হবার সুযোগ এখানে একান্তভাবে সীমিত।

[এগার] ॥ নাটকীয় পদ্ধতি ॥
॥ Dramatic Method ॥

ইতিহাসকে জীবন্ত করার জটিলতা

ইতিহাস তো বাস্তব অর্থে মৃত দর্শন ও স্পর্শানুভবের উর্ধ্বে। অথচ সেই মৃতকে নিয়ে ঐতিহাসিকের যত কর্মতৎপরতা এবং ইতিহাস শিক্ষকের যত চিত্তচাঞ্চল্য। একদিক থেকে ঐতিহাসিক অপেক্ষা ইতিহাস শিক্ষকের ভূমিকা জটিল এবং সমস্যা-ক্লিষ্ট। **তার মূল সমস্যাটি হ'ল মৃত ইতিহাসকে শ্রেণীকক্ষে প্রাণচঞ্চল করে তোলা।** সমস্যাটির গভীরতা অনুভব করেই স্টিফেন্স বলেছেন, "It is difficult to convey to a reader an information of a time in which one has not lived ; it is more—it is impossible. জন্‌সনও এই কথারই প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "The teacher must, nonetheless, like the historian attempt almost impossible." এই অসম্ভবই হ'ল ইতিহাসকে জীবন্ত করা। ভি. ডি. ঘাটেও একই সুরে বলেছেন, "The modern world has changed so much and has so completely broken away from its past that it is extremely difficult for children to visualise and understand the past."

কিন্তু কাজটি খুব অসম্ভব বা কঠিন বলে আমাদের পিছিয়ে গেলে চলবে না। বরং আমাদের নিরবচ্ছিন্ন প্রয়াস চালিয়ে যেতেই হবে যাতে আমরা ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারি। জনসন্ তাই—বলেছেন, "The fundamental condition of making history effective in the class room is to invest the past with an air of reality, history should be made vivid and alive.

নাটক ও শিশুমন

এই যে ইতিহাসকে জীবন্ত করার অন্তহীন প্রয়াস তার অন্যতম ফলশ্রুতি হ'ল ইতিহাসকে নাটকে রূপান্তরিত করা। শিশুর মানসিকতা তো নিত্য নতুন অভিজ্ঞতার উত্তেজনায় উত্তাল। স্বভাবতঃই সে আবেগপ্রধান। যা সে চোখে দেখে, কান দিয়ে শোনে অনায়াসেই তা তার ভিতরে গিয়ে মনের দরজায় করাঘাত করতে থাকে। **নাটক হ'ল এমন একটি মাধ্যম যা শিশুর দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়কে তৃপ্ত করে মনের গভীরকে স্পর্শ**

করে। নাটকের ঘটনার সঙ্গে পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে এক অপূর্ব একাত্মতাবোধে শিশু নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই পণ্ডিতেরা বলেছেন, যদি ইতিহাসকে নাটকের মাধ্যমে পরিবেশন করা যায় তবে অতীত বর্তমানে সশরীরে এসে উপস্থিত হয়, ইতিহাস তখন আর মৃত নয়, সর্বতোভাবে প্রাণচঞ্চল জীবন্ত। এই কারণেই ঘাটে বলেছেন, "It is the emoticnal experience, the wider sympathies, a broader vision and a deeper and more accurate appreciation of the past which are the real values of this device."

॥ নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ ॥

প্রথমতঃ পূর্ণাঙ্গ নাটকাভিনয়ের মাধ্যমে ইতিহাস উপস্থাপন করা যেতে পারে। কিন্তু এই পূর্ণাঙ্গ অভিনয়ের ব্যবস্থা বৎসরে পাঁচ/ছয় বারের বেশী কখনো করা সম্ভব নয়। ফলে ইতিহাসের পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করার সুযোগ থাকে না। তাছাড়া সাধারণতঃ পূর্ণাঙ্গ নাটকগুলি ইতিহাস-আশ্রিত, সর্বাংশে ইতিহাস ভিত্তিক নয়। তাই সেখানে ইতিহাস বিকৃত হবার প্রবল সম্ভাবনা থাকে।

পূর্ণাঙ্গ নাটক

দ্বিতীয়তঃ পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিবর্তে মাঝে মাঝে একাংক নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমের প্রতি অধিকতর সুবিচার করা সম্ভব হয়।

তৃতীয়তঃ শিক্ষক নিজে নাটকীয় ভঙ্গিতে শ্রেণীকক্ষে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করতে পারেন। তবে এরজন্য শিক্ষককে পূর্বাহ্নেই যথেষ্ট প্রস্তুতি নিতে হয়।

চতুর্থতঃ কোন রকম প্রস্তুতি ছাড়াই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন অনুসারে শ্রেণীকক্ষেই অভিনয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এরজন্য কোন ব্যাপক প্রস্তুতি প্রয়োজন হয় না।

তবে নাটক যেভাবেই অভিনীত হোক না কেন সবক্ষেত্রেই শিক্ষকের ভূমিকা বিশেষ দায়িত্বপূর্ণ। তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে নাটকে যেন ইতিহাস বিকৃত না হয়, দৃশ্যপট রচনায় যেন সমসাময়িকতার প্রতিফলন ঘটে এবং অভিনেতাদের সাজ-পোষাকেও যেন অতীত মুখর হয়ে ওঠে।

॥ নাটকীয় পদ্ধতি সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কতা ॥

নাটকীয় পদ্ধতি যেমন ইতিহাসকে প্রাণবন্ত করে তোলে তেমনি এই পদ্ধতি প্রয়োগকালে আমাদের কয়েকটি সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে।

প্রথমতঃ যদিও মূলতঃ **শিক্ষকের নেতৃত্বেই** যাবতীয় প্রস্তুতি পর্ব নিয়ন্ত্রিত হবে তথাপি সেই নেতৃত্ব থাকবে যবনিকার অন্তরালে। নেতৃত্ব কখনো প্রতিবন্ধক হবে না। বরং শিক্ষার্থীর নিজস্ব সামর্থ প্রকাশের সহায়ক হবে।

দ্বিতীয়তঃ নাটকের **চরিত্র নির্বাচনে** যথেষ্ট সতর্ক হতে হবে। সত্যনিষ্ঠ ইতিহাসই যেন নাটকের মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট হয় এমনভাবে চরিত্র বাছাই করতে হবে।

তৃতীয়তঃ নাটকাভিনয়ই শেষ কথা নয়। অভিনয় শেষে যাচাই করে দেখতে হবে নাটকের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস বিবৃত হ'ল তা শিক্ষার্থীগণ অনুধাবন করতে পেরেছে কি না। **নাটক অভিনয়ই বড় কথা নয়, বড় কথা হ'ল ইতিহাসের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পরিচয় সাধন।**

॥ নাটকীয় পদ্ধতির সুবিধা ॥

প্রথমতঃ **নাটকাভিনয়ের আবেদন কেবল শিশুর কাছেই নয়, বয়স্ক মানুষের কাছেও সমান সক্রিয়।** এই ক্রিয়াশীলতার সুযোগে ইতিহাসের বিষয়-বস্তু অভিনয়ের মাধ্যমে ঘটনার পারম্পর্য ও কার্য-কারণ সম্পর্কের বন্ধনে বাস্তবায়িত হয়ে ওঠে। তাই নাটকের প্রভাব অভিনেতা ও দর্শক উভয়ের উপর সমান শক্তিশালী।

দ্বিতীয়তঃ নাটকীয় পদ্ধতির সবচেয়ে বড় সাফল্য হ'ল **অতীতকে শিক্ষার্থীর নিবিড় সান্নিধ্যে স্থাপন।** অভিনয় শিক্ষার্থীর সুখ-দুঃখকে অতীতের সুখ-দুঃখের সঙ্গে একাকার করে নয়। কোন্ অলক্ষ্যে যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সমস্ত ব্যবধান দূর হয়ে যায়।

তৃতীয়তঃ একটি নাটক অভিনয়ের জন্য শিক্ষার্থীদের যেভাবে সক্রিয় হতে হয় তা তাদের দেহ ও মনের পক্ষে খুবই উপযোগী। সুস্থ শারীরিক কর্ম ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয় সহযোগিতা সহমর্মিতা প্রভৃতি সুস্থ মানসিক গুণাবলী।

চতুর্থতঃ **শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পর্ক নিবিড় ও মধুর হয়ে ওঠে এই পদ্ধতির প্রয়োগ কালে।** স্বতঃস্ফূর্ত সম্পর্ক যা তাই ক্রমশঃ পল্লবিত হয় সবার মধ্যে সবার অগোচরে।

॥ নাটকীয় পদ্ধতির অসুবিধা ॥

প্রথমতঃ অভিনয় একটি শিল্প কলা কিন্তু ইতিহাস এক শ্রেণীর বিজ্ঞান। ফলে সর্বদাই আশঙ্কা থাকে উল্লেখযোগ্য শিল্প সৃষ্টির তাগিদে কল্পনাকে বল্গাহীন হতে দিয়ে ইতিহাসের বিজ্ঞান-স্বরূপ না বিকৃত হয়ে যায়। তাই সতর্ক না হলে নাটকীয় পদ্ধতি ইতিহাস শিক্ষার অনুকূল মানসিকতাকে ধ্বংস করতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ **ইতিহাসকে অবিকৃত রেখে তৈরী নাটক সচরাচর পাওয়া যায় না।** ফলে এই পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হলে ইতিহাসের শিক্ষককে নাটক রচনা করে নিতে হবে। কিন্তু শিক্ষকের এই সামর্থ্য নাও থাকতে পারে।

তৃতীয়তঃ **ইতিহাসের যে দীর্ঘ পাঠ্যক্রম অধুনা প্রচলিত তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে নাটকীয় পদ্ধতির প্রয়োগ সম্ভব নয়।** কেননা এই পদ্ধতিতে শিক্ষার অগ্রগতির ধারা অত্যন্ত শ্লথ।

যাই হোক, ইতিহাসকে সজীব করে তুলতে নাটকীয় পদ্ধতির অবদানকে যেহেতু অস্বীকার করা যায় না সেইহেতু এই পদ্ধতির উপযোগিতা নিশ্চয়ই রয়েছে। তবে

এর প্রয়োগ হবে একটি সীমাবদ্ধ পরিধি পর্যন্ত। **সেই পরিধি হ'ল শিক্ষার্থীর ভেতর একটি ঐতিহাসিক মনকে জাগ্রত করা।** সুতরাং এই প্রয়োজন মেটাতে নাটকীয় পদ্ধতি আমরা প্রয়োগ করব, এর বেশী নয়।

॥ স্থানিয় ইতিহাস ও তার ব্যবহার ॥

॥ Local History & its uses ॥

ইতিহাস পাঠ থেকে রসানুভব অত্যন্ত কঠিন। ইতিহাসের শিক্ষা ও পদ্ধতি সুকুমার মতি বালক-বালিকার পক্ষে জটিল, এ কথা ঠিক। তবুও বিদ্যালয় স্তরে আমরা চাই ইতিহাস নিয়ে চর্চা হোক্‌, শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক চেতনা জাগ্রত হোক্‌, ইতিহাসের শিক্ষায় নিজেকে দীক্ষিত করতে শিক্ষার্থী উৎসাহী হোক্‌।

এর সবই হ'তে পারে কেবল শিক্ষার্থীর উপর সকল ভার চাপিয়ে দিয়ে। কিন্তু তা হবে শিক্ষার্থীর মনস্তত্ত্ব বিরোধী। তাহলে কি উপায় আছে যাতে শিক্ষার্থী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে ইতিহাস সম্পর্কে আগ্রহশীল হতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরই হ'ল স্থানীয় ইতিহাস পাঠ ও তা নিয়ে পর্যালোচনা।

কিন্তু স্থানীয় ইতিহাস বলতে আমরা কি বুঝি? স্থানীয় ইতিহাস বলতে বুঝায় শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিকতার ইতিহাস, যে পরিমণ্ডলে সে বসবাস করে তার ইতিহাস। "Local history is associated with a child's immediate cultural environments." কিন্তু তাই বলে ওর গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। পণ্ডিতেরা বলেছেন, "History remains a chronicle of far off and distant events outside students' life and immediate experience if local history is not included within the scope of history syllabus."

স্থানীয় ইতিহাসের স্বরূপ

॥ স্থানীয় ইতিহাসের ব্যবহার ॥

বৃহত্তর ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় সাধন, বৃহত্তর ইতিহাস রচনাশৈলী ও প্রকৃত ঐতিহাসিক পদ্ধতির সঙ্গে অবহিত হওয়া ইতিহাস শিক্ষার্থীর পক্ষে জরুরী। এই জরুরী প্রয়োজনগুলি মেটানো যেতে পারে যদি যথার্থভাবে স্থানীয় ইতিহাস বিদ্যালয়ে পঠন-পাঠনকালে ব্যবহার করা যায়। এই ব্যবহার কেমনভাবে হতে পারে?

ইতিহাসের শিক্ষক স্থানীয় ইতিহাস চর্চার জন্য একটি ঐতিহাসিক নিদর্শন সমৃদ্ধ স্থান নির্বাচন করবেন। তারপর শিক্ষার্থীদের নিয়ে এইস্থানে পরিভ্রমণে তিনি যাবেন এবং সেখানকার নিদর্শন থেকে স্থানীয় ঐতিহাসকে খুঁজে বের করার কাজে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রবৃত্ত হবেন। প্রকৃতপক্ষে, পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে স্থানীয় ইতিহাস পর্যালোচনা সম্ভব নয়। এমন কি স্থানীয় ইতিহাসের উপর লিখিত পুস্তক সর্বদা এবং সর্বত্র লভ্যও নয়। **তাই স্থানীয়**

প্রয়োগ বিধি

ইতিহাস চর্চার জন্য ভ্রমণ, পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনার প্রয়োজন অপরিহার্য।

নিজেদের পরিমণ্ডলের ইতিহাস আবিষ্কার করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীগণ যে আনন্দ অনুভব করবে, যে তৃপ্তিবোধ তাদের আপ্লুত করবে তাই পরবর্তীকালে তাদের বৃহত্তর ইতিহাসের উৎস সন্ধানে উদ্বুদ্ধ করবে। এখানেই স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সবচেয়ে বড় স্বার্থকতা।

॥ ইতিহাস শিক্ষণে নোট দান প্রথা ॥

॥ Note giving in History ॥

প্রায়শঃই একটি অভিযোগ শোনা যায়, ইতিহাস শিক্ষণে নোট দান প্রথা প্রকারান্তরে ইতিহাস চর্চাকে ধ্বংস করারই নামান্তর। কেননা এই প্রথায় শিক্ষার্থীগণ যেহেতু তৈরী করা বিষয়বস্তু হাতের কাছে পেয়ে যায় সেইহেতু তারা নিজস্ব উদ্যোগে নতুন পাঠ্যাভ্যাসে উদ্যোগী হয় না। ফলে সাধারণ পাঠ চর্চার ফলে তাদের যেসব মানসিক গুণাবলীর বিকাশ সম্ভব ছিল তা বাধা প্রাপ্ত হয়। আত্মপ্রত্যয়ের পরিবর্তে ক্রমশঃ সে অধিকতর পরনির্ভরশীল হয়ে যায়। নিজস্ব বিচার ও বিবেচনাবোধকে উদ্বুদ্ধ না করে অপরের মতামতকেই মাথা পেতে গ্রহণ করতে শেখে। নির্বোধের মত অন্ধভাবে মুখস্থ করার দিকেই তার প্রবণতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ইতিহাস শিক্ষায় নোট দান প্রথা অনতি বিলম্বে বাতিল করা উচিত।

নোট দান প্রথার সমালোচনা

নিঃসন্দেহে এইসব সমালোচনার পক্ষে বক্তব্য অত্যন্ত জোরদার। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একথাও সত্যি এই প্রথাটি, তা সে যতই ত্রুটিপূর্ণ হোক, বহুকাল ধরেই প্রচলিত। তাই বহুকাল ধরে প্রচলিত একটি প্রথাকে চিরকালের জন্য অগ্রাহ্য করে দেবার পূর্বে একবার অনুসন্ধান করে দেখা কর্তব্য এমন একটি প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল কেন।

॥ নোট দানের কারণ ॥

কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে প্রথমেই দেখা যায় আদর্শ পাঠ্য পুস্তকের অভাবই এমন প্রথা প্রবর্তনের প্রধান কারণ। সাধারণতঃ পাঠ্য পুস্তক যাঁরা রচনা করেন তাঁদের অধিকাংশই আদৌ বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন। তাঁরা বিজ্ঞজন হতে পারেন, কিন্তু অপরিণত শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন জানবেন কি করে? এ ছাড়া পাঠ্য বিষয়ের সকল প্রসঙ্গের প্রতি সমান গুরুত্বও আরোপ করা হয় না পাঠ্য পুস্তকে। ফলে কোন কোন প্রসঙ্গ মাত্রাতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়ে যায়। কোন কোন প্রসঙ্গ থাকে হতাশাজনক ভাবে অবহেলিত।

উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকের অভাব

দ্বিতীয়তঃ **বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উপর থাকে অতিরিক্ত নৈমিত্তিক কাজের চাপ।** তাদের নিয়মিত গড়ে পঁয়ত্রিশটি করে ক্লাশ নিতে হয়। এমন অবস্থায় তাদের পক্ষে প্রতিটি ক্লাশের জন্য যথোচিত প্রস্তুতি নেওয়া কোনমতেই সম্ভব হয় না। এর সঙ্গে রয়েছে আর একটি অসুবিধে। সাধারণতঃ বিদ্যালয়ে ইতিহাসের জন্য নির্ধারিত থাকে দিনের শেষের দিকের ক্লাশগুলো, যখন অবসন্ন শিক্ষার্থী, অবসন্ন শিক্ষকও। শিক্ষার্থী তখন আর মানসিক দিক থেকে নতুন কিছু গ্রহণ করতে চায় না, শিক্ষকের পক্ষেও আন্তরিকভাবে নতুন তথ্যের অবতারণা সম্ভব হয় না। এমন অবস্থায় প্রতিষেধক হিসেবে শিক্ষক নোট দান প্রথাকেই গ্রহণ করতে বাধ্য হন।

শিক্ষকের অত্যধিক কাজের চাপ

তৃতীয়তঃ বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের যে দীর্ঘ পাঠ্যক্রম নির্ধারিত আছে সেখানে ইতিহাসের প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে শিক্ষাদান কার্য পরিচালনা করলে কখনোই সেই পাঠ্যক্রম সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় না। তাই শিক্ষককে সংক্ষিপ্ত কোন পন্থা খুঁজে বার করতেই হয়। নোট দান প্রথা এমনই একটি সংক্ষিপ্ত পন্থা।

চতুর্থতঃ অস্বীকার করার উপায় নেই এখনো আমাদের দেশে শিক্ষার সার্থকতার পরিমাপক হ'ল বাহ্যিক পরিক্ষায় শিক্ষার্থীদের সাফল্যের হার। বিশেষ করে শিক্ষক কখনো এই নিরেট সত্যটি বিস্মৃত হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের সমাজও একজন শিক্ষকের যোগ্যতা পরিমাপ করে ঐ পরীক্ষার মাধ্যমেই। সুতরাং যেখানে শিক্ষার সাফল্য ও শিক্ষকের যোগ্যতার প্রশ্ন পরীক্ষার ফলাফলের সঙ্গে এমন গভীরভাবে জড়িত সেখানে শিক্ষককে এমন সূত্র উদ্ভাবন করতেই হয় যাতে অল্প আয়াসে বৃহৎ সাফল্য লাভ সম্ভব হয়। নোট দান প্রথা হ'ল এমন একটি সহজ সূত্র।

পরীক্ষা ব্যবস্থার উপর অত্যধিক গুরুত্ব

পঞ্চমতঃ একজন সত্যিকারের আদর্শ ইতিহাস শিক্ষক হতে হলে বহুবিধ গুণাবলী অর্জন করতে হয়। এবং এ ধরনের শিক্ষকও সহজলভ্য নয়। বাস্তব অবস্থা হ'ল, শ্রেণী কক্ষে প্রবেশ করে এইসব শিক্ষক নিশ্চয়ই তাঁর নিজের দীনতাকে উপলব্ধি করেন। তখন নিজের দৈন্যকে আবৃত করে রাখতে তাঁকে অন্য এক আচ্ছাদন খুঁজতে হয়। নোট দান প্রথা হ'ল এমনি এক আচ্ছাদন

॥ নোট দানের পদ্ধতি ॥

কখনো কখনো দেখা যায়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো আলোচিত হ'বার পর আলোচ্য বিষয়গুলির উপর **বিস্তারিত নোট** দেওয়া হয়। অবশ্য আলোচনা ছাড়াও নোট দান প্রথা প্রচলিত।

আবার কখনো আলোচ্য বিষয়টির উপর বিস্তারিত নোট দানের পরিবর্তে **সংক্ষিপ্তসার** লিখিয়ে দেওয়া হয়।

কিন্তু ব্যাপকভাবে যে ব্যবস্থা প্রচলিত তা হ'ল প্রথমে বাহ্যিক পরীক্ষার দৃষ্টিকোণ থেকে কতকগুলি প্রশ্ন নির্বাচন করা হয়। তারপর সেই **প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিয়ে** দেওয়া হয়।

নোট তা সে যেভাবেই দেওয়া হোক না কেন, ইতিহাস চর্চার পক্ষে যে আদৌ উপযোগী নয় তা পরিষ্কার হয় নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে :

"The dictated notes cannot develop or train in the pupil any of the vertical or selection power, the encouragement of which is one of the main objects of the history teaching."

॥ নোট দান প্রথা বাতিল করার উপায় ॥

বহু সমালোচিত নোট দান প্রথাকে বাতিল করতে হলে **প্রথম প্রয়োজন উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক নির্বাচন**। ভাল পাঠ্য পুস্তক নোট দানের অনেক প্রয়োজনকে মিটিয়ে দিতে পারে।

শিক্ষকের কর্তব্য

শিক্ষক বিষয়-বস্তু আলোচনা শেষে একটি সংক্ষিপ্তসার লিখিয়ে দেবেন। এই সংক্ষিপ্তসার শিক্ষার্থীর পরীক্ষা প্রস্তুতিতেও বিশেষভাবে সাহায্যকারী হবে। তবে সংক্ষিপ্তসার লেখার সময় শিক্ষককে কয়েকটি বিষয়ে সতর্ক হতে হবে। তা হ'ল, সংক্ষিপ্তসারে আলোচনার সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ যেন উল্লিখিত হয়। তারপর তিনি শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন তারা যেন বাড়ীতে বসে সংক্ষিপ্তসারটিকে সম্প্রসারিত করে প্রস্তুত করে নিয়ে আসে।'

বিশ্লেষণমুখী গৃহকাজ

শ্রেণীকক্ষে সম্ভব না হলেও শিক্ষক তাঁর শিক্ষার্থীদের **এমন গৃহকাজ দেবেন যেন তাতে শিক্ষার্থীদের বিশ্লেষণী বিচার শক্তি উদ্দীপিত হয়**। প্রকৃতপক্ষে বিদ্যালয়ের প্রত্যেক স্তরেই এ ধরনের কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। সঙ্গে সঙ্গে এমন ব্যবস্থাও আমাদের গ্রহণ করা উচিত যাতে পুস্তক-প্রকাশকগণ সাহায্যকারী পুস্তক প্রকাশনার অবাধ স্বাধীনতা না পান। আমাদের দেশে শিক্ষার মানের অবনতিতে এ ধরনের পুস্তক প্রকাশের পরিণতি যে কি পরিমানে বিষময় তা আমাদের অনুধাবন করবার সময় এসে গিয়েছে। শিক্ষার উন্নয়নে সামগ্রিক প্রয়াস চালাতে হলে কোন সামান্য ছিদ্রও উপেক্ষিত হওয়া উচিত হবে না।

শিক্ষার্থী কর্তৃক নোট তৈরী

প্রয়োজন বোধে শিক্ষার্থীগণই নোট তৈরী করতে পারে। বরং শিক্ষার্থীদের এই কাজকে উৎসাহিতই করা উচিত। কারণ **এ কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর যা কিছু নিজস্ব তার পরিচয় দেবার অবকাশ থাকে**। তার বিচার ক্ষমতা, তার বিশ্লেষণী ক্ষমতা, তার ভাব প্রকাশের ক্ষমতা, তার ভাষা—প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হ'ল তা পরিমাপ করা যায় তার তৈরী নোট থেকে। সুতরাং শিক্ষার্থীদের নোট তৈরী করার প্রবণতাকে বিঘ্নিত না করে উৎসাহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইতিহাসের বাস্তবায়ণ

॥ বিষয়-সংকেত ॥

ভূমিকা—বাস্তবায়ণের প্রয়োজন—উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতা—উপকরণের শ্রেণী বিভাগ—ইতিহাস কক্ষ-ইতিহাস গ্রন্থাগার—ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক—সমধর্মী পুস্তক পাঠ—অনুবন্ধ প্রণালী—অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক—ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ ॥

"The foundation of all learning, consists in representing clearly to the senses, sensible object so that they can be appreciated easily."

Comenius.

"The fundamental condition of making history effective in the class room is to invest the past with an air of reality......The most effective appeal to the sense of reality is, of course, through reality itself."

Johnson.

॥ ভূমিকা ॥

আমাদের চারপাশে এই যে বিশাল বিশ্ব, যেখানে অহরহ চলেছে সৃষ্টির অপূর্ব লীলা বৈচিত্র্য, আমাদের বিস্ময়ে আবিষ্ট করে। আমরা মেলে থাকি 'মুগ্ধ নয়ান', পেতে রাখি কান 'যোগ্য গান বিরচিব বলে।' এই যে দেখার মুগ্ধতা, শোনার আনন্দানুভব স্পর্শের তৃপ্তিবোধ, গন্ধের পবিত্র উপলব্ধি, স্বাদের রসবোধ—এ নিয়েই যুগ থেকে যুগান্তর বাণী ক্রমশঃ সমৃদ্ধ হচ্ছে আমাদের অভিজ্ঞতা। আর এই অভিজ্ঞতাকে সম্বল করেই আমরা চলি সমুখ পানে।

তাই শিক্ষাবিদগণ সুনিশ্চিত ভাবে বলেন প্রকৃত শিক্ষার স্বার্থে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের অনুভূতি হয় এমন ব্যবস্থাই গ্রহণীয়। এই ইন্দ্রিয়ানুভবকে আমরা যত বেশী সফল করে তুলতে পারবো আমাদের অভিজ্ঞতা হবে তত বেশী অর্থপূর্ণ, আমাদের অজ্ঞানতা হবে তত বেশী জ্ঞানের আলোয় আলোকিত।

এবং আমাদের শিক্ষা কখনো বাস্তব বর্জিত অতিপ্রাকৃত কিছু নয়। তাই নিরন্তর প্রয়াস চলেছে আরও কতভাবে শিক্ষায় আমরা বাস্তবতা প্রতিভাত করতে পারি।

কিন্তু যে বিষয় একদা ছিল সর্বাংশে বাস্তব, অথচ আজ অবাস্তব, প্রায় অলীক কল্পনার সামিল, সেখানে আমাদের করণীয় কি? যেমন ইতিহাস, আজ আমাদের

সম্মুখে দৃশ্য নয়, মূর্ত নয়। তাই বলে ইতিহাসকে তো অলৌকিক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিতে পারছি না। পারছি না বলেই নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টা চলেছে কেমন করে ইতিহাসকে বাস্তব করে তোলা যায়। কাজটি সহজ নয়, তবু যা কিছু দুঃসাধ্য তাকেই সাধ্যের সীমায় বেঁধে ফেলার মধ্যেই মানুষের তো সত্যিকারের পরিচয়।

ইতিহাসের বিশেষত্ব

॥ বাস্তবায়ণের প্রয়োজন ॥

॥ Need of aids ॥

ইতিহাস হ'ল বিমূর্ত জ্ঞানাশ্রয়ী যুক্তিবাদী বিষয়। যদি এই বিমূর্ত বিষয়কে আমরা মূর্ত করে তুলতে না পারি তা হলে ইতিহাস তো কখনো শিক্ষার্থীর ইন্দ্রিয়ানুভূতি জাগাতে পারবে না। তাই প্রয়োজন ইতিহাসকে বাস্তব করে তোলার। প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষার উপকরণের ব্যবহার।

শিক্ষার্থীদের মধ্যে যারা স্বল্পমেধা সম্পন্ন, পশ্চাদপদ তারা তাত্ত্বিক জ্ঞান গ্রহণে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

কিন্তু শিক্ষার উপকরণের সাহায্যে তাদেরও উচ্চতর জ্ঞানার্জনে উদ্বুদ্ধ করা যায়।

ইতিহাসকে বাস্তব করে তোলার বিভিন্ন উপকরণগুলি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণ সামর্থের বিকাশ সাধনে সাহায্য করা সম্ভব হয়।

ইতিহাস শিক্ষণে বক্তৃতাদানের প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু যেখানে বক্তৃতা যথেষ্ট নয় সেখানে শিক্ষার উপকরণ একমাত্র উপায় শূন্যতাকে পূর্ণ করে তুলতে।

এইসব প্রয়োজনকে অস্বীকার করার অর্থ "historical imagination of the pupils is not kindled and history teaching degenerates into a monotonous, dull and mechanical narration."

॥ উপকরণ ব্যবহারে সতর্কতা ॥

॥ Important points for the use of teaching aids ॥

ইতিহাস পাঠে উপকরণ ব্যবহারের প্রয়োজন যেমন রয়েছে তেমনি উপকরণ ব্যবহারে আমাদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজনও আছে।

প্রথমে লক্ষ্য রাখতে হবে উপকরণের ব্যবহার যেন কেবলমাত্র আলংকারিক প্রয়োজনে পাঠদান পদ্ধতির উপর আরোপিত না হয়। আলোচনার বিষয়-বস্তুর সঙ্গে উপকরণের ব্যবহার যদি মিলিয়ে দেওয়া না যায় তাহলে উপকরণ ব্যবহারের মৌল উদ্দেশ্যই হবে ব্যর্থ।

উপকরণগুলি যেন এমনভাবে নির্বাচিত হয় যাতে অতীতকে জীবন্ত করে তুলতে সেগুলি বিশেষ সহায়ক হয়। তাই বলে কেবল চিত্তাকর্ষক করতে হবে বলেই অতীতকে বিকৃত করা হবে না অথবা অতীতকে আতিশয্য দোষে দুষ্ট করা যাবে না।

উপকরণগুলি এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন সেগুলি শিক্ষার্থীর জ্ঞানের মধ্যবর্তী শূন্যতাকে পূর্ণ করে দিতে পারে।

উপকরণ ব্যবহারে কোনরকম অন্ধত্ব বা গোঁড়ামীকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। প্রয়োজনমত পাঠ-পরিকল্পনার যে কোন স্তরেই এই উপকরণের ব্যবহারে শিক্ষকের অবাধ স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

॥ উপকরণের শ্রেণী বিভাগ ॥
॥ Division of aids ॥

ইতিহাস শিক্ষণে প্রয়োজনীয় উপকরণগুলিকে আমরা তিন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি। যথা: **দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ** বা Visual aids, **শ্রবণ নির্ভর উপকরণ** বা Auditory aids এবং **শ্রবণ ও দর্শন নির্ভর** উপকরণ বা Audio-Visual aids.

॥ দৃষ্টি নির্ভর উপকরণ ॥
॥ Visual aids ॥

দৃষ্টি নির্ভর উপকরণের মধ্যে প্রথমেই আসে ব্ল্যাক বোর্ডের প্রসঙ্গ। কারণ ব্ল্যাক বোর্ডের সঙ্গে তুলনীয় আর কোন উপকরণ এত সুলভ বা সহজ লভ্য নয়। ইতিহাস পাঠদান কালে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাধারণ নক্সা, মানচিত্র চার্ট, সময়রেখা প্রভৃতি অঙ্কনে ব্ল্যাক বোর্ড বিশেষ সাহায্যকারী উপাদান। অবশ্য এরজন্য শিক্ষককে সামান্য অঙ্কন চর্চায় অভ্যস্ত হতে হবে। তবে শ্রেণীকক্ষে দাঁড়িয়ে এইসব অঙ্কন যে কতটা উদ্দীপনাময় তা স্পষ্ট করতে গিয়ে রেমণ্ট বলেছেন "Black-board drawing, sketches and maps are superior to finished productions at least in the early lessons. এ ছাড়া আলোচনা শেষে সংক্ষিপ্তসার লিখে দেবার জন্যে এবং আলোচনা চলাকালে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গগুলো লিখে দেবার প্রয়োজনে ব্ল্যাক-বোর্ড অপেক্ষা অধিকতর সাহায্যকারী উপকরণ সহজে মেলে না।

ব্ল্যাকবোর্ড ও তার ব্যবহার

মানচিত্র ইতিহাস শিক্ষণে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ। ঐতিহাসিক চেতনাকে স্বচ্ছ করতে হ'লে প্রয়োজন স্থান ও কাল সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা। যে কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় কোন একটি নির্দিষ্ট স্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে। **মানচিত্র হ'ল শিক্ষার্থীর স্থান-চেতনা জাগরণে একটি বিশেষ সাহায্যকারী উপকরণ।** মানচিত্রে সংঘটিত ঘটনাটির স্থান নির্দেশ করার মধ্য দিয়ে ইতিহাস অনেকখানি বাস্তবরূপ লাভ করে। তাই ইতিহাস শিক্ষণে মানচিত্র ব্যবহারের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে।

মানচিত্র

মানচিত্রের বহু প্রকার ভেদ হতে পারে। যেমন ঐতিহাসিক মানচিত্র। এগুলি বিভিন্ন রাজন্যবর্গ বা রাজবংশের উপর ভিত্তি করে অঙ্কিত হয়। এইসব মানচিত্রে

বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র, সন্ধি স্থাপনের স্থান কিংবা কোন পরিব্রাজক বা সৈন্যবাহিনীর যাত্রা পথ নির্দেশ করা যায়। তারপর হ'ল প্রাকৃতিক মানচিত্র যার সাহায্যে আমরা দেশের ভৌগোলিক গঠন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে পারি। এবং দেশের ভৌগোলিক গঠনের সঙ্গে ইতিহাসের সম্পর্ক যে অতি নিবিড় তাতো সবারই জানা। এ ছাড়া রয়েছে রাজনৈতিক মানচিত্র, অর্থ নৈতিক মানচিত্র প্রভৃতি।

মানচিত্রের প্রকার ভেদ

কিন্তু একটি ভাল মানচিত্রের কতকগুলি বৈশিষ্ট থাকা প্রয়োজন। যেমন মানচিত্রটি অবশ্যই নিখুঁত এবং যথাযথ হবে। প্রয়োজনের অতিরিক্ত তথ্য দিয়ে মানচিত্রটি তথ্যভারে ভারাক্রান্ত হবে না। মানচিত্রটির আয়তন যেন এমন হয় যাতে সবাই সহজে দেখতে পায়। মানচিত্রে ব্যবহৃত প্রতীক চিহ্ন এবং লেখা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া প্রয়োজন। যথেচ্ছ ব্যবহারের জন্য মজবুত করে মানচিত্রগুলি তৈরী করতে হবে।

মানচিত্রের বৈশিষ্ট

জনসন্ যথার্থই বলেছেন, "History has been made up by maps as well as recorded in maps."

মানচিত্রের পর আলোচনা করতে হয় **রেখাচিত্রের** (**Graph**) **কথা**। কারণ মানচিত্র যেমন ঐতিহাসিক স্থান সম্পর্কে ধারণা করতে সাহায্য করে তেমনি **রেখাচিত্র সময়জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করে।** বহু ধরনের রেখাচিত্রের মধ্যে Line Graph এবং Pictorial Graph ইতিহাস শিক্ষণে বিশেষ উপযোগী।

রেখাচিত্র

Line Graph লম্বভাবে বা সমান্তরাল ভাবে অঙ্কন করা যায়। প্রয়োজনমত বহু রং ব্যবহার করে রেখাচিত্রকে অধিকতর আকর্ষণীয় করে তোলা যায়। যখন সন-তারিখ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করার প্রয়োজন হয় তখন এই ধরনের রেখা-চিত্রের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী। অস্বীকার করার উপায় নেই —সময় রেখার মাধ্যমে বিচ্ছিন্ন ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে সময়-জ্ঞানের ভিত্তিতে আমরা গ্রথিত করতে পারি। ফলে ইতিহাস সম্পর্কে সামগ্রিক ধারণা বিকাশে বিশেষ সুবিধা হয়।

লাইন গ্রাফ

Pictorial Graph হ'ল চিত্রের মাধ্যমে সময় জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করা। কোন একটি ধারণাকে স্পষ্ট করে তোলার জন্য চিত্রের ব্যবহার করা হবে। যেমন আমরা যদি ভারতীয় ভাষার উদ্ভব ও বিকাশ এভাবে দেখাতে চাই তা হ'লে প্রয়োজনীয় সন-তারিখগুলি লেখা হবে নীচের দিকে আর বিভিন্ন প্রদেশের মানুষের চিত্র এঁকে তাদের মুখের ভাষা বোঝানো হবে। এতে রেখাচিত্রটি শিক্ষার্থীদের কাছে অধিকতর আকর্ষণীয় হবে।

পিকটোরিয়াল গ্রাফ

পরবর্তী শিক্ষার উপকরণ হ'ল **চার্ট**। চার্ট প্রকৃতপক্ষে রেখাচিত্র এবং চিত্রের এক সম্মিলিত রূপ। চার্ট ব্যবহারের কারণ হ'ল, এর সাহায্যে তুলনামূলক পর্যালোচনার

সুবিধে হয়, অগ্রগতির স্বরূপটি উদ্ঘাটন করা যায়, বিভিন্ন সংগঠন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করা যায়। চার্টও বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। তবে ইতিহাস শিক্ষণের জন্য উৎপত্তি নির্ণায়ক Genealogy chart, বৃক্ষাকৃতি Tree chart, কোন ঘটনার ক্রমবিকাশ নির্দেশক Flow chart, এবং সময়জ্ঞান সহায়ক Chronology chart বিশেষ উপযোগী।

চার্ট

ইতিহাস শিক্ষণের বিশেষ উপযোগী উপকরণ হ'ল **চিত্রের ব্যবহার**। শিশু মনের কাছে চিত্রের আবেদন বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে না। আমরা এখানে কেবল কয়েকজন বিশেষজ্ঞের মন্তব্য উদ্ধৃত করতে চাই। একজন বলেছেন, "Pictures are representations of beautiful dreams of reality or at least beautiful dreams." অধ্যাপক জার্ভিস বলেছেন, "If history is to be made interesting for lower classes the proper materials for teaching are dramatic scenes and heroic characters." আর একজন বলেছেন, "Picture will simplify the abstractions and help create and maintain interest."

চিত্র ও তার উপযোগিতা

চিত্র যেমন পাঠদানে বিশেষ কার্যকরী হতে পারে তেমনি পাঠদান পদ্ধতিকে বিঘ্নিতও করতে পারে। তাই চিত্র-ব্যবহারের সময় আমাদের কয়েকটি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন :

শিক্ষার্থীদের মনপ্রাণ ভরে চিত্রটি দেখবার সুযোগ দিতে হবে। যেন শিক্ষার্থীদের দিক থেকে কোন অপূর্ণতাবোধ কোন অতৃপ্তি থেকে না যায় সেদিকে নজর দিতে হবে।

চিত্রটি বেশ চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে। চাতুর্য এ কারণে যে চিত্রে আর কতটুকু প্রতিফলিত হয়, কতটুকু ব্যক্ত থাকে। যা অব্যক্ত রইলো তা যেন শিক্ষার্থী আপন কল্পনার ঐশ্বর্য দিয়ে পূর্ণ করে নিতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

একসঙ্গে অধিক সংখ্যক চিত্রের ব্যবহার উচিত নয়। অনাবশ্যক চিত্র শিক্ষার্থীদের অমনোযোগী করে। তাদের অকারণ চিত্ত চাঞ্চল্য ঘটায়। চিত্রের ব্যবহারই হবে অর্থপূর্ণ ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত, এ কথাটি আমাদের মনে রাখতে হবে।

বস্তুতঃ ভাব প্রকাশে যথার্থ ভাষা যেখানে দুর্লভ, চিত্র সেখানে একমাত্র অবলম্বন। আবার চিত্র এককভাবে যথেষ্ট অর্থবাহী নয়, তার যোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবহার হয় নৈপুণ্যের মধ্য দিয়ে।

আর একটি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টি নির্ভর ইতিহাস শিক্ষণের উপকরণ হ'ল **মডেল্**। বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত দ্রব্যাদি যদি শ্রেণীকক্ষে দেখানো যেতে পারতো তবে নিঃসন্দেহে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠতো। কিন্তু এসব উপাদান অন্ততঃ বিদ্যালয়ের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। সে ক্ষেত্রে বিকল্প একটিই,

মডেল্

রয়েছে। তাহ'লে ঠিক যে ধরনের দ্রব্য একদা ব্যবহৃত হ'ত সেইরকম দ্রব্য তৈরী করে নেওয়া। এইসব তৈরী করা জিনিসকেই বলা হয় মডেল্। মডেল্ "gives a vivid impression of the real."

মডেলের রূপভেদ

প্রয়োজন অনুসারে আমরা বিভিন্ন ধরনের মডেল তৈরী করতে পারি। যেমন বিভিন্ন বিখ্যাত ঐতিহাসিক দুর্গ বা বিভিন্ন রাজন্যবর্গের মডেল্, শ্রুতকীর্তি বিভিন্ন ঐতিহাসিক নায়কদের প্রতিমূর্তি, বিভিন্ন যুগে ব্যবহৃত অস্ত্র-শস্ত্রের মডেল্, নৈমিত্তিক জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন দ্রব্যের মডেল্ ইত্যাদি।

মডেলের বৈশিষ্ট

কিন্তু একটি ভাল মডেলের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। মডেলটি অবশ্যই আসলের পুংখানুপুংখ প্রতিরূপ হবে। যেহেতু অতীতকে জীব করাই এখানে একমাত্র লক্ষ্য সেইহেতু অবিকল বিকল্পই একান্তভাবে বাঞ্ছিত। মডেলটি হবে খুব সহজ ও সরল। সঙ্গে সঙ্গে মডেল্ নির্মাণকালে তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য কতটা তাও বিচার করে দেখতে হবে। মডেল নির্মাণ যেন খুব বেশী ব্যয় বহুল না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ শ্রুতিনির্ভর উপকরণ ॥
॥ Auditory Aids ॥

বেতার

শ্রুতিনির্ভর উপকরণ বলতে বুঝায় বেতার, গ্রামোফোন, টেলিভিসন প্রভৃতি। এসব উপকরণ ব্যবহারগত দিক থেকে প্রায় সমগোত্রীয় বলে এদের পৃথক পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। কেবলমাত্র আধুনিককালে যেহেতু বেতার বহুল-প্রচারিত ও সহজলভ্য তাই উপকরণ হিসেবে বেতারের ভূমিকা ও গুণাগুণ সম্পর্কে এখন আমরা আলোচনা করব।

ইতিহাসে সমসাময়িক প্রসঙ্গের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। যে বর্তমানে শিক্ষার্থী বসবাস করে সেই বর্তমানই তার কাছে বিশেষ পরিচিত এবং এই বর্তমানের সাহায্যে যদি অতীতকে ব্যাখ্যা করা যায় তবে তা হবে অনেক বেশী হৃদয়গ্রাহী ও যুক্তিগ্রাহ্য। তা ছাড়া মনস্তাত্ত্বিকেরাও বলেন, জানা থেকে অজানার দিকে অগ্রসর হওয়া প্রকৃত জ্ঞানার্জনের একটি প্রকৃষ্ট পন্থা। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বেতার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য শিক্ষার উপকরণ। কারণ বেতারের মাধ্যমে বর্তমান জীবনযাত্রার সামগ্রিক পরিচয়—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, পাওয়া যায়। এই পরিচয়কে ভিত্তি করে যদি আমরা ক্রমশঃ অতীতচারী হতে পারি তবেই ইতিহাসের পাঠে বেতারের ব্যবহার সার্থক হয়ে উঠতে পারে।

কিন্তু উপকরণ হিসেবে বেতার ব্যবহারের অসুবিধে হল, এখানে কোন প্রশ্ন, কোন কৌতূহল শিক্ষার্থীর মনে জাগ্রত হ'লে তাকে চরিতার্থ করার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া শিক্ষার্থীগণ সাধারণতঃ সঙ্গীত, নাটক প্রভৃতি কর্মসূচীতেই অধিকতর আকর্ষণ বোধ করে।

তবে সুবিধে হ'ল, বেতারের কর্মসূচী পূর্বাহ্নেই ঘোষিত হয়। সুতরাং নির্দিষ্ট কর্মসূচী সম্পর্কে যদি শিক্ষার্থী কিঞ্চিৎ পূর্ব প্রস্তুতি নিয়ে থাকে তাহলে বেতার সত্যি সত্যিই একটি বিশেষ প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ইতিহাস চর্চার উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

॥ শ্রবণ ও দর্শন নির্ভর উপকরণ ॥

॥ Audio-Visual ॥

শ্রবণ ও দর্শন নির্ভর উপকরণের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য **সবাক্ চলচ্চিত্র।** এবং আধুনিক জীবনে চলচ্চিত্রের অপরিসীম জনপ্রিয়তা নতুন করে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। কিন্তু আমাদের আলোচ্য হ'ল ইতিহাস শিক্ষার প্রয়োজনে আমরা চলচ্চিত্রকে কতদূর এবং কতখানি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করতে পারি।

সবাক্ চলচ্চিত্র

ইতিহাস শিক্ষণে চলচ্চিত্রের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কারণ:

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে আমরা অতীতের ঘটমানতাকে নতুন করে সৃষ্টি করতে পারি।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শ্রেণীকক্ষে বসে আমরা পৃথিবীর যে কোন দেশের ইতিহাসের চলমানতার সঙ্গে নিজেদের মিলিয়ে নিতে পারি।

চলচ্চিত্রের মাধ্যমে অতি অনায়াসে অল্প সময়ে আমরা যে কোন দীর্ঘ কালে পাড়ি দিতে পারি।

যেহেতু চলচ্চিত্র একটি শ্রুতি ও দৃষ্টি নির্ভর মাধ্যম সেইহেতু চলচ্চিত্রের শিক্ষা দীর্ঘস্থায়ীত্ব অর্জন করে। চিত্রের মাধ্যমে সৃষ্টি হয় প্রকৃত ঐতিহাসিক পটভূমিকা। আর শব্দের মাধ্যমে শ্রুত হয় চলমান ঐতিহাসিক নায়কদের কণ্ঠস্বর। উভয়ে মিলে এমন এক অনাস্বাদিত পূর্ব অভিজ্ঞতার জন্ম হয় যা আমাদের শিহরিত করে, পুলকিত করে, আমরাও নিজেদের মিলিয়ে দেই পর্দায় প্রতিফলিত চলমানতার সঙ্গে। এমনভাবে আমাদের সমগ্র অস্তিত্বকে বিমথিত করতে পারে আর কোন উপকরণ?

অধিক অগ্রসর এবং তুলনামূলকভাবে অনগ্রসর উভয় শ্রেণীর শিক্ষার্থীর কাছে চলচ্চিত্র সমানভাবে সংবেদনশীল ও শিক্ষামূলক।

শিক্ষকের প্রাণস্পর্শী কণ্ঠস্বর কিংবা পাঠ্যপুস্তকের হৃদয়গ্রাহী বিশ্লেষণ অথবা অন্য যে কোন মাধ্যমের তুলনায়, সন্দেহ নেই চলচ্চিত্র অনেক বেশী ব্যাপক, বিস্তৃত, গভীর এবং নাটকীয়, আর তাই—মর্মে প্রবেশ করে আমাদের আকুল করে।

কিন্তু ইতিহাস শিক্ষায় চলচ্চিত্র ব্যবহার স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক হবে। এই মাধ্যম

আমরা শিক্ষার্থীদের মন পাঠ্যাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি কিংবা কোন একটি আলোচ্য বিষয়ে প্রাঞ্জল করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে পারি অথবা আলোচ্য বিষয়ের পুনরালোচনার প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি অথবা নিজস্ব মতামত গড়ে তোলার স্বার্থেও ব্যবহার করতে পারি। কথা হ'ল, পরিকল্পনাহীনভাবে চলচ্চিত্র ব্যবহার করলে তা সুফলপ্রসূ হতে পারে না।

চলচ্চিত্রের ব্যবহার পদ্ধতি

ইতিহাসের প্রয়োজনে বহু রকমের চলচ্চিত্র হতে পারে। যেমন শ্রেণীকক্ষের উপযোগী চলচ্চিত্র, তথ্যমূলক চলচ্চিত্র, সংবাদ সমীক্ষামূলক চলচ্চিত্র, ঐতিহাসিক নাটক কেন্দ্রিক চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

শ্রেণীকক্ষের উপযোগী চলচ্চিত্র আবার বহুবিধ হতে পারে। যেমন কোন রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক বা সামাজিক আন্দোলনকে ভিত্তি করে চলচ্চিত্র। উদাহরণ, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন কিংবা ভারতের ব্রিটিশ শক্তির ক্রমবিকাশ ইত্যাদি। হতে পারে কোন তথ্য সরবরাহমূলক চলচ্চিত্র। যেমন নালন্দা বিশ্ববিত্থালয়ের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা অথবা আকবরের রাজসভার একটি দিন। আবার হতে পারে মহাপুরুষদের জীবন বৃত্তান্তমূলক চলচ্চিত্র।

শ্রেণীকক্ষের উপযোগী চলচ্চিত্র

তথ্য সরবরাহ মূলক চলচ্চিত্রকে 'a creative treatment of actuality বলে অভিহিত করা হয়েছে। এ ধরনের চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলা হয়েছে, "It persents truthful material in a cinematically interesting way." ভারত সরকারের ফিল্মস্ ডিভিসন্ এ ধরনের বহু উৎকৃষ্ট তথ্যচিত্র নির্মাণ করেছেন। যেমন খাজুরাহো, পবিত্র হিমালয়, ভাক্‌রা নাঙ্গাল পরিকল্পনা প্রভৃতি।

আবার সমসাময়িকতার সঙ্গে শিক্ষার্থীগণ যাতে পরিচিত হতে পারেন সে রকম চলচ্চিত্র হ'ল **সংবাদ সমীক্ষামূলক চলচ্চিত্র**। ইতিহাস শিক্ষণের কাজে এ ধরনের চলচ্চিত্র বিশেষভাবে সুপ্রযুক্ত হতে পারে।

ঐতিহাসিক ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে যে সব **পূর্ণদৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র** নির্মিত হয় সেগুলিও যথেষ্ট কার্যকরী উপকরণ। তবে এই শ্রেণীর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে বিচার করতে হবে ইতিহাস বিকৃত হয়েছে না যথাযথভাবে রূপায়িত হয়েছে। কেবল মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে নির্মিত চলচ্চিত্র নিশ্চয়ই শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায় না—এ কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে।

তবে যে কোন চলচ্চিত্র প্রদর্শনের আগে বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করবার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত প্রারম্ভিক ভাষণের প্রয়োজন। তবে এই ভাষণ কখনো মাত্রাতিরিক্ত হবে না। তাতে শিক্ষার্থীদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটবে। আবার চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর শেষে একটি আলোচনার ব্যবস্থাও করা দরকার। উদ্দেশ্য হবে প্রদর্শিত চলচ্চিত্রটির মধ্য থেকে শিক্ষার্থী কতটুকু ইতিহাস জানলো, বুঝলো এবং গ্রহণ করলো।

॥ ইতিহাস কক্ষ ॥

॥ History Room ॥

বিজ্ঞান বা হস্তশিল্প—এ ধরনের বিষয় শিক্ষাদানের জন্য প্রয়োজন নানা রকম যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম। তাই এ ধরনের বিষয়গুলোর যথোচিত পঠন-পাঠনের জন্য পৃথক শ্রেণীকক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে কোন মতদ্বৈধতার অবকাশ নেই। কিন্তু ইতিহাস পঠন-পাঠন কালেও যে পৃথক কক্ষের প্রয়োজন এ কথা দীর্ঘকাল স্বীকৃত পায় নি। না পাবার কারণও সুস্পষ্ট। বহুদিন পর্যন্ত ইতিহাস ছিল একটি বিমূর্ত জ্ঞানাশ্রয়ী বিষয়, অতীত ঘটনাবলীর এক সংকলন মাত্র। ইতিহাসকে তখন কেবলমাত্র শিক্ষার্থীর নৈতিক চেতনা জাগ্রত করার কাজেই ব্যবহার করা হ'ত। কিন্তু যখন থেকে ইতিহাস একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়রূপে গৃহীত হ'ল, সত্যানুসন্ধানই ইতিহাসের কর্মপন্থা হিসেবে চিহ্নিত হ'ল তখন থেকে ইতিহাস পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে এল এক ব্যাপক পরিবর্তন। ইতিহাসও শ্রেণীকক্ষে একটি বিজ্ঞান-ভিত্তিক বিষয়রূপে পরিগণিত হতে লাগলো। আর তখনই প্রয়োজন অনুভূত হ'ল ইতিহাসের নিজস্ব কক্ষের।

ইতিহাস কক্ষের প্রয়োজন

ইতিহাসের জন্য বিদ্যালয়ে যে সময় নির্দিষ্ট তা প্রয়োজনের তুলনায় একান্তই কম। এই স্বল্প সময়কেও যদি যথোচিতভাবে সদ্ব্যবহার করতে হয় তবে শিক্ষকের অবশ্যই সুসজ্জিত কক্ষ দরকার, যেন তিনি হাতের কাছেই প্রয়োজনীয় সকল উপাদানই পেতে পারেন, যেন উপাদান সংগ্রহের জন্যই তাকে ইতস্ততঃ ছুটে বেরিয়ে অযথা কালক্ষেপ করতে না হয়।

আদর্শ ইতিহাস পঠন-পাঠনের জন্য অপরিহার্য হ'ল অনুকূল পরিবেশ। সুসজ্জিত ইতিহাস কক্ষে এমন একটি ঐতিহাসিক পরিমণ্ডল সর্বক্ষণই বিরাজমান থাকে যে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী উভয়েই আন্তরিকভাবে উৎসাহী হয়ে ওঠেন ইতিহাস নিয়ে চর্চা করতে।

প্রকৃত ইতিহাস চর্চার জন্য প্রয়োজন বহুবিধ উপকরণ। আবার এসব উপকরণ পাওয়াটাই বড় কথা নয়, সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব এসে যায় মূল্যবান উপকরণের যথোচিত সংরক্ষণের। তাই চাই ইতিহাসের জন্য পৃথক কক্ষ।

॥ ইতিহাস কক্ষের আয়তন ॥

সাধারণ শ্রেণীকক্ষের তুলনায় ইতিহাস কক্ষের আয়তন বৃহৎ হবে। মোটামুটি-ভাবে বলা হয় প্রতি ৩০ জন ছাত্রের ৬০০ বর্গফুট পরিমান কক্ষ প্রয়োজন। অন্ততঃ শিক্ষার্থীগণ যেন অবাধে নিজেদের কাজ-কর্ম করতে পারেন, ইতিহাস কক্ষের আয়তন এমনই হওয়া উচিত। কক্ষের তিন দিকে থাকবে দেওয়াল বোর্ড। পিছনদিকের দেওয়াল থাকবে সাদা, যেন প্রয়োজনবোধে পর্দার অভাবে ঐ দেওয়ালেই চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা যায়।

॥ ইতিহাস কক্ষের আসবাব-পত্র ॥

ইতিহাস কক্ষে শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে চেয়ার-টেবিল। এগুলি হবে হাল্কা ধরনের যেন সহজেই স্থানান্তরিত করা যায়। শিক্ষকের জন্য দুদিকে ড্রয়ারযুক্ত টেবিল্। তাছাড়া থাকবে আলমারী প্রাচীন মুদ্রা প্রভৃতি সংরক্ষণের জন্য কাঁচ দিয়ে ঢাকা বাক্স, ম্যাপ রাখার স্ট্যাণ্ড প্রভৃতি।

॥ ইতিহাস কক্ষের সরঞ্জাম ॥

প্রথমতঃ ইতিহাস কক্ষের ভেতরই **একটি গ্রন্থাগার রাখতে হবে** যেন শিক্ষক তাঁর প্রয়োজনমত এবং শিক্ষার্থীগণ তাদের প্রয়োজনমত বইয়ের সরবরাহ পেতে পারে অনায়াসে এবং অযথা কালক্ষেপ না করে।

দ্বিতীয়তঃ ইতিহাস কক্ষে মজুত থাকবে বিভিন্ন মানচিত্র ও চার্ট। চার্ট ছাপানো হতে পারে, আবার শিক্ষার্থীদের তৈরী করাও হতে পারে।

তৃতীয়তঃ ইতিহাস কক্ষে থাকবে সময়ের রেখাচিত্র, সময় রেখা প্রভৃতি। এগুলি শ্রেণীকক্ষে ঝুলিয়ে রাখতে পারলেই ভালো হয়। তাহলে সর্বদা দেখতে দেখতে শিক্ষার্থীদের সময়জ্ঞান ক্রমশঃ তীক্ষ্ণ হয়ে উঠবে।

চতুর্থতঃ ইতিহাস কক্ষে সংরক্ষিত থাকবে বিভিন্ন মডেল্ ও এ্যাল্বাম। এ্যাল্বাম ছাত্রদের দিয়ে তৈরী করিয়ে নিতে পারলে ভাল হয়। এতে ছাত্রদের একদিকে যেমন হাতে কলমে কাজ করবার খানিকটা সুযোগ করে দেওয়া হবে তেমনি অন্য দিকে ইতিহাসের বাস্তবতা সম্পর্কে তারা অধিকতর সচেতন হবে।

পঞ্চমতঃ বিভিন্ন ধরনের উপকরণ যেমন রেডিও এপিডায়স্কোপ, চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর যন্ত্রপাতি প্রভৃতি সুরক্ষার ব্যবস্থা থাকবে এবং এগুলির প্রয়োজনমত ব্যবহারের সুযোগ থাকবে।

ষষ্ঠতঃ ইতিহাসের বিভিন্নযুগে চিত্র সংগ্রহ করে ইতিহাসে কক্ষে একটি চিত্রশালা গঠন করা যেতে পারে। বিভিন্নযুগে ব্যবহৃত পোষাকের বিভিন্নতা দেখাবার জন্য একটি ছোটখাট সংগ্রহশালা গড়ে তোলা সম্ভব।

সপ্তমতঃ সাপ্তাহিক সংবাদ বোর্ড স্থাপন করে আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ সংকলন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা যায়। কয়েক বৎসর পর দেখা যাবে এইসব সংকলনগুলি ইতিহাস রচনা কৌশল সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার পক্ষে এগুলি বিশেষ উপযোগী উপকরণ।

কিন্তু এ সবই হ'ল তাত্ত্বিক দিক। বাস্তব অবস্থাটি হ'ল, আজকের ক্রমবর্ধমান ছাত্র সংখ্যাধিক্যের দিনে বিদ্যালয়ে সাধারণভাবে স্থান সংকুলানই এক সমস্যা।

উপসংহার

সেখানে ইতিহাসের জন্য পৃথক কক্ষ যেন এক অলীক কল্পনা। তবু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ইতিহাসের শিক্ষক নিজস্ব উদ্যোগ ও উদ্যমের সাহায্যে যতটা সম্ভব বর্তমান পরিস্থিতিতেও অভিনব কিছু করতে উৎসাহী হবেন—এই সৎ আশা প্রকাশ ছাড়া আপাততঃ কোন গত্যন্তর নেই।

॥ ইতিহাস গ্রন্থাগার ॥

॥ History Library ॥

"The library is the intellectual nerve centre of a good school, the hub of its academic life, inspiring students to read and cultivating in them a sincere love of books." কথাটি সাধারণ গ্রন্থাগার সম্পর্কে কথিত। কিন্তু ইতিহাসের গ্রন্থাগারের এ ছাড়াও রয়েছে কিছু নিজস্ব বক্তব্য। ইতিহাস 'veritable mine of life experiences' হিসেবে এক সীমাহীন জ্ঞানভাণ্ডার যেখানে শিক্ষার্থী অবাধে সন্ধান করে বেড়াতে পারে তার অপরিসীম জ্ঞান-তৃষ্ণাকে তৃপ্ত করতে। বিশেষ করে বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের পাঠক-পাঠিকা হ'ল বয়ঃসন্ধিকালের বালক-বালিকা, যাদের বৈশিষ্ট্যই হ'ল এক দুর্নিবার কৌতূহলী মন আর নিজের পরিমণ্ডলকে জানার এক আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা। এই কৌতূহলকে চরিতার্থ করতে এবং আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাকে পরিতৃপ্ত করতে সর্বতোভাবে সমর্থ ইতিহাস। তাই প্রকৃত ইতিহাস চর্চার জন্য প্রয়োজন একটি সুসজ্জিত গ্রন্থাগারের। এই গ্রন্থাগার গড়ে তোলার উদ্দেশ্য হবে :

গ্রন্থাগারের প্রয়োজন

(এক) বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের কৌতূহলী করা।

(দুই) নিত্য নতুন জ্ঞানার্জনের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর মানসিক সজীবতাকে বজায় রাখা।

(তিন) বিভিন্ন পুস্তকপাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর নিজস্ব মতামত গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

(চার) শিক্ষার্থীদের পাঠ্যাভ্যাস গঠন করা।

(পাঁচ) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করা।

তাছাড়া বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে রয়েছে মানসিক গঠনের মধ্যে বৈচিত্র এবং বৈষম্য। তাই কেবল একটি মাত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক স্পষ্টতঃ কখনোই প্রত্যেকের কাছে সমান উপভোগ্য হতে পারে না। ইতিহাসের গ্রন্থাগার এক্ষেত্রে প্রত্যেকের নিজস্ব প্রয়োজন ও চাহিদা অনুসারে পুস্তক সরবরাহ করতে পারে।

মানসিক বৈষম্য

তারপর ইতিহাসে ছড়িয়ে রয়েছে বহু বিমূর্ত চিন্তা-চেতনা, মতবাদ। এইসব বক্তব্য বহুক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের নৈমিত্তিক অভিজ্ঞতার বাইরে। কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তক পাঠ করে ভাষাজনিত দুর্বোধ্যতার জন্যেও হয়তো শিক্ষার্থীর পক্ষে এইসব মতবাদগুলিকে পরিষ্কার উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। এক্ষেত্রে গ্রন্থাগারের বিপুল গ্রন্থভাণ্ডার তার সকল বিড়ম্বনার অবসান ঘটাতে পারে।

ইতিহাসের বিমূর্ত চরিত্র

ইতিহাস চর্চায় নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলার একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। ধরা যাক্ ইতিহাসের কোন একটি মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয়। একাধিক পুস্তক পাঠ করে শিক্ষার্থী ঐ বিষয় সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতের সঙ্গে পরিচিত হতে পারবে এবং এই পরিচয়ের মাধ্যমে সে তার নিজের মতটি গড়ে তুলতে পারবে। এখানেও রয়েছে ইতিহাসের গ্রন্থাগারের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা।

নিজস্ব মতবাদ গঠন

॥ গ্রন্থাগারের তথ্য রাশি ॥

গ্রন্থের দিক থেকে গ্রন্থাগারে বিভিন্ন ধরনের পুস্তকের সমাবেশ ঘটাতে হবে। গ্রন্থাগারে থাকবে বিভিন্ন লেখকের লেখা পাঠ্যপুস্তক। থাকবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক নায়কদের জীবন-কাহিনী, ঐতিহাসিক উপন্যাস ও নাটক, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি। থাকবে প্রতিষ্ঠিত ঐতিহাসিকদের রচনাবলী।

এ সব ছাড়াও সংবাদপত্র, ইতিহাসের উপর বিভিন্ন জার্নাল গ্রন্থাগারে রাখতে হবে। শিক্ষার বিভিন্ন উপকরণ যেমন ম্যাপ, চার্ট, গ্লোব ইত্যাদিও যেন গ্রন্থাগারে পাওয়া যায় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

॥ গ্রন্থাগারের ব্যবহার ॥

গ্রন্থাগার থাকাটাই শেষ কথা নয়, আসল হ'ল সেই গ্রন্থাগারের যথাযথ ব্যবহার প্রথমেই শিক্ষার্থীদের শেখাতে হবে কেমন করে গ্রন্থাগার যথাযথভাবে ব্যবহার করা যায়। পুস্তকতালিকা থেকে প্রয়োজনীয় পুস্তকটি অনুসন্ধান, পুস্তক সংরক্ষণ প্রভৃতি বিষয়গুলি গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান ভিত্তিক। এই বিজ্ঞানের কলা কৌশল শিক্ষার্থীদের জানতে হবে।

॥ ইতিহাস পাঠ্যপুস্তক ॥

॥ History Text book ॥

॥ পাঠ্যপুস্তকের অপরিহার্যতা ॥

সাম্প্রতিককালে শিক্ষাক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক কি একান্তই অপরিহার্য এমন একটি প্রশ্ন প্রায়শঃই উচ্চারিত হতে শোনা যাচ্ছে। ফ্রএব্‌ল, ডিউই, গান্ধী প্রভৃতি শিক্ষাবিদগণের চিন্তাধারা প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রশ্ন উত্থাপনে ইন্ধন যুগিয়েছে। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই প্রশ্ন নিয়ে ব্যাপক বিচার বিশ্লেষণও হয়েছে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে। কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের আমূল উৎপাটন এমন সম্ভাবনা কোথাও সমাদৃত হয় নি। বরং যাঁরা বিশেষজ্ঞ, তাঁরা উল্টো কথাই বলেছেন। যেমন :

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা পর্যদের পাঠ্যপুস্তক কমিটি সুস্পষ্টভাবে অভিমত প্রকাশ করে বলেছেন, "A modern educational system without textk books is as difficult to imagine as Hamlet without the Prince of Denmark."

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন্ (মুদালিয়র কমিশন্) অবশ্য বলেছেন যে আমাদের পাঠ্যপুস্তকের উপর নির্ভর করার যে অত্যধিক প্রবণতা তা কমিয়ে আনতে হবে। এমন কি কমিশন্ কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তককেও পাঠ্য পুস্তক হিসেবে চিহ্নিত করার বিরোধী। তাই কমিশন্ বলেছেন, "...the Text Book Committee should approve a number of suitable books in each subject and leave the choice to the institution concerned."

মুদলিয়র কমিশন্

এই কথাটিকে আরও বেশী স্পষ্ট করে বলেছেন **অধ্যাপক হাণ্ট**। তাঁর মতে, "In school work in history the text book remains after the teacher, the learner's chief aid and support." পাঠ্য পুস্তক তাই শিক্ষকের সহায়ক একটি উপাদান মাত্র।

অধ্যাপক হাণ্ট

॥ পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা ॥

কিন্তু এত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা পাঠ্য পুস্তককে কোনভাবেই অস্বীকার করতে পারছি না। পারছি না বলেই যে সত্যটি থেকে যায় তা হ'ল নিশ্চয়ই পাঠ্য পুস্তকের এমন কোন অনিবার্যতা রয়েছে যা অন্যভাবে মেটানো সম্ভব নয়। কিন্তু কি সেই অনিবার্যতা? এক্ষণে আমরা তাই অনুসন্ধান করবো।

প্রথমতঃ ইতিহাসের যে কোন একটি বিষয়ে যে প্রাথমিক ও **তাৎক্ষণিক জ্ঞান অর্জন** শিক্ষকের একান্তই জরুরী, সেই জরুরী প্রয়োজন মেটানো যেতে পারে পাঠ্য পুস্তকের সাহায্যে। তা ছাড়া সর্বদাই প্রকৃত উপাদান থেকে ইতিহাস সংগ্রহ করার ক্ষমতা সম্পন্ন শিক্ষক সহজ লভ্য নয়। এ-ক্ষেত্রেও পাঠ্য পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা শিক্ষকের কাছে সীমাহীন।

দ্বিতীয়তঃ যদিও ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতিতে মর্মস্পর্শী বক্তৃতা দানের প্রয়োজন প্রশ্নাতীত, তবু কেবল একবার মাত্র একটি **বক্তৃতা শুনে বক্তব্য বিষয়কে** স্থায়ীভাবে হৃদয়ে ধারণ করে রাখা নেহাৎই শ্রুতিধর না হলে, সম্ভব নয়। পাঠ্যপুস্তক এই বিরাট প্রতিবন্ধক অতিক্রম করে আসতে সাহায্য করে।

তৃতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তক বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হয় সময়াক্রম অনুসারে, যুক্তি-নির্ভর পদ্ধতিতে এবং ঘটনার ধারাবাহিতাকে অনুসরণ করে। ফলে ইতিহাসের **কার্য-কারণ** সূত্র সুন্দর প্রতিফলিত হয় পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে।

চতুর্থতঃ পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে শ্রেণীকক্ষে **পঠন-পাঠনের একটি নির্দিষ্ট মান** বজায় রেখে চলা সহজ হয়। এই মান বজায় রাখার উপরই নির্ভর করে শিক্ষার্থীদের নতুন নতুন জ্ঞান লাভের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ।

পঞ্চমতঃ বিশেষ করে ভারতবর্ষের পারিপার্শ্বিকতায় যেখানে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সংখ্যাবাহুল্য বর্তমান, যেখানে এক বিরাট পাঠ্যক্রম শেষ করার তাগিদ, যেখানে

রয়েছে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তি-বৈষম্যের প্রতি এক গভীর অবজ্ঞা পাঠ্যপুস্তক একান্তই অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়।

ষষ্ঠতঃ উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক বাস্তব জ্ঞানের সঙ্গে তাত্ত্বিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধনে সহায়তা করে।

সপ্তমতঃ পাঠ্যপুস্তকের নতুন জ্ঞান অর্জনের উৎসস্থল হিসেবে বিশেষ সাহায্যকারী। এই উৎসকে অবলম্বন করেই শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়ে ক্রমশঃ বৃহত্তর জ্ঞানের সন্ধানে অগ্রসর হতে পারেন।

সর্বশেষে ব্যবহারিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে, অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীর যে উপলব্ধি হয়, প্রয়োজন হয় তার যথার্থতা যাচাই করা। পাঠ্যপুস্তক এই বিচারে বিশেষ সাহায্যকারী এবং সহায়ক একটি মাধ্যম।

॥ পাঠ্যপুস্তকের শ্রেণী বিভাগ ॥

জনসন তিন ধরনের পাঠ্যপুস্তকের কথা বলেছেন। প্রথমতঃ যে সব পুস্তকে ঘটনার সারমর্মটি মাত্র ব্যক্ত থাকে তাকে ফরাসী ভাষায় বলা হয় **Precis** দ্বিতীয়তঃ যে সব পুস্তকে ঘটনার অধিকতর ব্যাপক বিবরণ থাকলেও সেই বিবরণকে আরও বেশী সম্প্রসারিত করার সুযোগ রাখা হয় তাকে বলা হয় **Manuels.** তৃতীয়তঃ সর্বাংশে পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তককে বলা হয় **Cours.**

॥ পাঠ্যপুস্তকের গুণাবলী ॥
॥ Qualities of Text-Book ॥

আদর্শ পাঠ্যপুস্তকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা একান্তই অপরিহার্য।

প্রথমতঃ পাঠ্যপুস্তক যেহেতু মূলতঃ রচিত হবে শিক্ষার্থীর জন্য সেইহেতু তাদের **প্রয়োজন ও অপ্রয়োজনের** দিকে লক্ষ্য রেখেই এই পুস্তক রচিত হওয়া উচিত।

দ্বিতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তক শিক্ষার্থীর পক্ষে **যথেষ্ট উদ্দীপক** হওয়া প্রয়োজন। এই পুস্তকপাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যেন ইতিহাসের কার্য-কারণ সূত্রটি অনুধাবন করতে পারে, ইতিহাসের চলমানতার মূল সুরটিকে অনুভব করতে পারে। এই অনুধাবন ও অনুভবের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে উন্মোচিত হবে চির জাগরূক এক অম্লান জ্ঞান-তৃষ্ণা। এই জ্ঞান তৃষ্ণাই তাদের ক্রমান্বয়ে সত্যানুসন্ধানী করে তুলবে।

তৃতীয়তঃ বিবিধ মানচিত্র, চার্ট, সময়রেখা **বৈচিত্র্যপূর্ণ চিত্রাবলী** দিয়ে পাঠ্যপুস্তককে সুসজ্জিত করতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের সুসজ্জাতেই শিক্ষার্থী প্রথম আকৃষ্ট হবে। তাছাড়া এইসব চিত্রাবলীর ব্যবহারের ফলেই ইতিহাসকে বহুলাংশে জীবন্ত করে তোলা সম্ভব হবে।

চতুর্থতঃ পাঠ্যপুস্তক কখনোই কোন অন্ধ মতাদর্শ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে না। কোন উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত হয়ে পাঠ্যপুস্তক রচিত হবে না। সে ক্ষেত্রে তা আর পাঠ্য-পুস্তক থাকবে না, হয়ে যাবে কোন এক প্রচারধর্মী পুস্তিকা। এ বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা ও সচেতনতা রক্ষা করে চলতে হবে।

পঞ্চমতঃ পাঠ্যপুস্তকের রচনাশৈলী যেন শিক্ষার্থীদের নিত্য-নতুন জ্ঞানের সন্ধানে অনুপ্রাণিত করে। একজন চিত্রকর যেমন একটি পূর্ণ চিত্র অংকনের আগে স্কেচ এঁকে নেন, পাঠ্যপুস্তকের রচয়িতাও তেমনি পাঠ্যপুস্তকে কেবল রেখাচিত্রটি অবিকৃতভাবে উপস্থিত করবেন তারপর সেই রেখাচিত্রকে রঙে-রসে-রেখায় সজীব করে তোলার দায়িত্ব শিক্ষার্থীর।

ষষ্ঠতঃ চলমানতাই তো ইতিহাস, তাই ইতিহাসের গবেষণাও নিরবচ্ছিন্ন। তাই আবিষ্কৃত হচ্ছে কতই না নিত্য-নতুন তথ্য। এইসব নবাবিষ্কৃত তথ্যের স্থান যেন পাঠ্যপুস্তকে থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সপ্তমতঃ ইতিহাসে ভাবপ্রকাশের সাবলীলতার একটি বিশেষ মর্যাদা আছে। তাই বলা হয় History is more than a literature. অতএব লক্ষ্য রাখতে হবে পাঠ্য পুস্তকের ভাষা যেন সহজ সাবলীল ও মর্মস্পর্শী হয়।

সর্বশেষে পাঠ্যপুস্তকে প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনী এবং সমধর্মী পুস্তকের তালিকাও সন্নিবেশিত হওয়া উচিত।

॥ পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার বিধি ॥
॥ Use of Text-books ।

প্রথমতঃ ইতিহাস চর্চা যেন উদ্দেশ্যহীন না হয়, বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পদ্ধতির সঙ্গে যেন শিক্ষার্থী পরিচিত হতে পারে তারজন্য ইতিহাসের পাঠ্যপুস্তককে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। প্রকৃতপক্ষে পাঠ্যপুস্তক তাকে সঠিক পথের নির্দেশ দেবে, আধুনিক ইতিহাস পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত করবে।

দ্বিতীয়তঃ দিনের পাঠের সংক্ষিপ্তসার রচনার কাজে পাঠ্যপুস্তককে ব্যবহার করা যেতে পারে। বিস্তৃত আলোচনার সারাৎসার কি তা শিক্ষার্থী সহজেই জানতে পারে পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে।

তৃতীয়তঃ শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্যও শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনীর সাহায্য নিতে পারেন।

॥ পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারে সতর্কতা ॥

পাঠ্যপুস্তক যতই অপরিহার্য হোক না কেন, পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারিক উপযোগিতা যত বেশীই থাকুক না কেন, পাঠ্যপুস্তক ব্যবহারে আমাদের কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমতঃ কখনো কোন ক্ষেত্রেই পাঠ্যপুস্তককে ইতিহাস চর্চার **প্রাথমিক উপাদান** হিসেবে গ্রহণ করা চলবে না। পুস্তকে পরিবেশিত তথ্যই ইতিহাসের সর্বশেষ কথা এমন ধারণা যেন শিক্ষার্থীদের মনে কখনো জাগ্রত না হয়। সি. পি. হিল্ তাই বলেছেন, "A text book ought not to be used as a collection of facts to be learned by heart but rather as a store-house of basic information which the pupils can use in a variety of active ways."

দ্বিতীয়তঃ সাহিত্যের মত শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীগণ কখনো **সমস্বরে উচ্চকণ্ঠে** পাঠ্য-পুস্তক পাঠ করবে না। যদি নেহাৎই কখন এমন প্রয়োজন হয় তবে সে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন শিক্ষক। তিনি নিজে প্রয়োজনীয় অংশটুকু পাঠ্যপুস্তক থেকে শ্রেণীকক্ষে পাঠ করবেন।

তৃতীয়তঃ পাঠ্যপুস্তকে যা কিছু বিবৃত হবে তাকেই **অভ্রান্ত** এবং **চূড়ান্ত** বলে গ্রহণ করতে হবে—এমন কোন বাধ্যবাধকতা নেই। প্রয়োজন মত পাঠ্যপুস্তকে পরিবেশিত তথ্যও আলোচিত এবং সমালোচিত হবে। এই পথেই শিক্ষার্থীর বিচার বিশ্লেষণী শক্তির উন্মেষ সাধন হবে।

॥ পাঠ্যপুস্তকের নির্বাচন ॥

এই প্রসঙ্গেই প্রশ্ন এসে যায়, কোন একটি নির্দিষ্ট পুস্তককে না একাধিক পুস্তককে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে নির্বাচন করা হবে। বাস্তব অভিজ্ঞতার নিরিখে দেখা গিয়েছে একটি পাঠ্যপুস্তক বহু ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীর মতবাদকে প্রভাবিত করে থাকে, তার নিজস্ব বিচার শক্তিকে সংকুচিত করে থাকে, ক্রমশঃ তারপর নির্ভরতার মনোভাব জাগ্রত হতে থাকে। এই অবস্থার প্রতিষেধক হিসেবেই পণ্ডিত ব্যক্তিগণ একাধিক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করবার পক্ষপাতী।

॥ পাঠ্যপুস্তকের জাতীয়করণ ॥

কিন্তু যদি একাধিক পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনকেই আমরা নীতি হিসেবে গ্রহণ করি, তখনই প্রশ্ন আসে, তাহ'লে পাঠ্যপুস্তকের জাতীয়করণের প্রশ্নটি, যার পক্ষে সাম্প্রতিক কালে উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তকের অভাবে জনমত অত্যন্ত প্রবল, তার মীমাংসা হবে কি ভাবে? জাতীয়করণের পক্ষে যাঁরা, তাঁরা আরও বলেন, এই পথেই জাতীয় সংহতি সাধনের কাজ ত্বরান্বিত হবে। কিন্তু কেবল এদিকটির উপর গুরুত্ব আরোপের ফল হ'ল, ইতিহাসকে বহুলাংশে বিকৃত করা।

জাতীয়করণের পক্ষে যুক্তি

তাই উভয় পক্ষের মতামতকে যথেষ্ট মর্যাদা দিয়ে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হ'ল: পেশাদারী লেখকের পরিবর্তে যাঁরা ইতিহাসকে ভালবেসে ইতিহাসের পাঠ্য পুস্তক রচনা করতে চান তাঁদের খুঁজে বার করতে হবে, তাঁদেরকে উৎসাহিত করতে হবে। বিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কার্যের সঙ্গে যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত তাঁদেরই এগিয়ে

আসতে হবে। এবং বিভিন্ন গ্রন্থকার যেন নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। তারপর তাঁদের রচিত ইতিহাস গ্রন্থগুলি যেন ঐতিহাসিকদের দ্বারা পরীক্ষিত হতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। আর, পাঠ্য-পুস্তক রচনার পদ্ধতিগত দিকটি সম্পর্কে বিভিন্ন শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়গুলিকে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব নিতে হবে। তাহ'লেই বর্তমান ব্যবসায়িক পরিস্থিতির পরিবর্তন হতে পারে, পাঠ্যপুস্তকের গুণতম উৎকর্ষ বৃদ্ধি পেতে পারে।

॥ সমধর্মী পুস্তক পাঠ ॥

॥ Collateral Reading ॥

ইতিহাস শিক্ষাদানে পাঠ্যপুস্তক ও বক্তৃতা দান উভয়ের প্রয়োজনীয়তাই প্রশ্নাতীত। কিন্তু তা হলেও পাঠ্যপুস্তক কেবল মূল বক্তব্যের উপরেই আলোকপাত করে এবং বক্তৃতাদানের মাধমে কেবল মূল বক্তব্যের সঙ্গে জড়িত প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহ উত্থাপিত হতে পারে। ফলে এই দুটোর কোনটাই এককভাবে ইতিহাসের পূর্ণ রসের আস্বাদনে স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এক্ষেত্রেই প্রয়োজন হয় ইতিহাসের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত পুস্তক পাঠের, যাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি সমধর্মী পুস্তক। সমধর্মী পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলা হয়েছে, "Recitations alone cannot possibly make up proper teaching of history. It is absolutely necessary from the earliest to the last grade that there should be a parallel reading of a some kind." কারণ পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যপুস্তক কখনো সহজলভ্য নয়। আর প্রচলিত পাঠ্যপুস্তক ইতিহাসের ছাত্রের সীমাহীন জিজ্ঞাসাকে তৃপ্ত করতে পারে না। এই জিজ্ঞাসা তৃপ্ত হতে পারে শিক্ষকের সাহায্যে অথবা রেফারেন্স বইয়ের সাহায্যে।

সমধর্মী পুস্তক পাঠের প্রয়োজন

তা ছাড়া সমধর্মী পুস্তক ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অধিকতর আগ্রহশীল করে তোলে। তার কল্পনা শক্তি উদ্রিক্ত হয়, তার বিচারবোধ শানিত হয়। সমধর্মী পুস্তক যেন শিক্ষার্থীর অপরিসীম জ্ঞানতৃষ্ণা নিবারণে এক সঞ্চিত জলাধার।

॥ সমধর্মী পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য ॥

ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সমধর্মী পুস্তক পাঠের যেমন উপযোগিতা আছে তেমনি এই পাঠ যদি সুপরিচালিত না হয় যদি উদ্দেশ্যপূর্ণ না হয় তবে তা প্রকৃত ইতিহাস চর্চায় বিঘ্নের কারণ হতে পারে। তাই দরকার হ'ল সমধর্মী পুস্তক পাঠের জন্য সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ।

(এক) এই পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর মানসিক দিগন্ত যেন অধিকতর উন্মোচিত হয় এবং তার জ্ঞান ভাণ্ডার অধিকতর সমৃদ্ধ হয়।

(দুই) এই পাঠ যেন অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতু বন্ধনের দায়ভার গ্রহণ করতে

পারে। জনসন্ বলেছেন, "The essential condition is that they should leave feelings for and about the past."

(তিন) পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান সংগ্রহ করে সমধর্মী পুস্তক পাঠের মধ্যমে সেই জ্ঞান অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করবে।

(চার) এই পাঠের মাধ্যমে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী ও সাহিত্যের সঙ্গে যেন শিক্ষার্থীর সংযতা স্থাপিত হয়।

(পাঁচ) সমধর্মী পুস্তক পাঠ যেন শিক্ষার্থীকে ঐতিহাসিক পদ্ধতি অনুধাবন ও অনুসরণে সাহায্য করতে পারে। এই পাঠই শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক মনটি গঠন করতে পারে।

(ছয়) সমধর্মী পুস্তক পাঠ যেন ইতিহাসকে সজীব, প্রাণবন্ত এবং মুখর করে তোলে।

।। সমধর্মী পুস্তক পাঠ-পদ্ধতি ।।

প্রথমতঃ সমধর্মী পুস্তক পাঠ হবে শিক্ষার্থীর স্বেচ্ছাপ্রণোদিত এবং তার স্বতোৎসারিত আগ্রহ পূর্ণ। এখানে কোন বাধ্যবাধকতা থাকবে না বা পরীক্ষা নামক বিভীষিকা দ্বারা এই পাঠকে কণ্টকিত করা হবে না। জনসন পরিষ্কার সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, "There should be no set questions to answer no problems to solve, no looking forward to any formal report, but complete freedom to read because he likes it or to stop because he dislikes it."

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত

দ্বিতীয়তঃ **সমধর্মী পুস্তক যেন সহজ লভ্য হয়।** এইসব পুস্তকের ভাষা হবে সহজ, সরল, সাবলীল ও হৃদয় গ্রাহী। পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক হিসেবেই যেন এইসব গ্রন্থ ব্যবহৃত হতে পারে।

তৃতীয়তঃ সমধর্মী পুস্তক নির্বাচন কালে শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থকে যেমন বিচার করতে হবে তেমনি এইসব পুস্তকের মাধ্যমে যেন বিকৃত ইতিহাস পরিবেশিত না হয় সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

চতুর্থতঃ শিক্ষার্থীদের সমধর্মী পুস্তক পাঠের নির্দেশদানের আগে শিক্ষককে কয়েকটি বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবেঃ যেমন, কি উদ্দেশ্যে এমন নির্দেশ তিনি দেবেন, শ্রেণীর সকল ছাত্রদের জন্য একই রকমের নির্দেশ তিনি দেবেন কি না, কি কি বই শিক্ষার্থীদের পড়তে তিনি বলবেন এবং এই পাঠের ফলশ্রুতি তিনি কিভাবে যাচাই করবেন।

॥ সমধর্মী পাঠের প্রকারভেদ ॥

বহু রকমের বইকেই আমরা সমধর্মী পাঠের আওতায় নিয়ে আসতে পারি।

প্রথম, যেমন **ঐতিহাসিক উপন্যাস**। এইসব উপন্যাসে পাঠের মধ্য দিয়ে

শিক্ষার্থী অতীত সম্পর্কে এক অপার্থিব সুখানুভব করতে পারে। "By recreating the past, historical fiction serves as a stimulus to the imagination, provides opportunities for the exercise of critical faculties and offers endless opportunities of extending human sympathy." এইসব উপন্যাসের ঔপন্যাসিক কেবল যে অতীতকে নতুন করে সৃষ্টি করেন তাই নয়, বিভিন্ন ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তাদের রক্ত-মাংস দিয়ে গড়া এক একটি পরিপূর্ণ মানুষে তাদের রূপান্তরিত করেন। এখানেই হ'ল ঐতিহাসিক উপন্যাসের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

ঐতিহাসিক উপন্যাস

দ্বিতীয় ক্ষেত্রে আসে বিভিন্ন **আত্মজীবনী**। আত্মজীবনী পাঠের মধ্য দিয়ে সমসাময়িক সমাজ জীবনের একটি সুন্দর পরিচয় আমরা পেতে পারি। তবে এই শ্রেণী রচনার সবচেয়ে বড় অসুবিধে হ'ল, আত্মজীবনীতে ইতিহাস অপেক্ষা সাহিত্যই অধিক প্রাধান্য লাভ করে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে আত্মজীবনী হয় আতিশয্য দোষে দুষ্ট।

আত্মজীবনী

তৃতীয় শ্রেণী হ'ল **বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা**। আজকাল বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী বিভিন্ন ইতিহাস ভিত্তিক পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের কাছে এইসব পত্র-পত্রিকার যথেষ্ট আবেদন রয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়ে আসে **সংবাদপত্র**। সাম্প্রতিক কাল সম্পর্কে সচেতন হওয়ার পক্ষে এরচেয়ে বড় পাথেয় আর নেই। তাছাড়া বিশেষ বিশেষ কারণে (যেমন, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস) সংবাদপত্র সমূহের বিশেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এসব সংস্করণে অনেক অমূল্য ঐতিহাসিক রচনা প্রকাশিত হয়।

সংবাদপত্র

পঞ্চম পর্যায়ে হ'ল **বিভিন্ন ভ্রমণ কাহিনী**। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাস রচনার এক উল্লেখযোগ্য উপাদান হ'ল দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পরিব্রাজকের ভ্রমণ কাহিনী। সাধারণভাবে ভ্রমণ কাহিনী পাঠও যে বিশেষ সুখকর তা সহজেই অনুমেয়।

যাই হোক, প্রকৃত ঐতিহাসিক মানসিকতা গঠনেই সমধর্মী পুস্তক পাঠের সবচেয়ে বড় অবদান।

॥ অনুবন্ধ ॥

॥ Correlation ॥

বহুকাল আগেই এই তথ্য স্বীকৃতি পেয়েছে যে জ্ঞান যেমন অখণ্ড তার কোন বিভাজন চলে না তেমনি শিক্ষাও হবে এক সুসংহত, সুসংঘবদ্ধ ব্যবস্থাপনা। শিশুমনকে তাই বিভিন্ন বিষয়ক তথ্যের এক সংকলন বলে বিবেচনা করা ঠিক হবে না। অতএব বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে আপাতঃ বিরোধের মধ্যেও অন্তঃসলিলা যে ঐক্যের স্রোতটি বহমান তাকেই প্রাধান্য দিতে হবে, তার

প্রণালীর উৎস

মধ্যেই স্বাভাবিক গতিবেগ সঞ্চার করতে হবে। এই বিশ্বাস থেকেই এসেছে অনুবন্ধ প্রণালীর– একটি বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে ইতিহাস একটি অসাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন বিষয়। ফিরদৌসী বলেছেন, Pcetry points what history describes, "লর্ড চ্যাথাম একদা বলেছেন," I have learnt all my English history from the plays of Shakespear." ১৫৩১ সালেই Vives ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন এমন ঐশ্চর্য "which gives birth or nourishes, develops and cultivates all arts." তিনি বলেছেন, ইতিহাস থেকেই জন্ম হয়েছে চিকিৎসা শাস্ত্রের, নীতি বিজ্ঞানের, আইন-শাস্ত্রের, ধর্মতত্ত্বের। জিলার ও তাঁর অনুগামীরাও এই মতেরই সমর্থক। অধ্যাপক জন্‌সনও বলেছেন," History with or without the name certainly has been and is a back ground for other social sciences ট্রেভিলিয়ান বলেছেন, "History is not a subject at all but a house in which all subjects dwell." মোট কথা হ'ল, যে কোন সমাজ বিজ্ঞানের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশে ইতিহাস এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে।

ইতিহাসে অনুবন্ধন সম্পর্কে বিভিন্ন মত

॥ ইতিহাস ও সাহিত্য ॥

ইতিহাস ও সাহিত্য উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক প্রায় অচ্ছেদ্য। প্রকৃতপক্ষে, সাহিত্যের সৃষ্টিই তো ঐতিহাসিক পারিপার্শ্বিকতা থেকে সাম্প্রতিক পরিমণ্ডল থেকে। আবার অন্যদিকে প্রাচীন সম্পর্কিত আবিষ্কৃত তথ্যের যে প্রকাশ ভঙ্গিমা তাই তো হ'ল সাহিত্য। কিন্তু ইতিহাস চর্চায় বৈজ্ঞানিক প্রবণতা আসবার পর থেকেই এই সম্পর্কে যেন চিড় খেতে থাকে। আর এই ফাটল সৃষ্টি হবার পর থেকেই ইতিহাসও সাহিত্যের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য নতুন উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে।

এই বাস্তব পৃথিবীতে মানুষের যাবতীয় কার্যাবলীই হ'ল ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়। আর সাহিত্য হ'ল মানুষের মনোজগতে যাবতীয় ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার বিবরণী। আর তাই যদি হয়, তাহলে একের অনুপস্থিতিতে অপরটি অনুসরণ করা যাবে কি করে? বরং ইতিহাস ও সাহিত্য সম্মিলিত হলেই মানুষের যে কোন কাজের একটি সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তাই মানুষের নিত্য নতুন কর্মোদ্যোগের ফলে যেমন ইতিহাসের শেষ নেই, তেমনি মানুষের চিন্তাজগতের দিগন্ত নেই বলে সাহিত্যও অন্তহীন।

পারস্পরিক সম্পর্ক

আবার অন্যদিকে ইতিহাসের বিষয়বস্তু যদি সাহিত্যগুণ বর্জিত হয় তাহলে তা আর ইতিহাস থাকে না, তা হয়ে দাঁড়ায় নীরস ঘটনাপঞ্জী মাত্র। ইতিহাস রচনাতেও সমৃদ্ধ কল্পনা শক্তি একান্তই অপরিহার্য। তাছাড়া সাহিত্যের মধ্য দিয়ে যে বিভিন্ন সময়ের সমাজ-জীবনের প্রতিফলন ঘটে, তাও অনস্বীকার্য।

ইতিহাস ও সাহিত্যের পারস্পরিক সম্পর্কটি জন্সন বিশেষ গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর মতে ইতিহাসই হ'ল সাহিত্যের উৎস, ইতিহাসের মধ্য থেকেই সাহিত্য তার অনুপ্রেরণা খুঁজে পায়। আবার সাহিত্যই ইতিহাসকে জানিয়ে দেয় বিভিন্ন যুগে মানুষের রুচিবোধ, নীতিবোধ ও বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচয়। সাহিত্যের মধ্য থেকেই ইতিহাস বিভিন্ন যুগে মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপটি উপলব্ধি করতে পারে।

জনসনের মত

তাই যথাযথ ইতিহাস চর্চার জন্য সাহিত্যের সহযোগিতা সর্বদাই বঞ্চিত। এইজন্যই সুনির্বাচিত ঐতিহাসিক উপন্যাস, আত্মজীবনী প্রভৃতি সাহিত্য সৃষ্টি ইতিহাস চর্চায় ব্যবহৃত হয়। সুতরাং "without the knowledge of literature and its appreciation, a history teacher is likely to become the monster of sheer information."

।। ইতিহাস ও ভূগোল ।।

ইতিহাস ও ভূগোলের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্দেশ করতে গিয়ে দার্শনিক কান্ট বলেছেন, "The description according to time is history that according to space is geography." সময়ানুক্রম অনুসারে বিভিন্ন ঘটনার বিবর্তনই হ'ল ইতিহাস। আর কোন একটি স্থানের প্রাকৃতিক বিবর্তনই হ'ল ভূগোল। ইতিহাসের বিষয়বস্তু হ'ল, মানুষ ও তার বিচিত্র কার্যকলাপ। আর ভূগোলের বিষয়বস্তু হ'ল, প্রাকৃতিক জগৎ ও তার বিচিত্র প্রতিক্রিয়া।

কিন্তু উভয়ের মিলনের একটি ক্ষেত্রও বিদ্যমান। সেই ক্ষেত্রটি হ'ল, কখনো কোন মানুষ বা দেশের ইতিহাস সঠিকভাবে অনুসরণ করা যায় না সেই মানুষ বা দেশের পারিপার্শ্বিকতাকে বাদ দিয়ে আর এই পারিপার্শ্বিকতাই হ'ল ভূগোল। আবার ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কোন ভৌগোলিক পরিমণ্ডল স্পষ্ট অনুভূত হয় না।

বহু ক্ষেত্রেই ঐতিহাসিককে তার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে সাহায্য নিতে হয়। তাই বলা হয়, "If geography without History seemeth a carcass without motion, so History without geography wandreth as a vagrant without a certain habitation." কারণ কোন একটি ঘটনা কেন ঘটলো এবং ঐ নির্দিষ্ট সময়েই ঘটলো কেন—শুধু এটুকুই একজন ঐতিহাসিকের জানলে চলে না, তাকে এটাও জানতে হবে ঘটনাটি কোথায় ঘটলো এবং ঐস্থানেই ঘটলো কেন। এই শেষোক্ত প্রশ্ন দুটোর জবাবই হ'ল ভূগোল।

পারস্পরিক সম্পর্ক

যে কোন দেশের ইতিহাসের পৃষ্ঠা উল্টালেই দেখা যাবে ভূগোলের প্রভাব কতটা ব্যাপক ও বিস্তৃত। পৃথিবীর প্রাচীন সভ্যতা-সমূহের বিকাশ যে নদী তীরবর্তী অঞ্চলে হয়েছিল ততো ভৌগোলিক পরিমণ্ডলেরই ফলশ্রুতি। ভারতের ইতিহাসে হিমালয় পর্বতমালার যে অপরিমেয় প্রভাব তাতো

ভারতের উদাহরণ

সর্বজনবিদিত। পানিকর বলেছেন, "There are no mountain ranges anywhere in the world which have contributed so much to shape the life of a country as the Himalayas have in respect of India." ভারতের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্ম, সাহিত্য সকলক্ষেত্রেই এই পর্বতমালার প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। এবং ভারতের ইতিহাসের যে মূল কথা 'বিভেদের মধ্যে ঐক্য' তাও তো এই ভৌগোলিক অবস্থিতির পরিণতি। হুমায়ুন কবির বলেছেন, "Vastness of Indian lands, the great variety in landscape, climate and conditions of life prepared in the mind a readiness to accept difference." শুধু তাই নয়। হুমায়ুন কবির আরও বলেছেন, "Physical features so sharply mark off India from the rest of Asia that attempts either to divide the country or to expand it beyond its natural frontiers have invariably failed."

তাই ইতিহাস অধ্যয়ন ও অধ্যাপনায় ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের দুরপনেয় প্রভাবকে কোনভাবেই অস্বীকার করা চলে না। সুতরাং শিক্ষকের কাজই হ'ল, উভয় বিষয়ের মধ্যে তুলনামূলক পর্যালোচনা করে ইতিহাসের মর্মকথাকে উদ্ঘাটনে সচেষ্ট হওয়া।

॥ ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান ॥

John Seeley বলেছেন, "History without Political Science has no fruit ; Political Science without History has not root" অধ্যাপক ফ্রিম্যানের মতে, ঘটে যাওয়া রাজনীতিই হ'ল ইতিহাস। জন্‌সনও একই কথার প্রতিধ্বনি করে বলেছেন, "The study of history in schools has been a study of the forms of the Government, of change in Government and of action in the Government"

রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু হ'ল নাগরিক মানুষের কর্ম প্রণালী। সমাজ-জীবনে সুস্থতা স্থাপনে যা কিছু মানুষের করণীয় তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এক্তিয়ারভুক্ত। আর দিগন্ত বিস্তৃত ইতিহাসের যে অবাধ বিচরণক্ষেত্র তারই এক খণ্ডাংশ রাষ্ট্র বিজ্ঞানের বিষয়-বস্তু। তাই ১৮৯০ সালে আমেরিকার Committee of Seven সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করে বলেছিলেন, "Much time will be saved and better results will be obtained if history and civil government be studied together, as one subject rather than two distinct subjects." জনসনেরও অভিমত হ'ল ইতিহাসকে বাদ দিয়ে কখনো সত্যিকারের রাষ্ট্র বিজ্ঞানের অধ্যয়ন সম্ভব নয়। কারণ যে কোন দেশের বর্তমান প্রশাসনিক কাঠামোকে বুঝতে গেলে তার অতীত প্রেক্ষাপটকে বিচার করতে হবেই। তাই "Political Science very often arrives at some conclusions in the light of history. History guides the actions and foundations of the government.

পারস্পরিক সম্পর্ক

॥ ইতিহাস ও হস্তশিল্প ॥

ইতিহাস হ'ল অতীত সংক্রান্ত বিষয়, যে অতীতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা কোন মতেই সম্ভব নয়। কিন্তু সম্ভব হতে পারে যা, তা হ'ল অতীতের প্রতিচ্ছবি বা প্রতিমূর্তি নির্মাণ। এই যে অতীতের নবনির্মাণ সেই কাজে হস্তশিল্প বিশেষভাবে সাহায্যকারী আর এখানটাতেই ইতিহাসের সঙ্গে হস্তশিল্পের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। হস্তশিল্পে পারদর্শিতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থী নিজেই ইতিহাসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন চার্ট, চিত্র, মডেল ইত্যাদি তৈরী করতে পারবে এবং এসব কাজ করতে করতেই তার কাছে ইতিহাস জীবন্ত হয়ে উঠবে, সে ক্রমশঃ ইতিহাসের নিবিড় সান্নিধ্যের উষ্ণ উত্তাপ অনুভব করবে।

ইতিহাসে হস্তশিল্পের স্থান

এছাড়াও আছে অন্যান্য দিক। বুদ্ধি বৃত্তি দিয়ে যে জ্ঞান অর্জিত হয় প্রকৃত কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়ে সেই জ্ঞান অধিকতর পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। এটাও ইতিহাসের সঙ্গে হস্তশিল্পের অনুবন্ধনের একটি বিশেষ সুবিধে। তারপর বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সহজাত যে সৃজনমূলক প্রবৃত্তি রয়েছে তাকেও পরিতৃপ্ত করবার, চরিতার্থ করবার সুযোগ হস্তশিল্প নিপুণ হাতে সৃষ্টি করে দিতে পারে। তাই অন্ততঃ বিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ইতিহাস চর্চায় হস্তশিল্পের ভূমিকা অগ্রাহ্য করবার মত নয়।

॥ ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ ॥

॥ Excursion ॥

ইতিহাসকে যদি সমস্ত বাস্তব অর্থে জীবন্ত করে তুলতেই হয় তবে প্রকৃষ্টতম পন্থা হ'ল ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ভ্রমণ করা। এই স্থানের উষ্ণ স্পর্শ শিক্ষার্থীকে উদ্বেলিত করে, ইতিহাস তখন আর কেবলমাত্র পাঠ্য পুস্তকে লিখিত কতকগুলি কল্পকাহিনীতে সীমায়িত থাকে না, ইতিহাস মুখর হয়ে ওঠে আমাদের অতি পরিচিত পারিপার্শ্বিকতার মত। ঐতিহাসিক স্থান ভ্রমণ কিছু আবেগ সৃষ্টিই করেই স্তব্ধ হয় না, বরং এই ভ্রমণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হয় বিভিন্ন যুগের শিল্পকলাকে উপলব্ধি করার সুযোগ পায়। সর্বোপরি গতানুগতিক একঘেঁয়ে শ্রেণী-পাঠদান ব্যবস্থার পরিবর্তে ভ্রমণ হ'ল একটি বিশেষ চিত্তাকর্ষক ব্যতিক্রম।

গুরুত্ব

॥ ভ্রমণের প্রকারভেদ ॥

এই ভ্রমণসূচী বিভিন্নভাবে প্রণয়ন করা যেতে পারে। যেমনঃ—

(এক) বিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ ঐতিহাসিক স্থান সমূহ ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।
(দুই) নিজ নিজ রাজ্যের অন্তর্গত বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা।
(তিন) বিখ্যাত ঐতিহাসিক স্থান সমূহে দীর্ঘ স্থায়ী ভ্রমণের ব্যবস্থা করা।

॥ ভ্রমণ-পরিকল্পনার মানদণ্ড ॥

(এক) ভ্রমণের পরিকল্পনা যেন পাঠ্য-বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত হয়।

(দুই) কোন একটি ভ্রমণ সূচী তখনই গ্রহণ করা যাবে যখন অন্য কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করেও ঈপ্সিত লক্ষ্য পূর্ণ করা সম্ভব হয় না এবং ভ্রমণ সেক্ষেত্রে একান্তই অপরিহার্য।

(তিন) দলবদ্ধ ভ্রমণ সূচী প্রয়োজনীয় উদ্দেশ্য পূরণে সহায়ক হবে।

(চার) স্বল্প সময়ে দীর্ঘ ভ্রমণ সূচী গ্রহণ করা হবে না।

(পাঁচ) ভ্রমণ ব্যয়বহুল হবে না।

(ছয়) বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবক মণ্ডলী দ্বারা ভ্রমণ সূচী অনুমোদিত হবে।

॥ ভ্রমণসূচী সম্পর্কে কয়েকটি কথা ॥

প্রথমতঃ বৎসরের প্রথমেই শিক্ষক পাঠ্যক্রম পর্যালোচনা করে স্থির করবেন, কোন্ প্রসঙ্গে ভ্রমণসূচী গ্রহণ করবার প্রয়োজন রয়েছে। তারপর তিনি সেই অনুসারে একটি পরিকল্পনা তৈরী করবেন।

শিক্ষার্থীদের পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত করা

দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা রূপায়িত করবার আগে শিক্ষার্থীদের সমগ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে অবহিত হবার সুযোগ দিতে হবে। কিভাবে ঐতিহাসিক স্থান সমূহ দেখতে হবে, দেখার মধ্য দিয়ে কি কি বিষয় কেমন ভাবে বিচার করতে হবে এসব বিষয়ে শিক্ষার্থীদের পূর্ব প্রস্তুতি একান্তই আবশ্যক।

তৃতীয়তঃ পরিকল্পনাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে রূপায়িত করার জন্য দলের সবাইকে দৃঢ় হতে হবে। তবেই ভ্রমণসূচী সাফল্য লাভ করতে পারে।

চতুর্থতঃ ভ্রমণ শেষে ভ্রমণের মধ্য দিয়ে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে কিভাবে পাঠ্য বিষয়ের প্রয়োজনে প্রয়োগ করা যায় সে সম্পর্কে এক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে।

পঞ্চমতঃ প্রত্যেক ভ্রমণ সূচীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ রচনা করতে হবে এবং তা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কারণ এসব বিবরণ পরবর্তীকালে ভ্রমণ সূচী প্রণয়নে বিশেষ সাহায্যকারী হবে।

সপ্তম অধ্যায়

ইতিহাসে সময় জ্ঞান

॥ বিষয় সংকেত ॥

ভুমিকা—সময় চেতনার সংজ্ঞা—সময় চেতনা জাগ্রত করার বিভিন্ন উপায়।

"*The Conception of time, pregnant with life and action is very important to history.*"

V. C. Ghate

॥ ভূমিকা ॥

ইতিহাসের বিষয়বস্তু সংগৃহীত হয় দ্বিমুখী প্রশ্নকে ভিত্তি করে ঘটনাটি কোথায় ঘটলো এবং কখন ঘটলো। যতক্ষণ পর্যন্ত না এই দুই প্রশ্ন মীমাংসিত হয়, ততক্ষণ ইতিহাস নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠে না। এখন কোথায় ঘটলো—এই প্রশ্নকে আমরা বলছি স্থান-চেতনা আর কখন্ ঘটলো এই প্রশ্নেরই আর এক নাম সময় চেতনা। আমরা তো বহুবারই বলেছি, নিরবচ্ছিন্ন চল-মানতাই হ'ল ইতিহাস। এই যে চলমানতা, তাকে সুনিশ্চিত ও সুনির্দিষ্ট করে বুঝাবার জন্যই প্রয়োজন সময় চেতনার। তাইতো বলা হয়, ভূগোল হ'ল স্থানের প্রেক্ষাপটে মানুষের পরিচয় আর ইতিহাস হ'ল সময়ের পটভূমিকায় মানুষের পরিচয়। এ কারণেই ইতিহাস চর্চায় সময় চেতনার অপরিহার্যতা এত বেশী।

॥ সময় ও চেতনার সংজ্ঞা ॥

কিন্তু সময় চেতনা বলতে আমরা কি বুঝি? প্রকৃতপক্ষে সময় হ'ল এক বিমূর্ত ধারণা। দার্শনিকেরা সময়কে এক অর্থহীন 'মোহ' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু সময় সম্পর্কে কোন বোধ কখনো কারো মধ্যে তৈরী করে দেওয়া যায় না, এটা এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত বোধ যা স্বাভাবিকভাবে মানুষের মনে জাগ্রত হয়। স্বভাবতঃই এ কারণে সময়-চেতনা নিয়ে রয়েছে পারস্পরিক মতানৈক্য। এমনকি সময় সম্পর্কে সকলের ধারণাও অভিন্ন নয়।

ঐতিহাসিক সময়

এ তো গেল ব্যাপক বা বৃহৎ অর্থে সময়ের ব্যাখ্যা। কিন্তু ইতিহাসে সময়ের ব্যাখ্যা কি? একদল বললেন, এই যে নিয়তই ধাবমান কাল, সেখানে মানুষের জীবন বা সভ্যতার স্বাক্ষর রয়েছে যে অংশ জুড়ে, তাই হ'ল ইতিহাসের সময়। আর এক দল বলেন, ধাবমান কালের যে অংশের সুস্পষ্ট পরিচয় আমাদের জানা, তাহাই হ'ল ইতিহাসের সময়। কিন্তু

এইমত সম্পর্কে বক্তব্য হ'ল, যেখানে ইতিহাসের শেষ কথাটি কখনোই আমাদের জানা সম্ভব নয়, বরং ক্রমাগত নিত্য নতুন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ইতিহাস নিয়মিতই সমৃদ্ধ হয়ে চলেছে, সেখানে ইতিহাসের সময়কে কোন সীমাবদ্ধতায় নিয়ে আসা কোনমতেই সম্ভব নয়, উচিতও নয়। আবার বিচ্ছিন্নভাবে সংগৃহীত তথ্যাবলীকেও কোন ঐতিহাসিক সময় দ্বারা চিহ্নিত করা চলে না। কেননা সেখানে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে না। এ কারণেই অনেকে প্রাগৈতিহাসিক যুগকে ইতিহাসের সময়-চেতনার আওতায় নিয়ে আসতে চান না। তাই তাঁদের মত হ'ল, **সেই সময় থেকেই ঐতিহাসিক সময়ের সূত্রপাত হ'ল যখন থেকে ঘটনাবলীর পূর্ণাঙ্গ বিবরণ আমাদের কাছে লভ্য।**

ইতিহাসের সময় চেতনার তিনটি দিক। তা হ'ল, কালের অন্তহীন গতিপথে একটি ঘটনাকে সংস্থাপিত করা বা Location, তারপর বিভিন্ন ঘটনাবলীর সঙ্গে এই ঘটনার দূর নির্ধারণ বা Distance এবং ঘটনাটির স্থায়িত্বকাল নিরূপণ বা Duration

সংস্থাপন

সংস্থাপন বা Location বলতে বুঝায়, এই যে নিরবধি বহমান কাল, তার কোন্ মুহূর্তে ঘটনাটি ঘটেছিল তা স্পষ্ট করা। যতক্ষণ পর্যন্ত এটা না করছি ততক্ষণ ঘটনাটির সঠিক অস্তিত্ব আমরা অনুভব করতে পারি না। তাই যখন বলি ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যু হয়েছিল তখন বহমান কালের একটি নির্দিষ্ট বিন্দুকেই চিহ্নিত করি।

দূরত্ব নির্ধারণ

কিন্তু এই চিহ্নিত করণ হলেও ঘটনাটির অস্তিত্ব সম্পর্কে সঠিক অনুভূতি আমাদের হয় না। কিন্তু আগে বা পরে সংঘটিত ঘটনাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত করে যদি বলা যায় যে ঐ ঘটনাটি এ সব ঘটনার এত বৎসর আগে বা পরে ঘটেছিল তাহলে ব্যাপারটা অধিকতর স্বচ্ছ হয়ে যায়। একেই আমরা বলছি ঘটনার দূরত্ব নির্ধারণ বা Distance. যেমন একটি উদাহরণ নেওয়া যাক্। সাধারণভাবে ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ আমাদের মনে বিশেষকোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে না। কিন্তু যখন বলবো ১৭০৭ সালে ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের ধ্বংস সূচিত হবার ৫০ বছর পর ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে ভারতে ইংরেজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'ল অথবা ১৭৫৭ সালের ঠিক ১০০ বছর পর ১৮৫৭ সালে ভারতীয়গণ ইংরেজ শাসন উচ্ছেদে প্রথম প্রয়াস নিয়েছিল, তখনই ১৭৫৭ সালের ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখানেই হ'ল ঘটনাটির দূরত্ব নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা।

ঘটনার ব্যাপ্তি

এর পরের কাজ হ'ল ঘটনাটির ঘটনাকাল নির্ধারণ বা Duration ঘটনার ব্যাপ্তি সম্পর্কে সঠিক ধারণাও অত্যন্ত জরুরী। যখন আমরা বিচার করি মাত্র পাঁচ বছরের মধ্যে শেরশাহ নিজেকে দিল্লীতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং এই পাঁচ বছরের মধ্যেই তিনি এক ঐতিহাসিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন তখনই শেরশাহের কৃতিত্ব কতখানি তা আমাদের কাছে বহুলাংশে স্পষ্ট হয়ে যায়।

তাই ঐতিহাসিক সময় বলতে এই তিনটি উপাদানকে বিশেষ যত্নের সঙ্গে বিচার করতে হবে। নতুবা বিচ্ছিন্ন কোন সন তারিখের নিজস্ব কোন মূল্য থাকে না।

॥ সময়-চেতনা জাগ্রত করার বিভিন্ন উপায় ॥

এমন অভিযোগ তো প্রায়শঃই শোনা যায়, ইতিহাস বলতেই বুঝায় কিছু সন তারিখের গোলক ধাঁধাঁ, যার ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা প্রায় দুঃসাধ্য। এই অভিযোগের মধ্যে অতিশয়োক্তি নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা হলেও ইতিহাস কখনো সন-তারিখ বর্জিত হতে পারে না এবং সেই কারণেই আমাদের এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যেন আমরা সহজেই প্রয়োজনীয় সন তারিখগুলো মনে রাখতে পারি। পণ্ডিত ব্যক্তিগণ এই সঙ্গে নানা পথের নির্দেশ দিয়েছেন। আমরা এইবার সেইসব পন্থাগুলো নিয়ে আলোচনা করবো।

॥ সময় তালিকা ॥

॥ Time Chart ॥

সময়ানুক্রম অনুসারে বিভিন্ন রাজবংশের পরিচয় বা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হতে পারে সময় তালিকার সাহায্যে। সময় তালিকা নির্মাণ কালে আমাদের কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে :—

প্রথমতঃ সময় তালিকার মধ্য দিয়ে যেন **বিভিন্ন ঘটনাবলীর পারস্পরিক সম্পর্কটি পরিস্ফুট হয়।**

দ্বিতীয়তঃ **সন-তারিখ ইত্যাদি নির্বাচন কালে যথেষ্ট ইতিহাস-ভিত্তিক চিন্তা-চেতনার পরিচয় দিতে হবে।**

তৃতীয়তঃ যে স্কেলে সময় তালিকাটি নির্মাণ করা হবে **তার মাপ-ঝোঁক নির্ভুল** হওয়া উচিত।

চতুর্থতঃ **সময়-তালিকাটি যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক হওয়া উচিত।**

সময় তালিকা দুভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন, কোন একটি নির্দিষ্ট কালে বিভিন্ন ঘটনার পরিচয় আর কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরে বিভিন্ন ঘটনার পরিচয় তাই প্রয়োজন হয় সময় রেখা ও সময় লেখচিত্রের।

॥ সময় রেখা ॥

॥ Time Line ॥

সময়রেখা দু রকমের—(ক) উপর থেকে নীচে লম্ব রেখা (Vertical Line)। এখানে উপরের দিককে বলা হবে অতীত। তারপর নীচের দিকে ক্রমশঃ বর্তমানের দিকে এগিকে আসা হবে। স্বল্প বা দীর্ঘ উভয় সময়কেই এই রেখায় রূপায়িত করা যায়। (খ) বাম থেকে ডানে আনুভূমিক রেখা (horizontal line)। এখানে বাম প্রান্তকে ধরা হবে অতীত এবং তারপর

বিভিন্ন রূপ

ডানদিকে ক্রমশঃ বর্তমানের দিকে অগ্রসর হওয়া হবে। এক্ষেত্রে দীর্ঘকালকে প্রতিফলিত করা সুবিধাজনক।

আবার উভয় রেখার সাহায্যে সমসাময়িক দুটি ঘটনা বা দুটো দেশের তুলনামূলক ইতিহাসকেও রূপায়িত করা যায়।

তবে সময় রেখা অঙ্কন কালে দুটো দিকে নজর দিতে হবে। প্রথমতঃ **সন-তারিখ হবে সুনির্বাচিত** এবং যতকম হয় ততই ভাল। দ্বিতীয়তঃ **সময় রেখা যেন খুব ছোট আকারের না হয়।**

॥ সময় লেখচিত্র ॥

॥ Time Graph ॥

অঙ্কন পদ্ধতি

সময় লেখচিত্রের মধ্যে দিয়ে ইতিহাসের তুলনামূলক পর্যালোচন সুন্দরভাবে প্রতিফলিত হয়। এখানে লেখচিত্রের আনুভূমিক রেখাকে 'x' ধরে তাতে সময় নির্দেশিত হবে। আর লম্বমান রেখাকে 'y' ধরে তাতে বিভিন্ন ঘটনাবলী নির্দেশ করা হবে। ভারতবর্ষের ইতিহাসের পক্ষে সময় লেখচিত্রের উপযোগিতা অপরিসীম। কেননা ভাব-ভাষা-জাতি ধর্ম-সংস্কৃতিগত কতই না বৈচিত্র্য রয়েছে।

॥ সময় চেতনা সম্পর্কীত কয়েকটি তথ্য ॥

বিদ্যালয় স্তরে লক্ষ্য রাখতে হবে যে সময়কে বুঝাবার জন্য যে সব পরিভাষা ব্যবহার করা হয় তার সঙ্গে যেন শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটে। শুধু পরিচিতি হলেই চলবে না, শিক্ষার্থীগণ যেন এইসব পরিভাষা সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে। শিক্ষার্থীদেরও সময় সম্পর্কে আগ্রহশীল করে তোলবার জন্য শিক্ষক সর্বদাই তাদের প্রতি ঘটনা কখন ঘটেছিল এমন প্রশ্ন করবেন। তিনি নিয়মিত সময়রেখা, সময় তালিকা ইত্যাদি ব্যবহার করবেন। সর্বক্ষণই মনে রাখতে হবে কেবলমাত্র মুখস্থ করে ইতিহাসের বিপুল পরিমান সন-তারিখ কিছুতেই মনে রাখা সম্ভব নয়।

অষ্টম অধ্যায়

ইতিহাসের শিক্ষক

॥ বিষয়-সংকেত ॥

শিক্ষকের ভূমিকা—শিক্ষকের আবশ্যিক গুণাবলী—ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষণ—ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি—ইতিহাস শিক্ষাদানে ব্যর্থতার কারণ—প্রতিকারের উপায়।

"*The teacher must have the power of realising the dead past in the living present, must, in fact, have a touch of imagination as well as a vastly large amount of positive knowledge.*"

—*R. Boyce.*

"*No impossibilities are demanded of the history teacher. But we do expect him to know his job.*"

—*V. D. Ghate.*

॥ শিক্ষকের ভূমিকা ॥

ইতিহাস শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসের উপজীব্য বিষয়ই হ'ল মানুষ। আর সমগ্র মানব জীবনের সর্বাধিক পবিত্র, স্বাভাবিক ও জটিলতা বর্জিত অধ্যায়ই হ'ল শৈশব জীবন। শিশু অর্থই সংকীর্ণতা মুক্ত, সহজেই উচ্ছ্বসিত, দীর্ঘ অভিজ্ঞতার জটিলতা মুক্ত আর তাই হতাশ মনোভাব বিবর্জিত। এটাই শিক্ষকের সুবিধে। নরম মাটির মত নমনীয় কিছু মানব-মন নিয়ে তার কাজ-কারবার। ফলে নিজস্ব উদ্যোগ, প্রস্তুতি ও সামর্থ্য থাকলে তিনি এই মনগুলোকে যে কোন আকার দিতে পারেন, যেমন কুম্ভকারের নিপুণ হাতের দক্ষতায় তার চাকায় নানা আকারের মৃৎপাত্র প্রস্তুত হয়।

এ কাজের যোগ্য হবার জন্য তাই শিক্ষককে যেমন কতগুলি গুণাবলী অর্জন করতে হয় তেমনি তাকে কোন কোন বিষয়ে পেশাগত শিক্ষণ প্রাপ্ত হতে হয়।

॥ শিক্ষকের আবশ্যিক গুণাবলী ॥

যে ব্যাপক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে অধুনা ইতিহাসের পাঠ্যক্রম রচিত হয় তাকে বাস্তবে সার্থক করে তুলতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের এক ভিন্নতর ভূমিকা। আজকের ইতিহাস

শিক্ষককে হতে হবে দুর্বোধ্য তথ্যের ব্যাখ্যাকার, শিক্ষার্থীর সহযোগী আবিষ্কারক এবং বিষয়-সম্পর্কে যথেষ্ট দক্ষ। আজকের দিনে ইতিহাস নিশ্চয়ই কোন উদ্দেশ্যমূলক ইতিহাস হবে না, বরং সম্পূর্ণ নৈর্বক্তিক ভাবে বিজ্ঞান-ভিত্তিক ইতিহাস চর্চাই আজ একান্তই জরুরী।

বিষয়গত দক্ষতা

তাই প্রয়োজন শিক্ষকের কতকগুলি আবশ্যিক গুণাবলী। এই গুণাবলীতাকে তার দায়িত্ব পালনে সাহায্যই করবে।

প্রথমতঃ আজ ইতিহাস-শিক্ষককে হতে হবে সত্যিকারের মানব দরদী। কোন সংস্কার নয়, কোন অন্ধত্ব নয়, কোন সংকীর্ণতা নয়, সম্পূর্ণ খোলা মন নিয়ে তিনি এই পৃথিবীকে দেখবেন এবং সকল মানুষের জন্যই এক গভীর সমবেদনা-বোধে নিজেকে অভিষিক্ত করবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি হবেন বৃহত্তর মানব-উত্তরাধিকারের বার্তা বাহক। এ কাজে তিনি সফল হবেন যদি তিনি ইতিহাস নিয়ে গবেষণার কাজে কিছুটা অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারেন। এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে কেমন করে ইতিহাসকে জীবন্ত করে তোলা যায় সে পথের সন্ধান দেবে।

মানুষের প্রতি দরদ

দ্বিতীয়তঃ স্থানীয় ইতিহাস ও পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন হবেন আজকের ইতিহাস শিক্ষক। স্থানীয় ইতিহাস চর্চার সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল, এখানে ইতিহাস কখনো অদৃষ্ট বা অশ্রুত কতকগুলি কল্পিত কাহিনী আর থাকে না। তাছাড়া ইতিহাসের বাস্তব উপযোগিতার দিকটিও স্পষ্ট হয়ে যায় স্থানীয় ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে।

তৃতীয়তঃ ইতিহাসের শিক্ষক হবেন সর্বদাই সত্য-সন্ধানী। তাই তাকে জানতে হবে, কেমন করে ঐতিহাসিক তথ্যাবলী নিয়ে বিচার বিশ্লেষণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে বহু কিছু তার জানার বাইরেও থেকে যেতে পারে এবং কোন বিষয় সম্পর্কে তার অজ্ঞতা স্বীকারে তিনি কখনো কুণ্ঠাবোধ করবেন না। বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিকের মানসিকতা তাকে অর্জন করতে হবে এবং বৈজ্ঞানিকের পন্থা তাকে অনুসরণ করতে হবে। তাই তিনি তার কোন নিজস্ব মতবাদ বা পক্ষপাতিত্ব দিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করবেন না।" "He should try to show the truth, the whole truth and nothing but the truth." আবার সত্যও যাতে সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত হতে পারে সে কারণে ইতিহাস-শিক্ষককে সাহিত্য-গুণ সম্পন্ন হতে হবে। প্রকৃতপক্ষে ইতিহাসে বিষয়-বস্তু ব্যাখ্যা করা এক বিরাট সমস্যা এবং শিক্ষককে সাফল্যের সঙ্গে এই সমস্যায় উত্তীর্ণ হতে হবে।

সত্যানুসন্ধানী

চতুর্থতঃ **ইতিহাসের শিক্ষক নিশ্চয়ই পরিপূর্ণভাবে আত্মবিশ্বাসী হবেন।** এই বিশ্বাস থেকেই আসবে তাঁর বিষয় সম্পর্কে নিষ্ঠা, শিক্ষার্থী সম্পর্কে অনুরাগ। কিন্তু এই আত্ম-বিশ্বাস তাঁকে কোন সঙ্কীর্ণতায় সঙ্কুচিত করবে না। আত্মবিশ্বাস তাকে দাম্ভিক করে তুলবে না, পরমত সম্পর্কে অসহিষ্ণু করবে না।

আত্মবিশ্বাস

পঞ্চমতঃ **ইতিহাসের শিক্ষক আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী হবেন।** ইতিহাস সম্পর্কে বহু কথিত অভিযোগ হ'ল, এটি এমন একটি বিষয় যেখানে প্রাণের উত্তাপ নেই। এই অভিযোগ সর্বাংশে খণ্ডিত হবে শিক্ষকের ব্যক্তিত্বের মাধ্যমে। তার ব্যক্তিত্বই ইতিহাসকে চিত্তাকর্ষক করে তুলবে, শিক্ষার্থীদের অনুরাগী করবে, শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ ক্রমশঃ বিষয়ের প্রতি সঞ্চারিত হবে। তাই শিক্ষককে ভাবতে হবে, জানতে হবে কি করে স্বকীয় দক্ষতায় ইতিহাস প্রাণের আবেগে উচ্ছল একটি বিষয়ে পরিণত হতে পারে।

আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব

ষষ্ঠতঃ ইতিহাসের শিক্ষক এই প্রয়োজনেই একজন উচ্চ স্তরের গল্প-বলিয়ে হবেন, একজন অভিনেতা হবেন। "To a master teacher, history is a drama and the people in it are the actors." তাই তিনি সুগঠিত দেহের ও সুকণ্ঠের অধিকারী হবেন, তিনি কল্পনা-বিলাসী হবেন, কিন্তু তার কল্পনা বল্গাহীন হবে না। তিনি নাটকীয়তা গুণের অধিকারী হবেন, কিন্তু তাঁর নাটকীয়তা বাস্তব-বর্জিত হবে না। তিনি রসবেত্তা হবেন, হাস্যরসের ব্যবহার জানবেন।

অভিনেতার গুণাবলী

"If to these and to a love of children he can add a sound academic and professional training, he will be able to make a rich and personal contribution to the true ends of teaching history."

॥ ইতিহাস শিক্ষকের শিক্ষণ ॥

শিক্ষাগত দিক থেকে ইতিহাসের শিক্ষক নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করবেন, এতো একেবারে প্রাথমিক কথা। তাছাড়া তিনি অবশ্যই সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধেও অবহিত থাকবেন। বর্তমানের প্রেক্ষাপটে যদি অতীতকে যাচাই করতে হয় তবে সমসাময়িকতা সম্পর্কে এই জ্ঞান অত্যন্ত জরুরী এবং কেমন করে সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহার হয় তাও তিনি জানবেন।

ইতিহাস শিক্ষক নিশ্চয়ই সমাজ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে পরিচিত হবেন। তাই তাকে জানতে হবে আধুনিক ভাষা সমূহ, দর্শনের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি বিষয়। "Without the knowledge of different social sciences, the history teacher is quite likely to perpetuate, unknowingly, outmoded social concepts, or uncritically repeat assumptions and theories that are in dispute."

ইতিহাস শিক্ষক সাধারণভাবে বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত হবেন। এরসঙ্গে কোন একটি বিশেষ সময়কে তিনি নিবিড়ভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা করবেন। এই অধ্যয়ন ও গবেষণা কাজের মধ্য দিয়ে তার যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হবে তা তিনি অন্যান্য সময়ের ইতিহাস চর্চাতেও প্রয়োগ করতে পারবেন।

ইতিহাস শিক্ষক রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও পৌরবিজ্ঞান সম্পর্কেও অবহিত হবেন। কারণ বিভিন্ন আধুনিক সমাজ সংগঠনের উৎপত্তিও সেই অতীতে। আর এইসব সংগঠনের স্বরূপ না জেনে আজকের পৃথিবীতে একজন যথার্থ নাগরিক হিসেবে নিজ দায়িত্ব পালন করাও কখনো সম্ভব নয়।

পদ্ধতিগত দক্ষতা অর্জন

এরপর ইতিহাস-শিক্ষককে ইতিহাস-শিক্ষণের বিভিন্ন পদ্ধতিতে যথেষ্ট পারদর্শীতা অর্জন করতে হবে। যেহেতু কোন একটি বিশেষ পদ্ধতিকে আমরা সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলে চিহ্নিত করতে পারছি না সেইহেতু শিক্ষক অবশ্যই সব পদ্ধতি প্রয়োগেই দক্ষতা অর্জন করবেন। তা ছাড়া পদ্ধতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সামর্থ, বয়স, যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়গুলি শিক্ষককে বিবেচনা করতে হবে এবং সেই অনুসারে তাঁকে উপযুক্ত পদ্ধতিটি নির্বাচন করতে হবে।

ইতিহাস শিক্ষাদান কালে শিক্ষককে কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্ক থাকতে হবে :

(এক) শিক্ষার্থী যেন ইতিহাস পাঠ করতে গিয়ে বিভিন্ন দেশের মানুষের সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারে।

(দুই) শিক্ষার্থী যেন একজন বিচক্ষণ নিরপেক্ষ সমালোচকের মত ইতিহাসের বিভিন্ন তথ্যকে বিচার করবার সামর্থ অর্জন করে। বিশেষ করে ইতিহাসের ক্ষেত্রে এই সামর্থ অর্জনের প্রয়োজন অপরিসীম।

(তিন) ইতিহাস যেহেতু ঐতিহাসিকের বিচার বিশ্লেষণ নির্ভর সেইহেতু ইতিহাসে মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ থাকা খুবই স্বাভাবিক। এইসব মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয় নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনাকালে শিক্ষককে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হয়। তিনি সর্বদাই সতর্ক থাকবেন যেন তার নিজস্ব মতবাদ দ্বারা শিক্ষার্থী কখনই প্রভাবিত না হয় এবং এই প্রভাব যেন শিক্ষার্থীর নিজস্ব বিচারশক্তি বিকাশে কখনোই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে।

(চার) পাঠদান কার্য আরম্ভ করার আগে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ রচনায় নৈপুণ্য প্রদর্শনের উপরও শিক্ষকের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে। সার্থক ইতিহাস শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে এই পরিবেশ রচনায় ইতিহাস-শিক্ষককে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

॥ ইতিহাস শিক্ষকের পেশাগত প্রস্তুতি ॥

সর্বাধুনিক আবিষ্কার সম্পর্কে সচেতনতা

নিত্য নতুন অনুসন্ধান ও গবেষণার ভিত্তিতে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত যে কোন সময়েই পরিবর্তিত হতে পারে। তাই পাঠ্যপুস্তকে লিখিত তথ্যকে কখনোই ইতিহাসের শেষ কথা বলে ইতিহাসের শিক্ষক গ্রহণ করবেন না। এ কারণেই প্রয়োজন হ'ল, তিনি নিত্য নতুন ঐতিহাসিক গবেষণা সম্পর্কে সর্বদাই সচেতন থাকবেন এবং এইসব গবেষণা লব্ধ ফলশ্রুতি দ্বারা তিনি ক্রমাগত নিজেকে সমৃদ্ধ করবেন। এ না হলে যে ইতিহাস আজ পরিত্যক্ত, যে

সিদ্ধান্ত আজ অগ্রাহ্য, তিনি তাই শ্রেণীকক্ষে পরিবেশন করবেন। আজ ভারতের কোন ইতিহাস শিক্ষক নিশ্চয়ই বলবেন না যে ভারতীয় সভ্যতার সূত্রপাত বৈদিক যুগ থেকে। তেমনি ভাবেই সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে, উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার নব জাগরণ সম্পর্কে, কিংবা স্বাধীনতা আন্দোলনে মুসলমানদের ভূমিকা সম্পর্কে, আধুনিক ঐতিহাসিকেরা যে সব নতুন তথ্য আবিষ্কার করেছেন তা জানতেই হবে আজকের ইতিহাস শিক্ষককে। এ কারণেই তিনি বিভিন্ন ইতিহাস আলোচনাচক্র, ওয়ার্কশপ বা রিফ্রেশার কোর্সে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করবেন।

নতুন পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন

শিক্ষাদান পদ্ধতি সম্পর্কেও একই কথা। সেই কোন মান্ধাতা আমলে শিক্ষণ শিক্ষালাভ কালে তিনি বিভিন্ন পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন করেছিলেন সেটা কখনোই তাঁর জানার শেষ সীমা হতে পারে না। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতি অহরহ কত পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলেছে তার সঙ্গে ইতিহাসের শিক্ষক নিজেকে অবশ্যই যুক্ত রাখবেন। এই দিক থেকে শিক্ষককে সর্বদাই সর্বাধুনিক করে গড়ে তোলার জন্য বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেও কতকগুলি দায়িত্ব পালন করতে হবে। যেমন:

(এক) প্রতি রাজ্যস্তরে যেন **ইতিহাস শিক্ষকদের নিয়ে সংগঠন** গড়ে তোলা যায় তার ব্যবস্থা করা।

(দুই) প্রতি বিদ্যালয়ে ইতিহাস সম্পর্কীত **বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা পুস্তক** ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে কেনার ব্যবস্থা করা।

(তিন) সমসাময়িক **বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাবলী সংরক্ষণের** ব্যবস্থা করা।

(চার) স্থানীয় বা জাতীয় স্তরে বিভিন্ন **ইতিহাস সংক্রান্ত আলোচনা-চক্রে** যেন শিক্ষকেরা যোগদান করতে পারেন তার ব্যবস্থা করা।

(পাঁচ) **নতুন নতুন শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে অনুশীলন করার** সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া।

(ছয়) **ঐতিহাসিক নিদর্শন বা স্থান পরিদর্শনের সুযোগ** যেন ইতিহাস শিক্ষকেরা পান তার ব্যবস্থা করা।

আলোচনা

ইতিহাস চর্চাকে সার্থক করে তুলতে ইতিহাস-শিক্ষকের দায়িত্ব সর্বাধিক সন্দেহ নেই। কিন্তু শিক্ষা-প্রশাসকদের দায়িত্বও কোন অংশে কম নয়। শিক্ষক নিশ্চয়ই স্বতঃস্ফূর্ত আপন মনের সমস্ত উদ্যোগ ও উদ্যমকে নিয়োগ করবেন ইতিহাস চর্চায়। কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে সেই উদ্যোগ যেন কখনো ঔদাসীন্যে স্তব্ধ হয়ে না যায়, সেই উদ্যম যেন কখনো অকারণ প্রতিবন্ধকতায় অঙ্কুরেই বিনষ্ট না হয়। তবেই শিক্ষক ও শিক্ষা-প্রশাসকের যুক্ত উৎসাহে ক্রমশঃ নির্মিত হবে সার্থক ইতিহাস চর্চার সোপান-শ্রেণী।

॥ ইতিহাস শিক্ষাদানে ব্যর্থতার কারণ ॥

এই প্রসঙ্গেই আলোচিত হওয়া প্রয়োজন, ঐতিহাসিকদের নিরলস প্রয়াস সত্ত্বেও কোথাও আমাদের ব্যর্থতা অক্ষমতা এত প্রকট যে এমন অভিযোগ এখনো প্রায়ই শোনা যায়, ইতিহাস হ'ল একটি নিষ্প্রাণ একঘেঁয়ে বিষয়, হয়তো বা পাঠ্যক্রমে সংযোজিত একটি অর্থহীন বিষয়। অস্বীকার করার উপায় নেই উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলিত হবার সুযোগে দেখা গিয়েছে ইতিহাস শিক্ষার্থীদের কাছে আদৌ একটি জনপ্রিয় বিষয় নয়। এমন একটি পরিস্থিতি ইতিহাস-শিক্ষকের পক্ষে উৎসাহ-উদ্দীপক তো নয়ই, বরং যথেষ্টই অপ্রীতিকর, বিড়ম্বনার। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বহু প্রসঙ্গই এসে যেতে পারে। এখানে কেবল ইতিহাসের শিক্ষক হিসেবে আমরা আত্ম-সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'ব এবং আমাদেরই অক্ষমতার দিকগুলি আমরাই তুলে ধরবো।

উদ্দেশ্যহীনতা

আমাদের প্রথম ব্যর্থতা আমাদের শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যহীনতা। পাঠ্যক্রম-রচয়িতাগণ অবশ্য পাঠ্যক্রম-রচনা কালে একাধিক উদ্দেশ্য স্থির করে দিয়ে থাকেন। কিন্তু সেইসব উদ্দেশ্য এত বেশী উচ্চাকাঙ্ক্ষী, এত বেশী অতিশয়োক্তি দোষে দুষ্ট যে প্রকৃতপক্ষে ঐ সব উদ্দেশ্যকে কখনোই বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। স্বাভাবিকভাবে আমরা ইতিহাস শিক্ষকেরাও এমন পরিস্থিতিতে বুঝতে পারি না ঠিক কি কারণে আমরা নিয়মিত শ্রেণীকক্ষে যাই, ইতিহাসের বিভিন্ন প্রসঙ্গ নিয়ে নিয়মিত নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করি। কর্মের উদ্দেশ্যই যেখানে অস্বচ্ছ, সেখানে সাফল্য সুদূর পরাহত।

বিষয়গত জ্ঞানের অভাব

দ্বিতীয়তঃ আমরা শিক্ষকেরাও বিষয়গত দিক থেকে যথেষ্ট প্রস্তুত নই। প্রত্যহ কত নতুন নতুন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হচ্ছে, আলোচিত হচ্ছে, প্রমাণিত হচ্ছে। এই বিপুল তথ্যরাশির সব কিছুর সঙ্গেই ওয়াকিবহাল থাকা নিশ্চয়ই সম্ভব নয়। কিন্তু যেগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, ইতিহাস চিন্তা জগতে নতুন আলোকপাত করছে, সেগুলি জানা তো আমাদের পক্ষে একান্তই অপরিহার্য। অথচ আমরা তো তা করছি না বা করতে পারছি না।

বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা

তৃতীয়তঃ বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে বিশেষ করে ভূগোলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনার মধ্য দিয়ে ইতিহাস শিক্ষাদান আমরা কতজন করি? অথচ ইতিহাসের সঙ্গে ভূগোলের সম্পর্ক যে কত গভীর তা তো উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। অন্ততঃ এই মুহূর্তে ইতিহাসের যতটুকু বাস্তব ভিত্তি পরিদৃশ্যমান, তা তো হ'ল ভূগোলই। অন্যান্য উপকরণের ব্যবহার না হয় বাদই দেওয়া গেল, ইতিহাস শিক্ষাদান কেবলমাত্র সহজলভ্য মানচিত্রের ব্যবহারেও যে আমাদের কী গভীর অনীহা, ঔদাসীন্য তা কি কোন এক আত্ম-সমীক্ষার অচেতন মুহূর্তে আমাদেরই লজ্জা দেয় না?

চতুর্থতঃ **সময়-চেতনার বিকাশ ইতিহাসের অপরিহার্য অঙ্গ বিকাশের মধ্য দিয়ে যে ইতিহাস বহুলাংশে জীবন্ত বিশ্বস্ত হয়ে উঠতে পারে তাও আমরা জানি।** তবু শ্রেণী কক্ষে শিক্ষার্থীদের সময়-চেতনা যেন সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হয় সে সম্পর্কে আমরা নিজেরাই আদৌ সচেতন নই।

পঞ্চমতঃ **আমাদের হাতে ইতিহাস কতকগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনার সমষ্টিতে রূপান্তরিত হয়।** অর্থাৎ আমাদের ইতিহাস শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কেবলমাত্র কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই প্রাধান্য পায়। সেই ঘটনাগুলিকে কার্য-কারণ সূত্রে গ্রথিত করে কোন একটি চিন্তা বা চেতনার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা করা—এমনটি সাধারণভাবে অনুসৃত আমাদের পদ্ধতিতে কখনোই সম্ভব নয়।

ত্রুটিপূর্ণ ইতিহাস পাঠ

ষষ্ঠতঃ **আজকের** সময়ই হ'ল উপযোগ মূল্যায়নের (utility-value) সময়। যার কোন বাস্তব প্রয়োজন নেই তার সম্পর্কেই আমাদের অনাসক্তি। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইতিহাসকে একটি বাস্তব উপযোগিতাহীন বিষয় হিসেবে চিহ্নিত করার এটাই বড় কারণ। **কিন্তু বাস্তব অর্থেও ইতিহাস অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে যদি আমরা ইতিহাসকে শিক্ষার্থীদের পরিবেশের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারি।** এ পথেই অতীতের সঙ্গে বর্তমানের, পরিচিতির সঙ্গে অপরিচিতির সেতু বন্ধন হতে পারে। অথচ এ সম্পর্কে আমরা একেবারে নির্বিকার, উদাসীন। শুধু তাই নয়। আরও বেশী দুর্ভাগ্যের হ'ল, আমরা অনেকেই বিশ্বাস করি না যে ইতিহাসের সত্যিই কোন বাস্তব উপযোগিতা নেই।

বাস্তব উপযোগিতার প্রতি অবহেলা

যদি উপরোক্ত পরিস্থিতিকে আমরা কখনোই বাঞ্ছিত বলে মনে না করি, এবং এমন অবস্থার প্রতিকারে যদি আমরা আন্তরিকভাবে উৎসাহী হই, তবে অনতিবিলম্বে আমরা কতকগুলি কার্যকরী ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি।

প্রথমতঃ **তুলনামূলক পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে সর্বদাই আমাদের শ্রেণীকক্ষে ইতিহাস উপস্থাপন করতে হবে।** এই তুলনামূলক আলোচনার গভীরতা শ্রেণী অনুসারে নির্ধারিত হবে। যেমন নিম্নশ্রেণীতে স্থানীয় পটভূমিকা, উচ্চ শ্রেণীতে ব্যাপকতর পটভূমিকাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি। তুলনামূলক আলোচনা ইতিহাসকে জীবন্ত করে, শিক্ষার্থীদের অধিকতর কৌতূহলী করে তোলে, তাদের চিন্তাশীল করে তোলে, তাদের গবেষণায় উৎসাহী করে।

তুলনামূলক আলোচনা

দ্বিতীয়তঃ **ইতিহাস শিক্ষাদানে সর্বদাই কার্যকারণ সূত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।** কোন ঘটনা কেন ঘটলো, কেমন করে ঘটলো, ঘটনাটি ঘটার ফলাফলই বা কি হ'ল,—এই তিনটি প্রশ্নই ইতিহাসে অত্যন্ত জরুরী। এবং এই

তিনটি প্রশ্নেরই যথাযথ সমাধানের উপরই নির্ভর করে ইতিহাসের সার্বজনীন আবেদন।

তৃতীয়তঃ **শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তিকে উদ্দীপিত করে এমনভাবে ইতিহাস উপস্থাপন করতে হবে।** অন্ততঃ ইতিহাসের কিছু চিত্ত যেন শিক্ষার্থীর মনের গভীরে স্থায়ীভাবে অঙ্কিত হয়ে যায়, উপস্থাপনায় এমন সাফল্য অর্জন করতে হবে।

চতুর্থতঃ **অতীতকে যদি স্পর্শানুভবের মধ্যে নিয়ে আসতে হয় তবে সুনির্বাচিত চিত্রের ব্যবহার একান্তই অপরিহার্য।** মানচিত্রের ব্যবহার ইতিহাসকে নির্ভরযোগ্য করে তুলবে, আর চিত্রের ব্যবহার ইতিহাসকে করে তুলবে বাস্তব। এই উদ্দেশ্য পূরণে আমরা শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালগুলি সর্বদাই বিভিন্ন ঐতিহাসিক চিত্র দিয়ে সাজিয়ে রাখতে পারি। এর ফলে অতীত সর্বক্ষণ জীবন্ত হয়ে শিক্ষার্থীদের পাশে প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

চিত্রের ব্যবহার

পঞ্চমতঃ **ইতিহাস শিক্ষাদানে সাহিত্যের ব্যবহার বিশেষ উপযোগী।** সাহিত্যের সহযোগিতায় ইতিহাস হয়ে ওঠে বর্ণময়, কাব্যময় আর যা কিছু বর্ণময় কাব্যময় তারই আবেদন শিশুমনের কাছে অপরিসীম।

ষষ্ঠতঃ **ইতিহাস শিক্ষাদানে স্থানীয় ইতিহাসকে যথাযথ ভাবে ব্যবহার করতে হবে।** এই ব্যবহারের মধ্য দিয়ে একদিকে ইতিহাস হয়ে উঠবে জীবন্ত, অন্যদিকে ইতিহাসের ব্যবহারিক উপযোগিতার দিকটিও শিক্ষার্থীর সম্মুখে পরিস্ফুট হবে।

নবম অধ্যায়

ইতিহাস পাঠে সমসাময়িকতার ব্যবহার

॥ বিষয় সংকেত ॥

সমসাময়িক প্রসঙ্গের সংজ্ঞা—সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের উদ্দেশ্য—সমসাময়িক প্রসঙ্গ জানার উৎস—সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহার—সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যম—সমসাময়িক প্রসঙ্গের প্রতিবন্ধকতা—শিক্ষকের ভূমিকা ॥ মতদ্বৈধতা পূর্ণ বিষয়ের পাঠ—ভূমিকা—মতানৈক্যের উৎস—বিদ্যালয় স্তরে উপযোগী—মতদ্বৈধতা পূর্ণ বিষয়—মতদ্বৈধতা পূর্ণ প্রসঙ্গের প্রকারভেদ—মতদ্বৈধতা পূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা পদ্ধতি ॥

"*The present contains all there is. It is wholly ground : For it is the past and it is the future.*"

—*Whitehead.*

॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গের সংজ্ঞা ॥
॥ Definition of current Affairs & Contemporary Events ॥

"History is an unending dialogue between the past and the present." তাই বর্তমানের সঙ্গে অতীতের সুনিবিড় সম্পর্ক স্থাপনাই ইতিহাস পাঠের অন্যতম মৌল উদ্দেশ্য। কিন্তু এই সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে কিভাবে?

এ প্রশ্নের একটি উত্তর হ'ল, যদি ইতিহাস পাঠে সমসাময়িক প্রসঙ্গ চাতুর্যের সঙ্গে ব্যবহার করা যায় তাহলে অতীত ও বর্তমানের মধ্যে সেতু বন্ধনের কাজটি সহজতর হয়। কিন্তু তখুনই আর একটি প্রশ্ন আসে, সমসাময়িক প্রসঙ্গ বলতে আমরা কি বুঝি?

ঠিক এই মুহূর্তে যা ঘটলো তাই যে সমসাময়িক প্রসঙ্গ—এমন নয়। বরং বলা যায়, খুব সম্প্রীতি যা ঘটলো তাই হ'ল সমসাময়িক। কথাটাকে আর একটু খুলে বললে যা দাঁড়ায় তা হ'ল, যে কোন ঘটে যাওয়া ঘটনার তাৎক্ষণিক কিছু প্রভাব থাকে, যেমন নিস্তরঙ্গ পুকুরে ঢিল ছুঁড়লে যে তরঙ্গ জাগে। এখন এই তাৎক্ষণিক প্রভাব যতক্ষণ পর্যন্ত কাটিয়ে ওঠা না যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত ঘটনাটি সমসাময়িক প্রসঙ্গ হবে না।

সংজ্ঞা

আবার যা ঘটে যায় তাই তো অতীত। তা হলে অতীত ও সমসাময়িকতার মধ্যে সীমারেখা কোথায়? উত্তর হ'ল, যে সব ঘটনা আমাদের পক্ষে আর কখনো দৃশ্য নয় তাই হ'ল অতীত। আর যে সব ঘটনা এখনো একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায় নি তাই হ'ল সমসাময়িকতা। এভাবেই অতীত ও সমসাময়িকতার মধ্যে একটি সূক্ষ্ম বিভাজন রেখা আমরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছি।

আসলে ইতিহাস হতে চলেছে এমন ঘটনাবলীই হ'ল সমসাময়িকতা। তাই একমাত্র সমসাময়িকতার পক্ষেই পাঠ্য পুস্তকের ইতিহাস আর বাইরের নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনা সম্ভব। তা ছাড়া সর্বাধুনিক তথ্য সম্বলিত পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন যেহেতু সম্ভব নয় সেই হেতু প্রয়োজন রয়েছে ইতিহাস পাঠে সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের। কেননা কেবলমাত্র অতীতচারী হওয়া তো শিক্ষার্থীর পক্ষে একান্তই অর্থহীন। তাই অতীতকে দাঁড়াতে হবে বর্তমানকেই ভিত্তি করে। সমসাময়িকতা হ'ল বর্তমানের ভিত্তি রচনার অপরিহার্য সরঞ্জাম।

গুরুত্ব

॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের উদ্দেশ্য ॥

সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের বিঘ্ন অনেক। তাই প্রয়োজন এই ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতার এবং ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও যথোচিত সচেতনতার। এই প্রসঙ্গে আমরা কতকগুলি উদ্দেশ্য উল্লেখ করতে পারি।

॥ এক ॥ **স্থানীয়, জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পটভূমিকা** সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের ক্রমশঃ আগ্রহান্বিত করে তোলা।

॥ দুই ॥ বর্তমানের সঠিক মূল্যায়নের জন্য **উপযুক্ত মানসিকতা গঠন** করা।

॥ তিন ॥ অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকাদের **প্রাপ্ত-বয়স্কদের জগতে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ** সৃষ্টি করে দেওয়া।

॥ চার ॥ কোন একটি বিষয়ে **গভীর পাঠাভ্যাস পদ্ধতি** সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা।

॥ পাঁচ ॥ **পাঠ্যপুস্তকের অসম্পূর্ণতাকে পূর্ণ** করে তোলা।

॥ ছয় ॥ **কোন ঘটনা সম্পর্কে প্রচার ও সত্যতা,** ঘটনাটির তাৎক্ষণিক প্রভাব ও স্থায়ী প্রভাব সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভে শিক্ষার্থীদের সহায়তা করা।

॥ সাত ॥ শিক্ষার্থীদের **নাগরিকতার আদর্শ** সম্পর্কে সচেতন করা, তাদের **বিশ্বজনীনতার আদর্শে** উদ্বুদ্ধ করা, তাদের **পরমতসহিষ্ণু** করে তোলা এবং তাদের **মানবতাবাদের মহামন্ত্রে দীক্ষিত** করা।

॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গ জানার উৎস ॥

সমসাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে জানার উপায় হ'ল, রেডিও বা টেলিভিসন, সংবাদপত্র, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা, লোকসভা, রাজ্যসভা ও বিধানসভার আলোচনা, প্রাপ্ত বয়স্কদের

আলাপ-আলোচনা, বিভিন্ন যুব সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন, বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ, বিদ্যালয় বা সাধারণ পাঠাগার প্রভৃতি।

॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহার ॥

বহু ভাবেই আমরা সমসাময়িক প্রসঙ্গ নৈমিত্তিক শিক্ষাদানকার্যে ব্যবহার করতে পারি। এখানে কয়েকটি উপায় নির্দেশ করা হ'ল।

বিষয়গত সম্পদ

সমসাময়িক প্রসঙ্গকে বিষয়গত সম্পদ হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এই সম্পদের সাহায্যে পাঠ্য পুস্তকের বিষয়কে বাস্তব ভিত্তি দেওয়া যায় এবং পাঠ্যপুস্তককে বহুলাংশে শিক্ষার্থীদের প্রত্যক্ষ অনুভবের আওতায় নিয়ে আসা যায়। এই সম্পদের ব্যবহারের ফলেই শিক্ষার্থী ইতিহাসের সাম্প্রতিক তথ্যাবলী সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পায়।

স্বতন্ত্র শিক্ষাদান পদ্ধতি

সমসাময়িক প্রসঙ্গকে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষাদান পদ্ধতি হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ইতিহাস স্থানের দিক থেকে, সময়ের দিক থেকে এমন কি অভিজ্ঞতার দিক থেকেও এমন দূরবর্তী যে সেখানে শিক্ষার্থীর সকল কল্পনা-শক্তিও হার মানতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে সমসাময়িক প্রসঙ্গের সুবিধে অধিক উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না। তাই বহুক্ষেত্রেই আমরা সাম্প্রতিক কাল থেকে আরম্ভ করে ক্রমান্বয়ে অতীতচারী হতে পারি। এই পদ্ধতির উপর নির্ভর করে বিদ্যালয় স্তরে ইতিহাসের পাঠ্যক্রমও সংগঠিত হতে পারে। এবং এই পন্থানুসারী পাঠ্যক্রম প্রণয়ন কৌশলকেই বলা হয়েছে Regressive Method.

পরিবেশ রচনা

সার্থক ইতিহাস পাঠদানে শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার গুরুত্ব অনেকখানি। এই পরিবেশ রচনায় কৃতি শিক্ষকদের সর্বদাই বিশেষ যত্নবান হতে হয়। সমসাময়িক প্রসঙ্গ এদিক থেকেও শিক্ষকের বিশেষ সহায়ক হতে পারে। মনোবিজ্ঞানতো আমাদের বলেই দিয়েছে যে জানা থেকে অজানার দিকে পরিচিত থেকে অপরিচিতির দিকে অগ্রসর হলে শিক্ষার্থী স্বভাবতঃই আগ্রহশীল হয়ে উঠবে। বিশেষ করে ইতিহাসের যে বিষয়বস্তুর সঙ্গে শিক্ষার্থীর কোন অনুভব-নির্ভর যোগাযোগ নেই, সেখানে চিত্তাকর্ষক পাঠ্যদান সত্যিই এক সমস্যা। তাই শিক্ষার্থীদের প্রকৃত অর্থে কৌতূহলী করে তোলার প্রয়োজনে প্রস্তুতি-পর্বে সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা শ্রেণীকক্ষে এক ভিন্নতর পরিবেশ রচনা করতে পারে।

আলোচনা

তবে ঠিক কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে এবং কেমনভাবে সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহার করা হবে তা স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট করে দেওয়া যায় না। এটা নির্ভর করে বহুলাংশে বিষয়-বস্তুর উপর এবং সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারে শিক্ষকের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য ও দক্ষতার উপর। অপ্রাসঙ্গিক বা অবান্তরভাবে এই প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হলে যেমন একদিকে শ্রেণীকক্ষের পরিবেশ বিঘ্নিত হতে পারে তেমনি শিক্ষকের নৈপুণ্যের অভাব ঘটলেও এই প্রসঙ্গ অবাঞ্ছিত প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে।

॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের মাধ্যম ॥

সুনির্দিষ্টভাবে ইতিহাস পাঠে ছাড়াও সমসাময়িক প্রসঙ্গ অন্যান্য নানা উপায়ে উত্থাপিত হতে পারে, ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন :—

বিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক সমাবেশ

প্রত্যহ বিদ্যালয়ের কাজ শুরু হবার আগে সকল ছাত্র-ছাত্রীর সমাবেশে প্রত্যেকদিনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলি আলোচিত হতে পারে। এই সংবাদসমূহ সংকলনের দায়িত্ব শিক্ষার্থীদের উপরই অর্পণ করা হবে। তারা নিজেরাই নিজেদের বিচার বুদ্ধি অনুসারে সংবাদ সংকলন করবে এবং পরিবেশন করবে। শিক্ষক এখানে তাদের উৎসাহদাতা ও পরামর্শদাতার ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

সংবাদ পরিবেশন বোর্ড

বিদ্যালয়ে সংবাদ পরিবেশন বোর্ড (News Bulletin Board) স্থাপন করা যেতে পারে। এই বোর্ড বিদ্যালয়ের এমন জায়গায় স্থাপিত হবে যেন সকল ছাত্র-ছাত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তারা অবাধে তা পড়তে পারে। এই বোর্ড পরিচালনার দায়িত্বও ছাত্রেরাই গ্রহণ করবে। তবে সংবাদ সংকলনে যেন সকল প্রকার সংবাদই, (যথা : রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি চলচ্চিত্র, খেলাধূলা) স্থান পায়। এতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই নিজেদের পছন্দমত সংবাদ পড়তে পারবে।

সংবাদের মানচিত্র

সংবাদের মানচিত্র তৈরী করেও সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহৃত হতে পারে। সংবাদের মানচিত্র হ'ল : বেশ বড় আকারের পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কণ করা হবে। তারপর যে ঘটনা যে স্থানে ঘটেছে সেইখানে সেই সংবাদ উল্লিখিত হবে এই প্রথার সবচেয়ে বড় অবদান হ'ল, শিক্ষার্থীগণ যে কেবলমাত্র নৈমিত্তিক সংবাদই জানতে পারবে তা নয়, তারা মানচিত্রের ব্যবহার কৌশলও আয়ত্ব করে ফেলবে।

এ ছাড়া বিদ্যালয়ে নিয়মিত সাম্প্রতিক বিষয়ের উপর আলোচনা চক্রের আয়োজন করেও সমসাময়িক প্রসঙ্গের অবতারণা হতে পারে। এ দিক থেকে বিতর্ক সভা, প্যানেল আলোচনা প্রভৃতি পন্থার উল্লেখ করা যেতে পারে।

॥ সমসাময়িক প্রসঙ্গের প্রতিবন্ধক ॥

সমসাময়িক প্রসঙ্গ ব্যবহারের সুবিধে যেমন রয়েছে, তেমনি প্রতিবন্ধকতাও রয়েছে যথেষ্ট।

প্রথমতঃ সমসাময়িক প্রসঙ্গ সাধারণতঃ পক্ষপাত দোষে দুষ্ট হয় এবং এ বিষয়ে জানার তাৎক্ষণিক উৎসও খুবই অপ্রচুর।

দ্বিতীয়তঃ বহু শিক্ষার্থীই থাকে যাদের অতিরিক্ত পাঠের অভ্যাস খুবই কম।

তৃতীয়তঃ সমসাময়িক প্রসঙ্গ সম্পর্কে নানা জনের নানা মত থাকা খুবই স্বাভাবিক।

চতুর্থতঃ বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কর্মসূচী এমন হয় যে সেখানে সমসাময়িক প্রসঙ্গ বিস্তারিত আলোচনা করার সুযোগ একেবারেই সংকীর্ণ।

পঞ্চমতঃ সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহারে যে নিপুণ ও দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন তেমন শিক্ষক খুব সহজ লভ্য নয়।

।। শিক্ষকের ভূমিকা ।।

সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহারে সাফল্য অর্জন বহুলাংশে শিক্ষকের উপরই নির্ভর করে। এই সাফল্য লাভ করতে হলে প্রয়োজন শিক্ষকের নিজস্ব আগ্রহ, উদ্যম এবং সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তার পুংখানুপুংখ জ্ঞান।

প্রথমে শিক্ষক সমসাময়িক প্রসঙ্গগুলি নির্বাচনে যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দেবেন। তারপর নির্বাচিত বিষয়গুলি সম্পর্কে নানাবিধ উৎস থেকে জ্ঞানের সন্ধানে তিনি উদ্যোগী হবেন। তিনি নিজে যতক্ষণ পর্যন্ত স্বচ্ছ ধারণার অধিকারী না হচ্ছেন ততক্ষণ তিনি তাঁর ছাত্রদের সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁরই সযত্ন প্রয়াসে ইতিহাস পাঠে সমসাময়িক প্রসঙ্গের ব্যবহার সার্থক হয়ে উঠবে।

॥ মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয়ের পাঠ ॥

॥ Teaching of Controversial Issues ॥

॥ ভূমিকা ॥

ইতিহাসের সত্য কখনো চিরন্তন সত্য নয়, আপেক্ষিক সত্য। কেননা ঐতিহাসিকের অনুসন্ধান, গবেষণা ও বিচার-বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই ঐতিহাসিক সত্য প্রতিষ্ঠিত। আবার ঐ একই পথে প্রতিষ্ঠিত সত্যের অসারতা প্রমাণিত হয়, স্থান লাভ করে নতুন সত্য। এই ভাঙ্গা-গড়ার চিরন্তন খেলার মধ্য দিয়েই ইতিহাসের যাত্রা পথ।

এই কারণে ইতিহাসে মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয় থাকা খুবই স্বাভাবিক। বরং বলা চলে, মতের অমিলই হ'ল ইতিহাস নামক বিষয়টির একটি অন্যতম বৈশিষ্ট। এই অমিল আছে বলেই ঐতিহাসিকদের অন্তহীন অনুসন্ধিৎসা আর তাই ইতিহাস নিয়তই চলমান, নিত্যবহ।

॥ মতানৈক্যের উৎস ॥

যেখানে সুনির্দিষ্ট ও বিশ্বস্ত তথ্যের ভিত্তিতে ইতিহাসের সৃষ্টি, সেখানে আবার মতানৈক্য কেন—এমন একটি প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই মনের কোনে উঁকি দিতে পারে। এ প্রশ্নের জবাব হ'ল, ঐতিহাসিকও একজন মানুষ, তাঁর নিজস্ব মানসিকতা আছে, আবেগ আছে, প্রবণতা আছে, যাকে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা বা অস্বীকার করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। তারই ফলে একই তথ্য ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিকের মতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যাত হয়, বিশ্লেষিত হয়।

॥ বিদ্যালয় স্তরে উপযোগী মতাদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয় ॥

যে কোন ধরনের মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয় বিদ্যালয় স্তরে আলোচনার উপভোগী হতে পারে না। মতদ্বৈধতারও তারতম্য আছে, তার গভীরতায় স্তরভেদ আছে, সূক্ষ্মতায় রূপভেদ আছে। তাই আমাদের স্থির করে নিতে হবে, কোন্ কোন্ মতানৈক্যপূর্ণ বিষয় বিদ্যালয়স্তরে পঠিত হবে এবং এই উদ্দেশ্যে আমরা কতকগুলি নীতিও নির্দেশ করতে পারি।

॥ প্রথমতঃ ॥ আমাদের সর্বপ্রথম বিবেচ্য হ'ল, শিক্ষার্থীদের মানসিক সামর্থ। আমরা যেমন একজন বয়স্ক লোকের মন নিয়ে একজন শিশুকে বিচার করবো না, তেমনি শিশুকে আবার অতিরিক্ত অক্ষম ভেবে তার সক্ষমতার প্রতি অবিচারও করবো না।

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয়গুলি যেন শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট কৌতূহলী করে তুলতে পারে সেটাও লক্ষণীয়। শিক্ষার্থীর স্বতঃস্ফূর্ত কৌতূহল ছাড়া এই প্রসঙ্গের আলোচনা কখনো প্রাণবন্ত হতে পারে না।

॥ তৃতীয়তঃ ॥ মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ যেন খুব বেশী আবেগ প্রধান বা উত্তেজক না হয়। কারণ এই ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার জন্য প্রয়োজন গভীর পাণ্ডিত্য ও অভিজ্ঞতা, যা আমরা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে নিশ্চয়ই আশা করবো না।

॥ চতুর্থতঃ ॥ এমন বিষয়ই নির্বাচন করা হবে যা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ পাওয়া যাবে। সময়ের স্বল্পতার জন্য যদি আলোচনাকে সংক্ষেপ করতে হয় কিংবা আলোচনাকে অর্ধ পথেই স্থগিত রাখতে হয় তবে মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্যই ব্যাহত হবে। কারণ এমন প্রসঙ্গের অবতারণার অর্থ ই হ'ল প্রসঙ্গটির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবাধ পর্যালোচনার সুযোগ দেওয়া।

॥ পঞ্চমতঃ ॥ এমন মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গই আলোচনার জন্য গৃহীত হবে যে সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কঠিন নয়। তথ্যের অপ্রাচুর্ব থাকলে বিষয়টিকে নানা দিক থেকে বিচার করা যাবে কি করে? তাই তথ্যের সহজ লভ্যতা হবে মতদ্বৈধতাপূর্ণ বিষয় নির্বাচনের একটি মানদণ্ড।

॥ মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গের প্রকার ভেদ ॥

ইতিহাসে আমরা যত মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ দেখি সেগুলিকে সাধারণভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা :

(ক) তথ্য সম্পর্কীত মতদ্বৈধতা,

(খ) তথ্যের গুরুত্ব সম্পর্কীত মতদ্বৈধতা,

(গ) তথ্যের বিশ্লেষণ সম্পর্কীত মতদ্বৈধতা।

এই শ্রেণীভাগের দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রায় একই পর্যায় ভুক্ত। কেননা তথ্যের গুরুত্ব বিচার তো প্রকৃতপক্ষে তথ্যের বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ার উপরই নির্ভর করে।

॥ তথ্য সম্পর্কীত মতদ্বৈধতা ॥

এই ধরনের মতদ্বৈধতার কারণ হয় তথ্যের অপ্রতুলতা, নতুবা সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা বা বিশ্বস্ততা সম্পর্কে সংশয়। উদাহরণ হ'ল, আর্যদের আদি বাসস্থান। এ নিয়ে ঐতিহাসিকদের বিতর্ক দীর্ঘকালের। কারণ এই বিষয়ে প্রত্যক্ষ তথ্যাবলীর অভাব। এ সব ক্ষেত্রে কর্তব্য হ'ল, যে মতটি তুলনামূলকভাবে অধিকতর গ্রহণযোগ্য তার উপরই গুরুত্ব দিতে হবে এবং মতটি গ্রহণের পক্ষে যুক্তিগুলিকে বিশ্লেষণ করতে হবে। যদি দেখা যায় যুক্তিগুলি যথেষ্ট শক্তিশালী নয় তা হলে শিক্ষক কেবলমাত্র নৈর্ব্যক্তিকভাবে বিষয়টি আলোচনা করে দেবেন।

॥ তথ্য বিশ্লেষণ সম্পর্কীত মতদ্বৈধতা ॥

এটি একটি অত্যন্ত জটিল ক্ষেত্র। কেননা সকল ঐতিহাসিক একই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, তা কখনোই সম্ভব নয়। আবার তা করলেও সবাই একই সিদ্ধান্তে উপনীত হবেন এটাও বলা চলে না।

প্রথমতঃ এক্ষেত্রে অবৈজ্ঞানিক পন্থা অনুসৃত যে কোন সিদ্ধান্ত নির্দ্বিধায় বাতিল করতে হবে। দ্বিতীয়তঃ অন্ধ সংস্কার বশে গৃহীত সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা চলবে না। তৃতীয়তঃ লক্ষ্য করতে হবে তথ্যের বিশ্লেষণে পটভূমিকা কি। সংকীর্ণ দৃষ্টিকোণ কখনো সত্যিকারের ইতিহাসের সন্ধান পায় না।

অতএব কোন একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে শ্রেণীকক্ষে আলোচনাকালে এইসব দিকগুলি আমাদের বিচার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

॥ মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ আলোচনা পদ্ধতি ॥

মতদ্বৈধতাপূর্ণ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনাকালে শিক্ষকেরই পাণ্ডিত্য ও দক্ষতার প্রয়োজন সর্বাধিক।

এ ধরনের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনার আগে তিনি একটি পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা রচনা করে নেবেন।

প্রথমে তিনি বিষয়টি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের যতটা সম্ভব আগ্রহশীল করে তুলবেন, এবং বিষয়টির ঐতিহাসিক গুরুত্ব কতখানি সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলতে উদ্যোগী হবেন।

তারপর তিনি বিষয়টি সম্পর্কে মতদ্বৈধতা কোথায় কোথায় তা তিনি স্পষ্ট করে বলবেন। এইবার তিনি মতদ্বৈধতা দূর করার জন্য বিভিন্ন তথ্যাবলীর সন্ধান দেবেন এবং শিক্ষার্থীগণ যেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে সেইসব তথ্যাবলীর বিচার বিশ্লেষণে তৎপর হয় সেদিকে তৎপর হবেন।

তৃতীয় স্তরে শিক্ষক মতদ্বৈধতা সম্পর্কে বিভিন্ন ঐতিহাসিকদের মতামত উদ্ধৃত করবেন এবং তাঁরা কি কি যুক্তিতে নিজ নিজ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা ব্যাখ্যা করবেন। এ স্তরে শিক্ষার্থীদের কতকগুলি ছোট ছোট দলে বিভক্ত করে প্রতিটি দলের উপর পৃথক পৃথক কাজের ভার ন্যাস্ত করা যেতে পারে।

সর্বশেষে হ'ল সিদ্ধান্ত গ্রহণ। এটি সত্যিই একটি কঠিন কাজ। কেন না, "Drawing conclusion is basically a skill in reaxoning. It involves the ability to relate a collection of fact to each other and draw generalizations." শিক্ষককে এই স্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। নানাবিধ প্রশ্নের মাধ্যমে তিনি শিক্ষার্থীদের সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করবেন।

॥ দশম অধ্যায় ॥

ইতিহাসের অভীক্ষা ও মূল্যায়ন

॥ বিষয় সংকেত ॥

মূল্যায়নের প্রয়োজন—মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি—মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ শ্রেণী বিভাগ—রচনাধর্মী পরীক্ষা—নৈর্বক্তিক পরীক্ষা—ইতিহাসে অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা।

"......in evaluation the emphasis is upon broad personality changes and major objectives of educational programme." *W. S. Monroe.*

"Teaching provides the opportunities for the pupil to achieve the objectives laid down and evaluation seeks to determine to what degree these objectives are being achieved."

॥ মূল্যায়নের প্রয়োজন ॥

অন্যান্য বিষয়ের মত ইতিহাস পাঠেরও তাৎপর্য হ'ল, শিক্ষার্থীগণ কিছু জানুক, কিছু করুক এবং কিছু হোক্। কিন্তু এটি হ'ল একটি সৎ ও আন্তরিক অভীপ্সা। তাই তারা সত্যি কিছু জানলো কি না, করলো কি না এবং হ'ল কি না, প্রয়োজন হ'ল তা যাচাই করে দেখার।

কিন্তু এই যাচাই করে দেখার কাজটি হ'ল একটি কঠিন কাজ। যেহেতু ইতিহাস পাঠের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীগণের কাছে অনেক কিছুই আমরা প্রত্যাশা করি সেইহেতু সেই প্রত্যাশার পরিণতি জানার পন্থাও বহুবিধ। এইসব বহুবিধ পন্থাকে আমরা এক কথায় বলতে পারি মূল্যায়ন। **"It indicates all kinds of efforts and all kinds of means to ascertain the quality, value and effectiveness of the desired outcomes."**

মূল্যায়ন কি ?

মূল্যায়নের কাজ ত্রিধারায় বিভক্ত।

প্রথমে, ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে হবে।

দ্বিতীয়, এইসব উদ্দেশ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কি কি আচরণগত পরিবর্তন আশা করি তা স্থির করতে হবে।

তৃতীয়, এইসব আচরণগত পরিবর্তন সাধিত হ'ল কি না তা পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন ধরনের পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে।

তা হলে ব্যাপক অর্থে শিক্ষার যে লক্ষ্য তার বাস্তবায়ণে কতটা সাফল্য অর্জিত,

হ'ল, কোথায় কোথায় ব্যর্থতা অতিক্রম করা গেল না তার পরিমাপই হ'ল মূল্যায়ন শুধু এই নয়। কেবল সাফল্য বা ব্যর্থতা পরিমাপ করলেই সঠিক মূল্যায়ন হ'ল না, সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা পদ্ধতির কোথায় কোথায় পরিবর্তন প্রয়োজন সে সম্পর্কেও পথের নির্দেশ পাওয়া যায় মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে।

॥ মূল্যায়নের বিভিন্ন পদ্ধতি ॥

মূল্যায়নের বিভিন্ন দিক রয়েছে। মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে যেমন শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান যাচাই করতে চাই তেমনি শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনও পরিমাপ করতে চাই। এ কারণে মূল্যায়নে আমাদের বহুবিধ পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। যেমন:

(এক) শ্রেণীতে বা শ্রেণীর বাইরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে বা সমষ্টিগত-ভাবে সযত্ন নজর রেখে তাদের বিভিন্ন আচরণগত পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারেন।

(দুই) শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমেও তাদের মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(তিন) শিক্ষার্থীগণ নিজেরাই নিজেদের অগ্রগতি সম্পর্কে অভীক্ষা চালাতে পারে।

(চার) বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ পরীক্ষকমণ্ডলীর দ্বারা মূল্যায়ন করা যেতে পারে।

(পাঁচ) শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক কর্মের দিনলিপি রাখার নির্দেশ দিয়ে সেই দিনলিপিগুলি থেকেও তাদের পরিমাপ করা যেতে পারে।

(ছয়) রচনাধর্মী পরীক্ষা বা সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখন পরীক্ষা বা নৈর্বক্তিক পরীক্ষার মাধ্যমেও মূল্যায়ন হতে পারে।

(সাত) শিক্ষার্থীদের গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়েও তাদের পরিমাপ করা যেতে পারে।

এ ছাড়াও আরও অনেক পদ্ধতি ব্যবহৃত হতে পারে। তবে কখন কোন্ পদ্ধতি ব্যবহৃত হবে তা নির্ভর করে কি উদ্দেশ্যে মূল্যায়ন করা হবে তার উপর। ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে যেমন শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান সম্প্রসারণ করতে চাই, তেমনি তার আচরণগত পরিবর্তনও ত্বরান্বিত করতে চাই। এইসব বহুবিধ উদ্দেশ্যের মূল্যায়নের জন্য আমাদের বহুবিধ পন্থা অনুসরণ করতে হয়।

॥ মূল্যায়ন পদ্ধতির সাধারণ শ্রেণী বিভাগ ॥

অন্যতম মূল্যায়ন পদ্ধতি হ'ল লিখিত পরীক্ষা। এই লিখিত পরীক্ষাকে আমরা তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি। যেমন: রচনাধর্মী পরীক্ষা, সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখন পরীক্ষা, ও নৈর্বক্তিক পরীক্ষা।

॥ রচনাধর্মী পরীক্ষা ॥
॥ Essay-type Test ॥

এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীদের আট বা দশটি প্রশ্নের মধ্যে পাঁচ বা ছয়টি প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা হয়। এই পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান

কতটা হ'ল, অর্জিত জ্ঞানকে তারা সূক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের মধ্যদিয়ে যুক্তি সহকারে প্রকাশ করতে পারে কি না তা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে এই ধরনের পরীক্ষায় শিক্ষার্থীকে মূলতঃ তার স্মরণশক্তির উপরই নির্ভর করতে হয়।

॥ রচনাধর্মী পরিক্ষার সুবিধা ॥

॥ প্রথমতঃ ॥ এই পরীক্ষার সাহায্যে **শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞান** এবং সেই জ্ঞানের সঙ্গে ঐতিহাসিক বিধি প্রয়োগে তার কতটা দক্ষতা অর্জিত হয়েছে তা পরীক্ষা করা সম্ভব হয়।

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ এই পরীক্ষা **শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি এবং তার যুক্তিবাদী মানসিকতা** বিকাশে সাহায্য করে। ফলে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তিতে কোন বিচ্যুতি থাকলে কিংবা চিন্তাধারায় অস্বচ্ছতা থাকলে তা এই পরিক্ষা সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে দেয়।

॥ তৃতীয়তঃ ॥ রচনাধর্মী পরীক্ষা **শিক্ষার্থীদের গভীর ও সূক্ষ্মভাবে অধ্যয়নের** প্রবণতাকে উৎসাহিত করে।

॥ চতুর্থতঃ ॥ **মতদ্বৈধতা মূলক প্রসঙ্গ** সম্পর্কে শিক্ষার্থী তার বক্তব্য পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে পারে এই ধরনের পরীক্ষায়।

Bean বলেছেন, "Perhaps the most important reason for obtaining essay items in appropriate setting or Context, in school or personnel examinations is that no substitute has been found that will evaluate the qualitative aspects of verbal expression of thought."

॥ রচনাধর্মী পরিক্ষার অসুবিধা ॥

॥ প্রথমতঃ ॥ ইতিহাসের বিপুল পাঠ্যক্রমের সমগ্র অংশ সম্পর্কে **শিক্ষার্থীর বিষয়গত জ্ঞানও এই রচনাধর্মী পরীক্ষার পক্ষে যাচাই করা সম্ভব নয়।**

॥ দ্বিতীয়তঃ ॥ **রচনাধর্মী পরীক্ষার সঙ্গে এমন কতকগুলি উপাদান জড়িয়ে আছে যার সঙ্গে ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই।** যেমন, বানানের শুদ্ধতা, হাতের লেখা, ভাষা-জ্ঞান ইত্যাদি। রচনাধর্মী পরীক্ষার পরীক্ষক কখনো এইসব উপাদানগুলিকে অগ্রাহ্য করতে পারেন না।

॥ তৃতীয়তঃ ॥ **রচনাধর্মী পরীক্ষার মূল্যায়ন একটি চিরকালীন সমস্যা।** কারণ "The essay is an intricate mental product which can be analysed in a variety of ways and yet can never be analysed Completely." এখানে পরীক্ষক প্রকৃতপক্ষে নিজস্ব চিন্তা-চেতনা ও বিচারবোধ দ্বারা পরিচালিত হন। মূল্যায়নেও ব্যক্তিসাপেক্ষতা এত বেশী কার্যকরী যে একজন পরীক্ষক হয়তো নিজেরই পরীক্ষিত উত্তর পত্র কিছুদিন বাদে পূনর্বার মূল্যায়ন করতে গিয়ে নিজেই নিজের বিরোধিতা করবেন।

মূল্যায়নের সমস্যা

। চতুর্থতঃ । এই পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা এবং এর মূল্যায়ন পদ্ধতি উভয়েই বিশেষ সময় সাপেক্ষ। তবুও এই পরীক্ষার মাধ্যমে সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব নয়।

। পঞ্চমতঃ । অল্প কয়েকটি বিষয় অধ্যয়ন করে এবং এর থেকেই প্রশ্ন রচিত হলে শিক্ষার্থী অল্প আয়াসে অধিক সাফল্য লাভ করতে পারে। অন্যদিকে একটি সত্যিকারের জ্ঞানী শিক্ষার্থী এই আকস্মিক সুযোগ না পেলে নিজের জ্ঞানের পরিচয় দিতে পারে না।

এসব কারণেই রাধাকৃষ্ণণ কমিশন রচনাধর্মী পরীক্ষা সম্পর্কে নির্দ্বিধায় বলেছেন, "It has usually no clearly defined purpose ; it is therefore, invalid. Its sampling is very arbitrary and limited ; it is, therefore, inadequate. Its scoring is subjective and, therefore, not reliable."

॥ সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখন পরীক্ষা ॥

॥ Short Answer type test ॥

এই পরীক্ষায় ছোট ছোট প্রশ্ন করা হবে এবং প্রতি প্রশ্নের সুনির্দিষ্ট উত্তর দিতে হবে। এই পরীক্ষার সুবিধে হ'ল অল্প সময়ে বিস্তৃত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর জ্ঞান পরীক্ষা করা চলে। বিশেষ করে নিম্ন শ্রেণীতে এই ধরনের পরীক্ষা বিশেষ কার্যকরী।

॥ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ॥

॥ Objective test ॥

প্রতিটি শিক্ষার্থীর সমগ্র মানসিকতার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করাই হ'ল নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার মৌল উদ্দেশ্য। এই ধরনের পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীর অগ্রগতি, তার অক্ষমতা, তার সাফল্য তার বিফলতা তার মানসিক প্রবণতা সবকিছুই সুস্পষ্টভাবে বিচার করা যায়।

॥ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার সুবিধা ॥

প্রথমতঃ এই পরীক্ষার মাধ্যমে বিষয়বস্তু প্রায় সমগ্র অংশ সম্পর্কে শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান অর্জন করলো তা যাচাই করা যায়।

দ্বিতীয়তঃ এই পরীক্ষার মূল্যায়নে ব্যক্তি সাপেক্ষতার কোন স্থান নেই। কেননা এখানে মূল্যায়নের নির্দেশনা হ'ল সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। ফলে পরীক্ষকের ব্যক্তিগত অভিরুচির কোন ভূমিকা এখানে নেই।

তৃতীয়তঃ যেহেতু পরীক্ষার্থীর উত্তর এই পরীক্ষায় সুনির্দিষ্ট এবং অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত সেইহেতু অকারণ সময়ের অপব্যবহারের কোন সুযোগ এখানে নেই।

চতুর্থতঃ এই পরীক্ষা বিচারহীন বিবেচনাহীন অন্ধ মুখস্থ বিদ্যাকে কখনো উৎসাহিত করে না।

পঞ্চমতঃ এই পরীক্ষায় বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীর মানসিকতার বিভিন্নদিক সম্পর্কে অনুসন্ধান করা যায়। এই অনুসন্ধানের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীর পরবর্তী ক্রমবিকাশে সঠিক নির্দেশনা দেওয়া যায়।

বহিরঙ্গের প্রাধান্য বর্জিত

ষষ্ঠতঃ প্রকৃত ঐতিহাসিক জ্ঞানকে প্রচ্ছন্ন রেখে বাইরের চমৎকারীত্ব দিয়ে পরীক্ষককে বিভ্রান্ত করার সুযোগ এই পরীক্ষায় নেই। এটা হতেই পারে যে একজন শিক্ষার্থীর হয়তো বিষয়গত জ্ঞান ভাল নেই। কিন্তু সে তার হাতের লেখার সৌন্দর্য দিয়ে, ভাষা জ্ঞানের উৎকর্ষতা দেখিয়ে, রচনাশৈলীর সাবলীলতা দিয়ে পরীক্ষককে বিভ্রান্ত করে ভাল নম্বর পেয়ে গেল। কিন্তু নৈর্বক্তিক পরীক্ষায় এমন সম্ভাবনার সুযোগ আদৌ নেই।

॥ নৈর্বক্তিক পরীক্ষার অসুবিধা ॥

ঐতিহাসিক চেতনার পরিমাপ হয় না

ইতিহাসের মূল্যায়নে নৈর্বক্তিক পরীক্ষার সবচেয়ে বড় অসুবিধা হ'ল, শিক্ষার্থীর ঐতিহাসিক চেতনা কতটা বিকশিত হ'ল তা পরিমাপ করা যায় না। ঐতিহাসিক চেতনা বলতে আমরা বুঝি শিক্ষার্থীর তথ্য সংগ্রহের ক্ষমতা, সংগৃহীত তথ্যাবলী, বিচার বিশ্লেষণ করার ক্ষমতা, বিচার-বিশ্লেষণ লব্ধ ফলশ্রুতি বর্ণনা করার ক্ষমতা। অথচ এই দিকটি বাদ দিলে কখনোই ইতিহাসের সর্বাঙ্গ সুন্দর মূল্যায়ন হতেই পারে না।

॥ নৈর্বক্তিক পরীক্ষার কয়েকটি নমুনা ॥

আমরা আগেই বলেছি, বহু রকম নৈর্বক্তিক পরীক্ষা হতে পারে। এখানে আমরা কয়েকটি নমুনা দিলাম :

॥ সম্পূর্ণকরণ পরীক্ষা ॥

॥ Completion Test ॥

এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর স্মরণশক্তির যাচাই হতে পারে। যেমন :

নির্দেশ : শূন্য স্থান পূর্ণ কর :—

(ক) প্রথম পানিপথের যুদ্ধ হয়েছিল—সঙ্গে—।

(খ) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হন একজন ইংরেজ, নাম—।

(গ) মৌর্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন—।

॥ সঠিক নির্বাচনী অভীক্ষা ॥

॥ Multiple Choice Test ॥

এই পরীক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী কতটা বিষয়গত জ্ঞান অর্জন করেছে তা যাচাই করা যায়। যেমন :

নির্দেশ : নীচের বক্তব্যগুলির পাশে কতকগুলি উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরটিতে টিক্ চিহ্ন বসাও।

১। সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করেছিলেন। কারণ,
(ক) আরও ঐশ্বর্য তিনি চেয়েছিলেন।
(খ) ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপনই ছিল তাঁর লক্ষ্য।
(গ) তিনি হিন্দু রাজাদের শক্তি খর্ব করতে চেয়েছিলেন।

২। হিউয়েন সাঙের সঙ্গে পরিচয়ের আগে হর্ষবর্ধন ছিলেন,
শাক্ত, বৌদ্ধ, জৈন, শৈব।

এই অভীক্ষা নির্মাণ সম্পর্কে কয়েকটি সতর্কতা :—

প্রথমতঃ প্রতিটি বক্তব্যের সঙ্গে **অন্ততঃ চারিটি করে বিকল্প উত্তর দেওয়া উচিত।** নতুবা শিক্ষার্থীগণ অনুমান করে উত্তর দিতে প্রণোদিত হবে। আবার পাঁচের বেশী বিকল্প থাকলে তাদের অকারণে বেশী পড়তে হবে।

দ্বিতীয়তঃ **বিকল্পগুলি যেন বক্তব্যের সঙ্গে অসংগতি পূর্ণ বা বিজাতীয় না হয়** সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

তৃতীয়তঃ **বিকল্পগুলি সংক্ষিপ্ত ও যথাযথ হওয়া** বাঞ্ছনীয়।

চতুর্থতঃ **সঠিক উত্তরটি যেন স্পষ্ট হয়।** সঙ্গে এমন কোন বিকল্প থাকা উচিত নয় যাতে অকারণ সংশয় সৃষ্টি হতে পারে।

॥ সত্য-মিথ্যা নির্ণায়ক অভীক্ষা ॥

॥ True & False Test ॥

এই ধরনের অভীক্ষার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা, হ'ল, **উচ্চ মেধাসম্পন্ন যারা তাদের এখানে নিজস্ব মেধাশক্তির পরিচয় দেবার কোন অবকাশ নেই।** তা ছাড়া কোন ভুল উত্তর একবার শিক্ষার্থীর মনের ভেতর গেঁথে গেলে, পরবর্তীকালে তা দূর করা খুবই কঠিন। যাই হোক এই ধরনের অভিক্ষার নমুনা :

নির্দেশ : নীচের বাক্যগুলির মধ্যে যেগুলি ঠিক তার পাশে টিক (√) চিহ্ন, যে গুলি ভুল তার পাশে ক্রশ (×) চিহ্ন বসাও।

(ক) হিন্দুধর্মের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের উৎপত্তির বীজ নিহিত ছিল।
(খ) বৌদ্ধ রাজাগণ অহিংসা ধর্ম প্রচার করেছিলেন।
(গ) যীশু বুদ্ধদেবেরও আগে জন্মেছিলেন।

॥ ঘটনাক্রম অভীক্ষা ॥

॥ Sequence of Eevnts Test ॥

এই অভীক্ষায় শিক্ষার্থীর সময়-চেতনা যাচাই করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ঘটনাবলীকে সময়ানুক্রম অনুসারে সাজাতে বলা হয়। যেমন :

নির্দেশ : নীচের ঘটনাগুলিকে যার পরে যেটি ঘটেছিল সেই অনুসারে সাজাও।
(ক) ক্রাপস মিশন। (খ) তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ। (গ) পলাশীর যুদ্ধ।
(ঘ) জালিয়ানাওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড (ঙ) মর্লে-মিন্টো সংস্কার।

॥ সামঞ্জস্য-সাধন অভীক্ষা ॥

॥ Matching Test ॥

এই অভীক্ষায় দুইটি পৃথক স্তম্ভে বিষয় ও উত্তর লিখিত থাকে। শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত বিষয়ের সঙ্গে সঠিক উত্তরটির সামঞ্জস্য সাধন করতে বলা হয়। যেমন 'ক' স্তম্ভে কতকগুলি ঘটনা আছে। 'খ' স্তম্ভে আছে কয়েকটি নাম। 'ক' স্তম্ভের ঘটনার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত 'খ' স্তম্ভের নামগুলি মেলাও।

'ক' স্তম্ভ	'খ' স্তম্ভ
১। পলাশীর যুদ্ধের নায়ক	১। ঝাঁসীর রাণী
২। স্বত্ব বিলোপ নীতি	২। মহাত্মা গান্ধী
৩। সিপাহী বিদ্রোহের বীর রমণী	৩। রবার্ট ক্লাইভ
৪। অসহযোগ আন্দোলন	৪। লর্ড কর্নওয়ালিস

॥ ইতিহাসে অর্জিত জ্ঞানের অভীক্ষা ॥

॥ Achievement Test in History ॥

সাম্প্রতিককালে বর্তমান পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থা সম্পর্কে সমালোচনা সর্বত্রই সমভাবে সুতীব্র। রচনাধর্মী পরীক্ষা সম্পর্কে তো কথাই নেই। অথচ ইতিহাস এমন একটি বিষয় যেখানে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার প্রয়োজনে অংশতঃ রচনাশ্রয়ী হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। ফলে **একদিকে রচনাধর্মী পরীক্ষার বিরুদ্ধে আপোষহীন মনোভাব, অন্যদিকে ইতিহাস নামক বিষয়টির নিজস্ব প্রয়োজন—এই বৈপরীত্যের মধ্যে সমন্বয়সাধন একান্তই জরুরী।**

এই জরুরী প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে সম্প্রতি **ইতিহাসে অর্জিত জ্ঞানের পরীক্ষা বা Achievement Test** এর গুরুত্ব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং এ ধরনের অভীক্ষাকে অধিকতর কার্যকরী করে তোলার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের অভীক্ষাকে সত্যি সত্যিই কার্যকরী করে তুলতে হলে আমাদের কয়েকটি দিকে সতর্ক থাকতে হবে।

॥ **প্রথমতঃ** ॥ এই অভীক্ষায় প্রশ্নপত্র এমনভাবে রচিত হবে যেন তা **শিক্ষা-দানের যে লক্ষ্য স্থিরীকৃত তারসঙ্গে সংহতি রক্ষা করে।**

॥ **দ্বিতীয়তঃ** ॥ প্রশ্নপত্র যেন **সমগ্র বিষয়-বস্তু সম্পর্কে শিক্ষার্থী কতটা জ্ঞান** অর্জন করলো তা পরিমাপের সহায়ক হয়।

॥ **তৃতীয়তঃ** ॥ **প্রশ্নপত্র রচনার পদ্ধতি হবে প্রয়োজন ভিত্তিক।**

প্রয়োজন বলতে বুঝায় শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়-বস্তু সম্পর্কীত জ্ঞানের পরীক্ষা। তাই প্রশ্নপত্র রচনাধর্মী হতে পারে আবার নৈর্বক্তিকও হতে পারে। তবে উভয় পদ্ধতির সম্মিলন হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

॥ **চতুর্থতঃ** ॥ **প্রশ্নপত্রের ভাষা হবে সহজ, সাবলীল এবং দ্ব্যর্থহীন।** শিক্ষার্থীদের বুঝার পক্ষে যেন কোন অসুবিধা না হয় এমনভাবে প্রশ্ন রচিত হবে।

॥ **পঞ্চমতঃ** ॥ **প্রশ্নপত্রের উল্লিখিত সমস্যা যেন শিক্ষার্থীর সক্ষমতার আয়ত্তাধীন হয়।** অনাবশ্যক জটিল সমস্যার সম্মুখীন করে শিক্ষার্থীদের অকারণে বিভ্রান্ত করা একান্তই যুক্তিহীন।

॥ **ষষ্ঠতঃ** ॥ **বিভিন্ন প্রশ্নের মান নির্ধারণও যেন সুবিবেচনা প্রসূত হয়।** যেমন প্রতি প্রশ্নের মান নির্ধারণকালে যে তিনটি দিকে আমাদের লক্ষ্য রাখা উচিত তা হ'ল :

(ক) বিষয় বস্তু সম্পর্কে জ্ঞান—এ কারণে মোট নম্বরের ৬০% শতাংশ দেওয়া যেতে পারে

(খ) অর্জিত জ্ঞানের প্রয়োগ—এ কারণে ২০% নির্ধারিত হইতে পারে।

(গ) বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ এবং আচরণগত পরিবর্তন—এ কারণে নির্ধারিত অবশিষ্ট ২০%।

॥ **সপ্তমতঃ** ॥ **প্রশ্নের উত্তরদানের জন্য প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে** কিংবা নির্ধারিত সময় অনুপাতে প্রশ্নপত্র রচনা করতে হবে।

॥ **অষ্টমতঃ** ॥ **প্রশ্নপত্রে উপযুক্ত সংখ্যক বিকল্প প্রশ্নের সংস্থান রাখতে হবে।** নৈর্বক্তিক প্রশ্নে বিকল্প নাও থাকতে পারে। কিন্তু রচনাধর্মী পরীক্ষায় বিকল্প প্রশ্ন থাকা একান্তই জরুরী।

॥ **নবমতঃ** ॥ এই অভীক্ষার সঠিক মূল্যায়নের জন্য **প্রশ্নপত্র-রচয়িতা প্রশ্নপত্রের একটি উত্তর সংকেত ও রচনা করবেন** এবং কেমন উত্তর হলে কেমন মূল্যায়ন হবে তারও একটি নির্দেশ নামা দেবেন।

ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি

দ্বিতীয় পর্ব

বিষয়-বস্তু

[CONTENT]

॥ বিষয় বস্তু ॥

পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ইতিহাসের যে নতুন পাঠ্যক্রম নির্দেশিত হয়েছে তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এই পর্যায়ে আর সম্ভব নয় কেবলমাত্র বইখানি বিপুল আয়তনের হয়ে যাবার 'আশংকার' কথা চিন্তা করেই।

তবুও বিষয়-বস্তু সম্পর্কীত কিছু আলোচনা শুধু প্রাসঙ্গিক-ই নয়, অপরিহার্যও, বিশেষ করে যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে নতুন পাঠ্যক্রম রচিত হয়েছে সেই দৃষ্টিভঙ্গীর তাগিদেই।

তাই ভারতবর্ষের ইতিহাসের কয়েকটি অধ্যায়ের উপর আলোচনা এইসঙ্গে সন্নিবেশিত হ'ল। এই অধ্যায়গুলি নির্বাচনে দুটি দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে। তা হ'ল নতুন পাঠ্যক্রমের নতুন দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসের সাম্প্রতিক গবেষণার ফলশ্রুতি। আলোচনাগুলি পাঠ করলেই লক্ষ্য দুটি স্পষ্ট হবে আশা করা যায়।

যেহেতু বিষয়বস্তু সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভব হ'ল না, সে কারণে শিক্ষক বৃন্দের কাছে অনুরোধ, তাঁরা যেন নিদেন পক্ষে নীচে উল্লিখিত বইগুলি হাতের কাছে পাবার চেষ্টা করেন :

(ক) তিন খণ্ডে বঙ্গ দেশের সমগ্র ইতিহাস
—ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার

(খ) ভারতীয় বিদ্যাভবন প্রকাশিত ডঃ কে. এম. মুন্সী সম্পাদিত ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন খণ্ডগুলি।

(গ) পেঙ্গুইন সিরিজে দুইখণ্ডে A History of India vol. I by Romila Thapar এবং vol. II by Percival Spear.

॥ সিন্ধু সভ্যতা ॥

॥ ভূমিকা ॥ ১৯২২ সালের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব সম্পর্কে আমাদের কোন স্থনির্দিষ্ট ধারণা ছিল না। কিন্তু ঐ সনের ঐতিহাসিক প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণালব্ধ আবিষ্কার হঠাৎ আলোর ঝলকানির মত ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে আমাদের সমস্ত অনুমানকে এক বিপন্ন-বিস্ময়ে স্তম্ভিত করে দিয়েছে। জানা গেল, সিন্ধুনদের অববাহিকায় খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বৎসরেরও আগে এক স্থমহান সভ্যতার গোড়াপত্তন হয়েছিল এবং এই স্থত্র ধরে "India can now lay claim to the honour of being a pioneer civilisation along with Sumer, Babylon, Egypt and Assyria."

॥ নগর পরিকল্পনা ॥

সিন্ধু নদের অববাহিকায় প্রধানতঃ মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পায় এই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল।

মহেঞ্জোদড়োর নগর পরিকল্পনায় সেই প্রাচীন যুগে এমন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে যা আজও বিস্মিত করে। এক ইংরেজ লেখক স্পষ্ট ভাষায় স্বীকারই করেছেন যে A visitor at Mahenjodaro "feels himself surrounded by ruins of some present-day working town in Lancashire."

নগরটি ছিল উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে সমভাবে বিভক্ত। নগরের রাস্তাগুলি সোজা, প্রস্থে ৯ ফুট থেকে ৩৪ ফুট পর্যন্ত বিস্তৃত, দৈর্ঘে কোন কোন ক্ষেত্রে আধ মাইল। রাস্তার উভয় পার্শ্বে বাড়ী-ঘরগুলি স্থবিন্যস্ত। পয়ঃপ্রণালীর বিজ্ঞান সম্মত ব্যবস্থা। এখনো ধ্বংসাবশেষ দেখে বুঝা যায়, কোন্‌গুলি শিল্প-বাণিজ্যকেন্দ্র, কোন্‌গুলি শিল্পী-কারিগরদের বাসস্থান আর কোন্‌গুলিই বা ধনীদের অট্টালিকা। ধ্বংসাবশেষ থেকে "The general impression is that of a democratic bourgeois economy as in Crete"

মহেঞ্জোদড়োর স্থাপত্য কলা হ'ল খুবই সাধারণ, সরল, এবং বাস্তব প্রয়োজন-ভিত্তিক। স্থমের সভ্যতার মত আড়ম্বরপূর্ণ মন্দির এখানে নেই আবার মিশর সভ্যতার মত বিশালাকার পিরামিডও এখানে গড়ে ওঠে নি। "The aim in the Indus Valley was to make life comfortable and luxurious rather than refined or artistic."

হরপ্পা নগরটি ছিল মহেঞ্জোদড়োর তুলনায় বড়। তবে মহেঞ্জোদড়োতে যেমন বহু সংখ্যক কূপের ব্যবস্থা ছিল, হরপ্পায় তা ছিল না। এ ছাড়া উভয়ের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য খুব একটা নেই। হরপ্পা নগরের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৯'×১৩৫' পরিমিত বিশালাকার শস্যাগারটি। আরেকটি উল্লেখ্য হ'ল, দুই সারিতে চৌদ্দটি পরপর সাজানো শ্রমিকদের বাসগৃহ।

উভয় নগরই ছিল ইটের তৈরী। ইটগুলিও ছিল সুনির্মিত। উভয় নগরে নির্মিত ভবনগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যথা : বাসগৃহ, বৃহদাকার অট্টালিকা ও স্নানাগার।

বাসগৃহের আকারে তারতম্য ছিল। তবে প্রত্যেক বাসগৃহে ছিল শয়নকক্ষ, রন্ধন কক্ষ, স্নানাগার এবং কূপ। প্রত্যেক গৃহের নর্দমার সঙ্গে রাস্তার বড় নর্দমার সংযোগ ছিল। আরেকটি বৈশিষ্ট্য হ'ল, "The open court was the basic feature of house planning in the Indus Valley as an Babylon." সিন্ধু সভ্যতার নগর পরিকল্পনার সর্বাধিক বিস্ময়কর অবদান হ'ল, সুবিন্যস্ত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, "The elaborate drainage system is a unique feature of the Indus Valley Civilization, the like of which has not yet been found in any other city of the same antiquity."

ধ্বংসাবশেষে যে সব বিশালাকার অট্টালিকা পাওয়া গিয়েছে, এতকাল পর্যন্ত ধারণা ছিল এগুলি সম্ভবতঃ দেবমন্দির ছিল। বর্তমানে মনে করা হচ্ছে, এগুলি ছিল জন সমাবেশ ক্ষেত্র অথবা উচ্চপদস্থ কর্মচারী, পুরোহিত শ্রেণী সম্মানিত ব্যক্তিদের বাসস্থান।

স্নানাগারের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য মহেঞ্জোদড়োর স্নানাগারটি। "The Great Bath which has been taken to be a part of a vast hydropathic establishment is a swimming bath on a scale which would do credit to a modern seaside hotel." সমগ্র স্নানাগারটির আয়তন ছিল ১৮০'×১০৮'। কেবলমাত্র স্নানাগারটির পরিমান হ'ল ৩৯'×২৩', গভীরতা ৮'। স্নানাগারটির প্রবেশ পথ ছিল ছয়টি। এই স্নানাগারটি ছিল ঠাণ্ডা জলের। এরই দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছিল উষ্ণ জলের আরেকটি স্নানাগার।

যাই হোক, সুবিন্যস্ত নগর পরিকল্পনা, পানীয় জলের নিখুঁত ব্যবস্থাপনা, পয়ঃ-প্রণালীর উন্নত ব্যবস্থা, রাস্তায় আলোর বন্দোবস্ত, নগরের শান্তি রক্ষায় রক্ষীবাহিনীর নিয়োগ – সব মিলিয়ে সিন্ধু সভ্যতা এক অতি আধুনিক পৌর জীবনের পরিচয় বহন করছে।

॥ সামাজিক ও অর্থ নৈতিক জীবন ॥

নিঃসন্দেহে সিন্ধু সভ্যতা হ'ল নগর কেন্দ্রিক। তাছাড়া বিভিন্ন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে জানা গিয়েছে, মহেঞ্জোদড়োতে চার শ্রেণীর মানুষের বসবাস ছিল। যথা : প্রোটো অস্ট্রালিড্ (Proto-Australoid), মেডিটেরিয়ান (Mediterranean), মঙ্গোলিড্ (Mangoloid) এবং এ্যাল্‌পিনিড্ (Alpinoid)। এই যে বহু জাতির সম্মেলন হয়েছিল মহেঞ্জোদড়োতে তার কারণ হ'ল স্থল ও জল পথে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা।

লোকেরা কৃষিকাজ জানতো। উৎপন্ন দ্রব্য ছিল যব, গম, ধান, নানা ধরনের ফল। তারা মাছ-মাংস খেত, দুধ পান করতো। তাই পশু পালনের প্রচলন ছিল। গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল গরু, মহিষ, হাতি, শূকর ও উট। সম্ভবতঃ ঘোড়ার ব্যবহারও তারা জানতো।

তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সম্পর্কে সঠিক কিছু জানা যায় না। তবে তারা দেহের উপরের এবং নীচের অংশের জন্য পৃথক পৃথক পোষাক পরিধান করতো। চুলের প্রসাধনে নারী ও পুরুষ উভয়েই যথেষ্ট সজাগ ছিল। পুরুষদের মধ্যে দাড়ি রাখার প্রচলন ছিল। তারা মেয়ে-পুরুষ উভয়েই সোনা, রূপা, তামার তৈরী নানা রকমের অলংকার ব্যবহার করতো। তারা বিভিন্ন প্রসাধন দ্রব্যও যে ব্যবহার করতো এমন নজিরও পাওয়া গিয়েছে। নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের মধ্যেও তাদের পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। গৃহসজ্জার জন্য আধুনিক আসবাব-পত্রেরও প্রচলন ছিল। মার্বেল, বল ও পাশা ছিল তাদের প্রিয় খেলা। তাছাড়া শিকার ও ষাঁড়ের লড়াই ছিল জনপ্রিয় প্রমোদানুষ্ঠান। শিশুদের নানা রকম খেলনার ধ্বংসাবশেষ ও পাওয়া গিয়েছে। গরুর গাড়ীই ছিল প্রধান যানবাহন।

ওজন ও পরিমাপের জন্য সম্ভবতঃ কিউবিক প্রথার প্রচলন ছিল। আবার এমন সব স্কেল পাওয়া গিয়েছে যা থেকে মনে হয় তারা ফুটের পরিমাপও জানতো।

তাদের ব্যবহৃত নানা ওষুধ পত্রের মধ্যে ছিল শিলাজিৎ নামে একজাতীয় তরল পদার্থ, যা পেটের অসুস্থতা, বহুমূত্র প্রভৃতি রোগে ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া মাছের কাঁটা, হরিণের শিং নিমগাছের ডাল ইত্যাদির ব্যবহারও ছিল।

তাদের ব্যবহৃত অস্ত্র-শাস্ত্রের মধ্যে ছিল তীর-ধনুক, ছোরা তরবারী, কুঠার ইত্যাদি। এগুলো তামা বা ব্রোঞ্জের নির্মিত ছিল।

মহেঞ্জোদড়োর সঙ্গে বহির্দেশের যোগাযোগও ছিল। দক্ষিণ ও পূর্ব ভারত, কাশ্মীর, মহীশূর, নীলগিরি পর্বতমালা প্রভৃতি অঞ্চলের সঙ্গে যেমন তাদের যোগাযোগ ছিল, তেমনি বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল সুমের, মিশর, ক্রীটের সঙ্গেও। বিভিন্ন ধরনের নৌকো ও জাহাজের ধ্বংসাবশেষ থেকেও এ ধারণা বদ্ধমূল হয়।

ধ্বংসাবশেষ থেকে মহেঞ্জোদড়োর জনসংখ্যাকে আমরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত করতে পারি। যথা: শিক্ষিত শ্রেণী, যোদ্ধা শ্রেণী, ব্যবসায়ী ও শিল্পী শ্রেণী এবং সাধারণ শ্রমিক শ্রেণী। শিক্ষিত শ্রেণী বলতে পুরোহিত, চিকিৎসক ও ভবিষ্যৎ বক্তাদের বোঝাত। যারা দেশ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলো তারাই ছিল যোদ্ধা শ্রেণী। স্বর্ণকার কুম্ভকার প্রভৃতি ছিল শিল্পী শ্রেণীভুক্ত। আর কৃষক মৎসজীবী, ভৃত্য—এরা ছিল চতুর্থ শ্রেণীভুক্ত।

॥ শিল্পকলা ॥

সিন্ধু সভ্যতার শিল্পকলা শুধুমাত্র শিল্পসৃষ্টির তাগিদেই গড়ে ওঠে নি। ব্যবহারিক

প্রয়োজনেই শিল্পসৃষ্টি হয়েছে। তবুও এই সভ্যতার শিল্প নিদর্শন পাওয়া যায় বিভিন্ন মূর্তিতে, শীলমোহর বা অন্যান্য জিনিসে।

খনন কার্যের ফলে প্রাপ্ত মূর্তির মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নৃত্যরতা এক নারীর মূর্তি। মূর্তিটি সম্পর্কে একজন ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন, "Though more impressionistic in style than the stone sculptures, this figure, which is cast in one piece, astonishes one by the ease and naturalness of its posture."

শীলমোহরে খোদিত নানা জন্তু জানোয়ারের চিত্র, যা তাদের অপূর্ব শিল্পচাতুর্যের প্রমাণ দেয়। হরপ্পায় প্রাপ্ত দুটি মূর্তি ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে সাম্প্রতিক মনোভাবকে বিশেষভাবে আলোড়িত করেছে। বলা হয়েছে "In the opinion of eminent art critics, for pure simplicity and feeling nothing to compare with this masterpiece was produced until the great age of Hellas."

এ সময়ের মানুষেরা যে বয়ন শিল্পের সঙ্গেও পরিচিত ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মৃৎশিল্পেও ছিল তারা বিশেষ উন্নত। সিন্ধুনদের পলিমাটীর সঙ্গে বালি মিশিয়ে চাকায় ঘুরিয়ে তারা মাটির জিনিস তৈয়ারী করতো। শীলমোহর নির্মাণেও তারা যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। নানা আকারের শীল সাধারণতঃ নরম মাটি, হাতির দাঁত ইত্যাদি দিয়ে তৈরী হ'ত। কিন্তু ঠিক কি কাজে এই শীলমোহরগুলি ব্যবহৃত হ'ত তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যায় না।

॥ ধর্ম ॥

ধ্বংসাবশেষে এই সময়কার ধর্মীয় জীবন ও ধর্ম সম্পর্কে কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। এটা সত্যিই বিস্ময়কর, বিশেষ করে ভারতীয় পটভূমিকায় যেখানে যুগ থেকে যুগান্তরে ধর্মের প্রাধান্য অবিসম্বাদিতভাবে প্রতিষ্ঠিত। তবে সিন্ধু সভ্যতার ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করার উৎসই হ'ল বিভিন্ন শীলমোহর মূর্তি ইত্যাদি।

প্রথমতঃ বিভিন্ন উপকরণে যে নারী মূর্তির বাহুল্য দেখা যায় তা থেকে মনে হয় তারা মাতৃকা দেবীর পূজা করতো। তিন মুখ-ওয়ালা যে মূর্তি পাওয়া গিয়েছে তাকে শিব মনে করা যুক্তি সম্মত। কেননা শিব ত্রিমূর্তি, শিব পশুপতি এবং শিব মহাযোগী। এই নামগুলির সঙ্গে ঐ মূর্তিটির যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া যোনি ও লিঙ্গ পূজার প্রচলনও ছিল। বিভিন্ন পশুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করাও হ'ত। আবার গাছপালা, জল আগুনও পূজিত হ'ত। পূজানুষ্ঠানে যজ্ঞও করা হ'ত।

॥ মৃতদেহের সৎকার ॥

মহেঞ্জোদড়োতে সাধারণতঃ তিনভাবে মৃতদেহের সৎকার করা হ'ত। কখনো মৃতদেহ চিরতরে সমাহিত করা হ'ত। কখনো মৃতদেহ বনে-জঙ্গলে ফেলে রাখা হ'ত জন্তু-জানোয়ারের ভক্ষণের জন্য, তারপর অবশিষ্টাংশ সমাহিত করা হ'ত। আবার কখনো মৃতদেহ অস্থায়ীভাবে রাস্তার বা গৃহকোণে সমাধিস্থ করা হ'ত।

॥ সিন্ধু সভ্যতার ভাষা ॥

পণ্ডিতদের মতে সিন্ধু সভ্যতার অক্ষর হ'ল চিত্রলিপি। এই চিত্র লিপির বৈশিষ্ট্য হ'ল, এগুলি খুব স্পষ্ট ও সোজা এবং প্রতীক চিহ্নের বাহুল্য। সাধারণভাবে ডান থেকে বাঁ দিকে লেখা হ'ত। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এই ভাষার পাঠোদ্ধার এখনো সম্ভব হয় নি। তবে রাও বাহাদুর দীক্ষিত বলেছেন, অন্যান্য দেশের এই ভাষার সাদৃশ্য থাকলেও "the Indus script developed independently on Indian soil." যাই হোক পণ্ডিতেরা এখানো বহুভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছেন, এই ভাষার মর্ম কথা উদ্ধার করতে। তা হলে হয়তো এই সভ্যতা সম্পর্কে আরও অনেক অজ্ঞাত দিগন্ত উন্মোচিত হ'ত।

॥ সভ্যতার প্রাচীনত্ব ॥

স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য থাকা সত্ত্বেও সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতার সঙ্গে তার যোগাযোগ অত্যন্ত স্পষ্ট। সিন্ধু সভ্যতায় কোন লৌহের ব্যবহার ছিল না। এর থেকেই অনুমান করা যায়, এই সভ্যতা খৃষ্ট পূর্ব দুই হাজার বৎসরেরও পূর্বের। কারণ ঐ সময়ের আগে মধ্য প্রাচ্যেও লৌহের প্রচলন হয় নি। সুমের ও মেসোপটেমিয়া সভ্যতার সঙ্গে এই সভ্যতার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

খননকার্যের দ্বারা মহেঞ্জোদড়োর অট্টালিকার সাতটি স্তর পাওয়া গিয়েছে। এই স্তরগুলিকে আমরা প্রাচীন, মধ্য ও পরবর্তী এই তিন যুগে ভাগ করে নিতে পারি। এই যুগভাগ অনুসারে, প্রাচীনতম অধ্যায়টি জলের নীচে ফলে আমাদের অনুসন্ধান সামর্থের বাইরে। যে ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে বলা হয় হরপ্পা সভ্যতা। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে পণ্ডিতেরা অনুমান করেন হরপ্পা সভ্যতার সময়-কাল হ'ল খৃষ্ট পূর্ব ২৮০০—২৫০০ এর মধ্যে। এর থেকেই মনে হয় এই সভ্যতার প্রাচীনতম অধ্যায় খৃষ্ট পূর্ব ৩৫০০ বৎসর পূর্বেকার।

॥ সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা ॥

এই সভ্যতায় ঘটেছিল নানা জাতির সমন্বয়। ফলে এই সভ্যতার স্রষ্টা কারা এ নিয়েও রয়েছে মতদ্বৈধতা। কেউ বলেন দ্রাবিড়, কারো মতে ব্রাহু কিংবা সুমেরীয় অথবা আর্যরা হবেন এই সভ্যতার ধারক ও বাহক।

অধিকাংশেরই মত দ্রাবিড়দের পক্ষে। কিন্তু দ্রাবিড়দের মৃতদেহ সৎকার করার প্রথার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতায় মৃতদেহ সৎকার করার প্রথার কোন সঙ্গতি নেই। তাছাড়া দক্ষিণ ভারতে খননকার্যের দ্রাবিড় সভ্যতার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে তার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার কোন মিল নেই।

ব্রাহুগণ, দ্রাবিড় ভাষায় কথা বললেও, আসলে তাদের উৎস হ'ল তুরস্ক-ইরাণদেশীয়। তাছাড়া তারাই যে সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা এর স্বপক্ষে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণও নেই।

জন্ মার্শাল অবশ্য সিন্ধু সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের কোন সম্পর্ককে মেনে নিতেই চান নি। কারণ তাঁর মতে আর্যরা ভারতে এসেছে সিন্ধু সভ্যতার বহু পরে। তিনি আরও বলেছেন, আর্যরা সিন্ধু সভ্যতা থেকে শিবপূজা গ্রহণ করেছে এবং সিন্ধু সভ্যতার যুগে ঘোড়ার অনুপস্থিতি এবং মূর্তি পূজার প্রচলন মার্শালের সিদ্ধান্ত গ্রহণের উল্লেখযোগ্য কারণ। কিন্তু ডঃ ম্যাকে সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন থেকেই দেখিয়েছেন যে তখন ঘোড়া অপরিচিত ছিল না। আর মূর্তিপূজা সম্পর্কে ডঃ ম্যাকে বলেছেন যে ঋক্ বেদে যে মূর্তিপূজা বিরোধী ধর্মের কথা বলা হয়েছে তা সিন্ধু সভ্যতার আদিম পর্যায়েও থাকতে পারে। পরবর্তীকালে বহু জাতির সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তারা মূর্তি পূজা গ্রহণ করে। ঠিক যেমন করে সিন্ধু সভ্যতার মাতৃকা দেবী ঋক্ বেদে অদিতি ও পৃথ্বী নাম নিয়েছে।

যাই হোক এ প্রসঙ্গে যেমন কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নেবার মত তথ্য পাওয়া যায় নি, তেমনি ঋক্ বেদের যুগের আর্যদেরও সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা হিসেবে অস্বীকার করার পক্ষেও কোন জোরালো যুক্তি নেই। সঙ্গে সঙ্গে "It would not be correct to ascribe tho anthorship of the Indus valley culture to the Aryan or any other particular race. It represents the synthesis of the Aryan and non-Aryan cultures.

॥ সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি ও স্থায়িত্ব ॥

প্রায় চারশ' মাইল ব্যবধানে অবস্থিত মহেঞ্জোদড়ো ও হরপ্পা নগর দুটি যে একই সভ্যতার অংশীদার সে বিষয়ে কোন সংশয় নেই। এবং এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে সিন্ধু সভ্যতা "was neither local nor regional nor confined to any restricted area." পরবর্তীকালে আরও নানান জায়গায় খননকার্যের ফলে দেখা গিয়েছে যে সমগ্র সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশ, কাথিয়াড়ের অধিকাংশ অঞ্চল, উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উপত্যকা অঞ্চল এবং গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সিন্ধু সভ্যতা বিস্তৃত ছিল।

কিন্তু এমন সুবিস্তৃত ও সুসমৃদ্ধ সভ্যতা ধ্বংস হয়ে গেল কেমন করে। অনুমান করা হয়, ক্রমশঃ সিন্ধু অঞ্চলের আবহাওয়া শুষ্ক হয়ে যাওয়ায় এ অঞ্চল জনশূন্য হয়ে যায়। মহেঞ্জোদড়োতে বন্যার আশংকা যে জনশূন্যতার অন্যতম কারণ সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। তাছাড়া সে সময় ছিল না কোন সুদৃঢ় প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা, যার ফলে শান্তিপ্রিয় মানুষেরা বহিরাক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিহত করতে পারে নি।

সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কারের ফলে ভারতের ইতিহাস যে অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব তিন থেকে আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন তা প্রমাণিত হয়েছে। আর পুরাণে বলা হয়েছে, মহাভারতের যুদ্ধেই প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সমাপ্তি। আর সিন্ধু সভ্যতা যেহেতু এই যুদ্ধের পূর্ববর্তী ঘটনা সেই হেতু খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ বছর থেকে ১৪০৯ পর্যন্ত ভারতীয় ইতিহাসের ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ ছিল।

এই ধারাবাহিকতা যে অক্ষুণ্ন ছিল তার আরও প্রমাণ সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তীকালের ভারতীয় মুদ্রায় ঐ সভ্যতার শীলমোহরের প্রভাব সুস্পষ্ট, সুস্পষ্ট সিন্ধু সভ্যতার ওজন ও পরিমাপ ব্যবস্থার প্রভাব পরবর্তীকালে। এমন কি ধর্মীয় ক্ষেত্রেও পশুপতি শিবের মূর্তি সভ্যতার পরবর্তীকালেও বেঁচে রইলো, ধ্যানমগ্ন বুদ্ধের মূর্তিতেও রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার যোগাসনে শিব মূর্তির প্রভাব। সুতরাং সুযোগ কোথায় যে সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তীকালে ভারতের ইতিহাসে এক দীর্ঘ অধ্যায় ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন এমন সংশয় প্রকাশ করার ?

॥ আর্য্য সভ্যতার প্রভাব ॥

আগমন ও বিস্তৃতি—আর্য সভ্যতার স্বরূপ ও গতি-প্রকৃতি সম্পর্কে জানার উৎস প্রধানতঃ দুটি—প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান ও বৈদিক ও পরবর্তীকালের সাহিত্য। এবং এই দুই উৎস থেকেই অনুমান করা যায় যে খৃষ্টপূর্ব ১৫০০ নাগাদ যখন ভারতে সিন্ধু সভ্যতার সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটেছে তখন উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে আর্যগণ। প্রথমে তারা পাঞ্জাব অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করেছিল। এখন পর্যন্ত এরা মূলতঃ ছিল পশুপালক। তারপর তারা ক্রমশঃ কৃষিকাজের সঙ্গে অভ্যস্ত হয় এবং ছোট ছোট গ্রাম স্থাপন করে বসবাস আরম্ভ করে। এই সময় থেকেই ঋকবেদের ক্রমঃ-বিকাশ আরম্ভ হয়।

ঋকবেদে উল্লিখিত বিভিন্ন নদ-নদীর নাম থেকে আমরা এই সময়কার আর্যদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিচয় পাই। মনে হয় তখন পর্যন্ত তারা দিল্লীর পূর্বে আর অগ্রসর হয় নি। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য, বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারতের বর্ণনা থেকে আর্যদের অধিকতর সম্প্রসারণের পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা ঐ দুই মহাকাব্যে দুইটি সাগর ও হিমালয় ও বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ আছে। তাই বলা হয় যে এই সময় তারা সমগ্র গাঙ্গেয় উপত্যকায় ছড়িয়ে গিয়েছিল।

জলবায়ুর দিক থেকে এই অঞ্চল তখন ছিল আজকের তুলনায় অনেক বেশী আর্দ্র। আর ছিল জঙ্গলে পরিপূর্ণ। তাই প্রথম কয়েক শ' বৎসর আর্যদের বিস্তার ছিল তুলনামূলকভাবে শ্লথ। কেননা তখন পর্যন্ত তারা পাথর, ব্রোঞ্জ ও তামার তৈরী অস্ত্র-শস্ত্রের সাহায্যেই জঙ্গল পরিষ্কার করতো। লোহার ব্যবহার আরও পরবর্তীকালের ঘটনা। সম্প্রতি হস্তিনাপুরের খনন কার্যের ফলে মনে করা হয় তারা লোহার ব্যবহার আরম্ভ করে খৃষ্টপূর্ব ৭০০ নাগাদ। এবং লোহার ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে তাদের অগ্রগতি দ্রুততর হ'ল। শুধু তাই নয়। লোহার ব্যবহার কায়িক শ্রমকেও বহুলাংশে লাঘব করলো। ফলে তারা অতিরিক্ত সময় ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তা-চেতনায় ব্যয় করার সুযোগ পেল। ফলে ব্রাহ্মণ ও উপনিষদের রচনাও শুরু হ'ল এই সময় থেকে।

ঋকবেদে আমরা নানা গোষ্ঠীর নাম পাই। এইসব গোষ্ঠীর মধ্যে কলহ লেগেই থাকতো। তাছাড়া ক্রমশঃ ভারতের অভ্যন্তরে অগ্রসর হতে গিয়ে তাদের প্রতিহত

করতে হয়েছিল অনার্যদের, যাদের আর্যগণ দাস বলে অভিহিত করেছে। এই অনার্যগণ কালক্রমে আর্যদের ক্রীতদাসে পরিণত হয় এবং তাদের কৃষ্ণবর্ণের জন্য আর্যগণ তাদের নিম্নশ্রেণীর বলে মনে করতো। তাছাড়া উভয়ের মধ্যে ছিল ভাষাগত ও জীবন ধারণের পদ্ধতিগত পার্থক্য। একদিক থেকে ঐতিহাসিক রমিলা থাপারের মতে, "the coming of the Aryans was backward step, since the Harappan culture had been far more advanced than that of the Aryans who were as yet pre-urban. Northern India had to re-experience the process of evolving urban cultures from agrarian and nomadic systems."

॥ অর্থনৈতিক জীবনের বিকাশ ॥

আর্যরা মূলতঃ পশুপালক হিসাবেই ভারতে এসেছিল এবং দীর্ঘকাল পশুপালনই ছিল তাদের প্রধান জীবিকা। তখন গরুই ছিল পরিমাপের মানদণ্ড এবং এ সময়ই গরু ঈশ্বরিক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য পশুর মধ্যে ঘোড়ার বিশেষ মূল্য ছিল। কারণ দ্রুতগতিতে যাতায়াত, যুদ্ধ প্রভৃতি প্রয়োজনে তখন ঘোড়া ছিল অপরিহার্য। কিন্তু স্থায়ী বসবাসের ব্যবস্থার প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে জীবিকার ক্ষেত্রেও এল এক পরিবর্তন। লোহার ব্যবহার যেমন জঙ্গল পরিষ্কার করার কাজকে অধিকতর সহজ করে দিল, তেমনি কৃষিকাজকেও উৎসাহিত করলো। অবশ্য এ সব কাজে আগুনের সাহায্যও উল্লেখযোগ্য। তবে আর্যগণ কাঠ পুড়িয়ে ফেলার চেয়ে সংগ্রহ করতেই অধিক উৎসাহী ছিল। তার কারণও সহজেই অনুমেয়। প্রথমে কৃষিযোগ্য জমি ছিল সমগ্র গোষ্ঠীর যৌথ সম্পত্তি। তারপর গোষ্ঠীর বন্ধন ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসাতে জমি হ'ল পরিবারের সম্পত্তি এবং এভাবেই উদ্ভব হ'ল ব্যক্তিগত সম্পত্তির। আবার কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন জীবিকার ক্ষেত্রে নানা বৈচিত্র্য নিয়ে এল। যেমন সমাজে ছুতারদের মর্যাদা বহুগুণ বেড়ে গেল। কারণ যানবাহনের উপযোগী রথ নির্মাণ ছাড়া লাঙ্গল তৈরীর জন্য তারা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। তাছাড়া কাঠের সহজ লভ্যতার সুযোগে ছুতারের জীবিকা ক্রমশঃ বিশেষ আকর্ষণীয় হয়ে উঠলো। অন্যান্য জীবিকাগুলি হ'ল, কর্মকার, কুম্ভকার, চর্মকার ও তন্তুবায়।

অন্যদিকে কৃষিকাজের ক্রমিক সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হ'ল ব্যবসা-বাণিজ্য। জলপথই ছিল তখন ব্যবসা-বাণিজ্যের সহায়ক। তাই নদীর তীরে গড়ে উঠলো নতুন নতুন বসতি। যে সব জমিদার কৃষিকাজের জন্য অন্য লোক নিয়োগ করতে পারতো তারাই এখন হ'ল প্রধান ব্যবসাদার। এভাবে জমিদার শ্রেণী থেকেই উদ্ভুত হ'ল ব্যবসায়ী সম্প্রদায়।

॥ রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিকাশ ॥

নানা পৌরাণিক কাহিনী থেকে আমরা আর্যদের রাজনৈতিক জীবনের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে জানতে পারি। প্রথমে আর্য গোষ্ঠীগুলি ছিল পিতৃতান্ত্রিক এবং

গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন গোষ্ঠীপতি। কিন্তু পরে যখন নিরাপত্তার প্রশ্ন এল, তখন থেকে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান যে তাকেই গোষ্ঠী প্রধান হিসেবে নির্বাচিত করা হ'ত এবং তিনিই ক্রমশঃ রাজকীয় মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে লাগলেন। অবশ্য তার সম্প্রসারণশীল ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণাধীন রাখবার জন্য ছিল সভা ও সমিতি নামে দুটি সংস্থা। সভা সম্ভবতঃ ছিল গোষ্ঠীর বয়স্কদের নিয়ে গঠিত আর সমিতি ছিল গোষ্ঠীর সবাইকে নিয়ে গঠিত। যে সমস্ত গোষ্ঠীর কোন অধিপতি থাকতো না, সেখানে এই দুটি সংস্থাই সব কিছু পরিচালনার ভার গ্রহণ করতো।

এই সময় প্রকৃতপক্ষে রাজা ছিলেন একজন সমর বিশারদ্ নেতা এবং তার যোগ্যতার পরিমাপও হ'ত সমর নৈপুণ্যের সাহায্যে। তিনি মানুষের কাছ থেকে নানা উপঢৌকন গ্রহণ করতেন, কিন্তু কোন নিয়মিত কর সংগ্রহ ব্যবস্থা ছিল না। জমির উপর তার কোন দাবী ছিল না। কেবল সফল সমর-অভিযানের লভ্যাংশের একাংশের উপর তার অধিকার ছিল। প্রথমে ধর্মীয় অনুষ্ঠানে রাজার কোন ভূমিকা ছিল না। কিন্তু রাজা ঈশ্বরেরই প্রেরিত প্রতিনিধি এমন মতবাদ জনপ্রিয় হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার পরিবর্তন হ'ল। রাজপদও ক্রমশঃ পুরুষানুক্রমিক হ'ল এবং তার কর্তৃত্ব ক্রমশঃ অপ্রতিহত হয়ে উঠতে লাগলো।

এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করেই প্রশাসনিক পরিবর্তন এল। এখন সমগ্র রাজ্যকে জন, বিশ ও গ্রাম—এই তিন অংশে বিভক্ত করা হ'ল। পরিবারকে বলা হ'ল কুল এবং এর প্রধানকে কুলপা। রাজকার্যে সহায়তা করার জন্য গঠিত হ'ল বয়স্কদের নিয়ে এক মন্ত্রণা সভা। 'রাজার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন দু'জন কর্মচারী —পুরোহিত ও সেনানী। এভাবে ধীরে ধীরে একটি সামগ্রিক প্রশাসনিক কাঠামো সংগঠিত হতে লাগলো :

॥ সমাজ—জাতিভেদ প্রথা ॥

আর্যগণ যখন প্রথম ভারতে এল তখন তাদের সামাজিক শ্রেণী ছিল ত্রিধা বিভক্ত। যথাঃ যোদ্ধা বা অভিজাত শ্রেণী, পুরোহিত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ। তখন পর্যন্ত জাতিভেদ প্রথা ছিল না। বিভিন্ন জীবিকা ছিল না পুরুষানুক্রমিক, কিংবা বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিক সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও কোন বাধা নিষেধ ছিল না। আসলে এই শ্রেণী বিভাগের উদ্দেশ্য ছিল সুষ্ঠু সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলা।

কিন্তু তাদের ভেতর জাতিগত সচেতনতা ক্রমশঃ দৃঢ় হতে থাকে ভারতে আসার ফলে অনার্যদের সংস্পর্শে আসার পর থেকে। কারণ ভয়ে কিংবা নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে আর্যরা ছিল অনার্যদের সম্পর্কে অত্যন্ত বেশী স্পর্শকাতর। এই স্পর্শকাতরতা থেকেই জাতিভেদ প্রথার উদ্ভব।

বস্তুতঃ পক্ষে আমরা এ সময় যে চার বর্ণের উল্লেখ দেখি তা ব্রাহ্মণদেরই তৈরী। উদ্দেশ্য হল, বিভিন্ন বর্ণের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রের পরিচয় দান। তাই প্রথম তিন বর্ণ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপনায় কোন বাধা ছিল না। অবশ্য আর্যরা যখন পশুপালন ছেড়ে কৃষি কাজকেই জীবিকা হিসেবে গ্রহণে অভ্যস্ত হয়ে গেলো তখন এই সামাজিক শ্রেণী বৈষম্যের প্রয়োজন আরও তীব্র ভাবে অনুভূত হ'ল। কেননা এতদিন যারা কৃষক তারাই ব্যবসায়ী হয়ে যৌথ দায়িত্ব পালন করতো। কিন্তু এখন কৃষি ও ব্যবসা উভয়েরই ক্রমিক সম্প্রসারণের ফলে কৃষি ও ব্যবসা উভয়ের দায়িত্বও পৃথক পৃথক ভাবে গ্রহণ করার প্রয়োজন হ'ল। তাই আর্য সমাজের বৈশ্য যারা এতকাল কেবল কৃষিকাজ নিয়েই থাকতো তারা এবার পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যবসায়ীর ভূমিকা গ্রহণ করলো। আর শূদ্র, যারা অনার্য এবং আর্যদের ক্রীতদাস ছিল, এবারে কৃষকের পর্যায়ে উন্নীত হ'ল।

এই যে সামাজিক পরিবর্তন এর সুদূর প্রসারী প্রভাব সম্পর্কে ব্রাহ্মণেরাও ক্রমশঃ সচেতন হয়ে উঠ্তে লাগলো। তাই তারা যে বর্ণ শ্রেষ্ঠ এই মর্যাদাকে রক্ষা করার জন্য তারা ধর্মের সাহায্য নিয়ে ঘোষণা করলেন, পৃথিবীতে সাধারণ মানুষের মঙ্গলামঙ্গল সাধনের সামর্থ কেবলমাত্র তাদের মধ্যেই সীমিত। ফলে সম্ভবতঃ তাদেরই অতি আগ্রহে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ জন্মগত ব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ালো।

॥ সামাজিক ব্যবস্থাপনা ॥

সমাজের ভিত্তি হ'ল পরিবার। কতকগুলি পরিবার নিয়ে গঠিত হ'ত গ্রাম। এ সময় যৌথ পরিবার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বাল্য বিবাহ জনপ্রিয় ছিল না, তবে সঙ্গী নির্বাচনে পাত্র-পাত্রীর স্বাধীনতা ছিল। পণ প্রথাও ছিল। সাধারণভাবে নারীর স্বাধীনতা স্বীকৃতি ছিল। কিন্তু গ্রীক দেবীগণ যেমন প্রভূত ক্ষমতার অধিশ্বরী ভারতীয় আর্যদের দেবীগণ তা নয়। বিধবাদের আত্মশোধনের প্রয়োজনে বিভিন্ন বিধি নিষেধ মেনে চলতে হ'ত। অবশ্য বিধবা বিবাহের নজীরও দুর্লভ নয়।

বাসগৃহ সাধারণতঃ কাঠ দিয়ে তৈরী হ'ত। পরবর্তীকালে মাটী দিয়ে দেওয়াল নির্মাণ ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। প্রধান খাদ্য দ্রব্য ছিল দুধ, ঘি, শাকসব্জী, ফল-মূল ইত্যাদি। উৎসব-অনুষ্ঠানে মাংস ভক্ষণ ও সুরাপান অনুমোদিত ছিল। পোষাক পরিচ্ছদ ছিল খুবই সাধারণ। তবে অলংকার ব্যবহার ছিল খুবই জনপ্রিয়। অবকাশ যাপনে নাচ-গান, জুয়া খেলা, রথ প্রতিযোগিতা প্রভৃতি জনপ্রিয় ছিল।

॥ সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

বহুদিন পর্যন্ত আর্যদের কোন হস্তাক্ষর ছিল না। ৭০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ নাগাদ প্রথম তারা এ কৌশল আয়ত্ত করে এমন নজীর পাওয়া যায়। বৈদিক যুগে তাই শিক্ষা

ছিল মূলতঃ মৌখিক। ব্রহ্মচর্যাশ্রম ব্যবস্থার সূত্রপাত এ সময়েই। শিক্ষা ছিল সমাজের উচ্চ বর্ণের জন্য। এবং বেদ প্রধানতঃ ব্রাহ্মণগণই অধ্যয়ন করতো।

॥ ধর্মীয় জীবন ॥

পরিদৃশ্যমান জগতে যা কিছু ছিল নিয়ন্ত্রণ ও উপলব্ধির বাইরে তাই ছিল আর্যদের পরম ভীতির কারণ এবং তাই দেবত্বে উত্তীর্ণ। তাই তাদের দেবতা ইন্দ্র, অগ্নি, সূর্য, যম প্রভৃতি। আর্যদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের অপরিহার্য অঙ্গ হ'ল যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য হ'ল দেবতাদের আশীর্বাদ অর্জন। এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক মন্তব্য করেছেন : The sacrifice was certainly a solemn institution, but it also served the purpose of releasing energies and inhibitions, through the general conviviality which fallowed at the end of the sacrifice and particularly after the liberal drinking of 'soma'." এইসব অনুষ্ঠানের ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতিপত্তি আরও বেড়ে গেল। কারণ লোকে বিশ্বাস করতো, কেবলমাত্র ব্রাহ্মণদের মাধ্যমেই দেবতা অদৃশ্যভাবে মর্তে অবতীর্ণ হতেন। বেড়ে গেল রাজাদের প্রয়োজনও। কারণ এইসব ব্যয় বহুল অনুষ্ঠান উদযাপন করা রাজাদের পক্ষেই সম্ভব ছিল। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল, যাগযজ্ঞের প্রয়োজনেই সে সময়কার মানুষের গণিত শাস্ত্র সম্পর্কীত জ্ঞানের ক্রমবিকাশ হ'ল, এবং পশুবলীর প্রয়োজনে শারীর বিদ্যা নিয়েও চর্চা আরম্ভ হ'ল।

আর্যগণ মৃতদেহ প্রথম দিকে কবর দিত। কিন্তু শেষের দিকে দাহ করার প্রথা প্রচলিত হ'ল। অবশ্য দাহ করার ব্যবস্থা যতই স্বাস্থ্য-সম্মত হোক না কেন, এর ফলে সবচেয়ে বেশী বঞ্চিত হলেন ঐতিহাসিকেরা। কেননা চীন বা মিশর দেশের কবর দেওয়ার ব্যবস্থা থাকলে সেই সময়কার মৃতদেহ আজ ঐতিহাসিকের সম্মুখে অনেক অজানা তথ্যের দ্বার উন্মোচন করে দিত। আর্যগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করতো। এ বিশ্বাস থেকেই এল কর্মফলবাদ। আর এই কর্মফলবাদ দিয়ে নানা তাত্ত্বিক ও দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের পরিণতি হ'ল আরণ্যক ও উপনিষদ।

॥ আর্য সভ্যতার মূল্যায়ন ॥

ভারতের ইতিহাসে সুদূর অতীতের এক গৌরবোজ্জল অধ্যায় হিসেবে আর্য সভ্যতা পরিচিত। কিন্তু এ সময়কার ইতিহাস রচনা যেমন অনিশ্চয়তা তেমনি অপূর্ণতার সম্ভাবনা পূর্ণ। কিন্তু ভারতের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনে আর্য সভ্যতার অবদান অবিস্মরণীয়। আর্যরাই ভারতের জীবনাদর্শ গড়ে তুলেছে। আর্যরা আমাদের কেবল সংস্কৃত ভাষা বা জাতিভেদ প্রথা বা ধর্মীয়-অনুষ্ঠান পদ্ধতি, বা দার্শনিক চিন্তাধারাই আমাদের দিয়ে যায় নি, সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গলে পূর্ণ ভারতের বহু অঞ্চল পরিষ্কার করে তারা তাকে কৃষিযোগ্য করে তুলেছে।

ক্রমশঃ সংস্কৃত ভাষা শিক্ষিত ও উচ্চ শ্রেণীর ভাষায় রূপান্তরিত হ'ল। ফলে আরম্ভ হ'ল ভারতে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে ব্যবধান রচনা, উচ্চ ও নীচু শ্রেণীর মধ্যে ভেদাভেদ।

আর্যদের জাতিভেদ প্রথা আজ দুই হাজার বছর পরেও ভারতে সমান সক্রিয়। এই প্রথার উপর ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছে ভারতের রাজনৈতিক কাঠামো। এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল আর্য সভ্যতাকে ভিত্তি করেই। অস্বীকার করার উপায় নেই, "The development of India as we know it, stems from the impetus of the coming of the Aryans and the culture they brought." অবশ্য এরসঙ্গে আরও অনেক ঘটনার ঘনঘটা এবং সংঘাত নিশ্চয়ই ছিল। এবং ছিল বলেই ইতিহাস যেন এক বহতা নদী।

॥ অশোক ও তাঁর "ধর্ম" ॥

॥ ভূমিকা ॥

দেশে-বিদেশে বহু ঐতিহাসিকের বিপুল বন্দনায় বন্দিত ভারতের ইতিহাসের সম্রাট অশোক। এই বন্দনা বহু ক্ষেত্রে অশোককে প্রায় দেবত্বে উত্তীর্ণ করেছে। ফলে এই পৃথিবীরই একজন benevolent despot হিসেবে অশোকের মৃত্যুঞ্জয়ী কীর্তি কাহিনীর যথাযথ মূল্যায়ন বারংবার বিঘ্নিত হয়েছে। এমনি একটি উপেক্ষিত দিক হ'ল রাষ্ট্রনীতির প্রবক্তা হিসেবে অশোকের কৃতিত্ব নিরূপণ।

॥ অশোকের মতবাদ ॥

আজকের ভারতবর্ষের অশোক যে মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত তার পেছনে আছে ভারতীয় রাষ্ট্র ও সমাজ সম্পর্কে তাঁর অভিনব মতবাদ। এই মতবাদই হ'ল তাঁর 'ধম্ম'। প্রাকৃত শব্দ 'ধম্ম' এসেছে সংস্কৃত 'ধর্ম' শব্দ থেকে। শব্দটির অর্থ হ'ল Universal Law বা বিশ্বজনীন নীতি, আর একটু ব্যাপক করে বললে সামাজিক ও ধর্মীয় নির্দেশনামা। অবশ্য অশোক শব্দটিকে ব্যবহার করেন আরও বৃহৎ অর্থে।

এতাবৎকাল অশোক সম্পর্কে আলোচনার উৎস ছিল দুটি: সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কীয় রচনাবলী ও অশোকের বিভিন্ন শিলালিপি। ফলে অশোককে একজন গোঁড়া বৌদ্ধ ধর্মীয় বলেই চিত্রিত করা হয়েছে। কলিঙ্গ যুদ্ধের পরবর্তীকালে তাঁর নাটকীয় ভাবে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ এই মতকে আরও দৃঢ় ভিত্তি দান করেছে। কিন্তু অশোক নিঃসন্দেহে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং একজন একনিষ্ঠ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীতেও যে রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাতেও সন্দেহ নেই। "But the Buddhism of his age was not merely a religious belief; it was in addition a social and intellectual movement at many levels, influencing many aspects of society." এবং এমন পারিপার্শ্বিকতায় একজন সত্যিকারের রাষ্ট্রনেতা এই আন্দোলনের প্রবাহ থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেন না। অশোকের যথার্থ মূল্যায়নের স্বার্থে এই পটভূমিকাটি আমাদের স্মরণে রাখতে হবে।

অশোকের শিলালিপিগুলিকে দুইভাগে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। কিছু সংখ্যক শিলালিপি ছিল বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী রাজা হিসেবে বৌদ্ধ মঠের প্রতি নির্দেশনামা এইসব ক্ষেত্রে অশোকের কণ্ঠস্বর যেন কিঞ্চিত অসহিষ্ণু এবং অন্ধ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর। কিন্তু তাঁর অন্য শিলালিপি ছিল পর্বত গাত্রে কিংবা সম্ভাব্য জন-সমাগমের স্থান সমূহে স্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ। এই শিলালিপিগুলি সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রচারিত। এবং এগুলো থেকেই 'ধম্ম' সম্পর্কে অশোকের মনোভাব পরিষ্কার জানা যায়।

॥ মতবাদের মূল কথা ॥

'ধম্ম' বলতে অশোক সাধারণ ধর্মীয় বিশ্বাস থেকে কিছু সৎ কর্ম সম্পাদনকে বোঝান নি। বরং তিনি বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্ববোধকেই বুঝাতে চেয়েছেন। অতীতে ঐতিহাসিকেরা অশোকের 'ধম্ম'কে বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে একাকার করে দিয়ে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে আশোকের ধম্মের লক্ষ্যই ছিল বৌদ্ধ ধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করা। কিন্তু এমন সিদ্ধান্ত প্রশ্নাতীতভাবে মেনে নেওয়া চলে না। কারণ "Dhamma' was aimed at building up an attitude of mind in which social responsibility, the behaviour of one person towards another, was concidered of great relevance. It was a plea for the recognition of the dignity of man and for a humanistic spirit in the activities of society."

॥ মতবাদের বিবর্তন ॥

কিন্তু অশোকের এমন মতাদর্শ গ্রহণের পটভূমিকা কি? অবশ্যই তিনি মনে মনে এমন একটি আদর্শকেই লালন পালন করেছিলেন। কিন্তু এর চেয়েও বড় কথা সম-সাময়িক সমস্যাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে অশোক স্থির সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে তাঁর 'ধম্ম' নামক মতাদর্শ সেই সমস্যার একমাত্র সমাধান। সাধারণ ভাবে মৌর্যগণ ছিলেন প্রচলিত ধর্মের বিরোধী। কিন্তু তাই বলে তারা কখনো ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেন নি। তা হলেও বিভিন্ন ধর্ম সে সময়কার সমাজ ব্যবস্থায় নানা সংঘাত সৃষ্টি করছিল। তা ছাড়াও ছিল নানাবিধ সমস্যা। যেমন সমাজে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি, শহরাঞ্চলে ধনিক সম্প্রদায়ের অপ্রতিহত ক্ষমতা, সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা এবং সাম্রাজ্যের ব্যাপক বিস্তৃতি—সব মিলিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তখন। তাই তাৎক্ষণিক প্রয়োজন ছিল এমন এক দৃষ্টিভঙ্গী যা এইসব পরস্পর বিরোধিতার মধ্যেও এক সুসংহত রূপ দান করতে পারে, বিরোধের মধ্যেও ঐক্যের বোধ জাগ্রত করতে পারে। আর মৌর্যযুগের ভারতবর্ষের যা ছিল সংগঠন সেখানে একমাত্র রাজাই পারেন এই সংহতি সাধনের পথ প্রদর্শক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে। অশোকের কৃতিত্ব এই যে তিনি তাঁর সময়ের সমস্যার গভীরে অবগাহন করতে পেরেছিলেন, সমস্যার স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে পেরেছিলেন এবং সেই সমস্যার সমাধান হিসেবে একটি অভিনব মতবাদের প্রবক্তারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন।

॥ অশোকের 'ধম্মের' কর্মপন্থা ॥

ধম্মের নীতি সমূহ বিশেষ কোন ধর্মভিত্তিক নয়, বরং ধর্ম নিরপেক্ষ, সবার ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। এমন কি ধম্ম বলতে কতকগুলি অন্ধ অনুশাসনের বন্ধনকেও

বুঝায় না। এখানে সাধারণভাবে কতকগুলি নীতির উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলির উদ্দেশ্য হ'ল মানুষের আচরণগত পরিবর্তন সাধন।

যে মূল নীতিগুলির উপর অশোক বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন তার মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হ'ল সহনশীলতা। অশোকের মতে সহনশীলতা দু'রকমের—প্রথমে পারস্পরিক সহনশীলতা, তারপর বিভিন্ন মতবাদ সম্পর্কে সহনশীলতা। আদর্শগত মতান্ধতাকে দূর করে ঐক্যবোধ জাগ্রত করার প্রয়োজনেই অশোক এই সহনশীলতার উপর এত গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। অবশ্য এ কথা নিশ্চয়ই বলা যেতে পারে যে সহনশীলতাবোধ তখনই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে জাগ্রত হয়, যখন স্বাধীন ভাবে মতামত প্রকাশ করা যায় এবং মতদ্বৈধতাকে মেনে নেবার মত মানসিক ঔদার্যও অর্জন করা যায়। অন্যদিকে "To suppress differences merily aggravates the concealed tensions" তবুও অশোক এ পথই গ্রহণ করেছিলেন। তাতে এই সন্দেহ প্রকাশ করার সুযোগ থেকে যায় যে তিনি সম্ভবতঃ সেই সময়ের জনসাধারণের অসহিষ্ণু মনোভাব সম্পর্কে আতংকগ্রস্ত ছিলেন এবং তাই তিনি কোন উৎসবকে কেন্দ্র করে জনসমাগম নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন, কারণ এ ধরনের সমাবেশেই বিদ্বেষের বীজ অংকুরিত হয়।

অশোকের ধম্মের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য নীতি হ'ল অহিংসা। অশোক অহিংসা বলতে বুঝাতেন যুদ্ধ বর্জন এবং পশুহত্যা নিবারণ। আবার তিনি এমন অনিবার্য পরিস্থিতিকে মেনেও নিয়েছেন যখন হিংসার পথ গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তাই তিনি নিজে যেমন হিংসার পথ পরিত্যাগ করেছিলেন তেমনি আশা প্রকাশ করেছেন যে তাঁর উত্তরসূরীগণ যেন তাঁরই পথ অনুসরণ করে চলে এবং নিরুপায় হয়ে অস্ত্রধারণ করতে হলে সে ক্ষেত্রেও তারা যেন যতটা যতটা সম্ভব দয়া ও দাক্ষিণ্য প্রকাশে কার্পণ্য না করে।

অশোকের ধম্মের আরেকটি দিক হ'ল জনসাধারণের মঙ্গলসাধন। আজকের জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কার্যাবলী বলতে যা বুঝায় অশোক তাঁর ধম্মের মাধ্যমে সেগুলিই সম্পন্ন করেছেন। রাস্তার পাশে বৃক্ষরোপণ, কূপ খনন, সরাইখানা স্থাপন প্রভৃতি কার্যাবলী অশোকের জনকল্যাণ কামিতার বহিঃপ্রকাশ।

অশোক তাঁর ধম্ম সম্পর্কীত নীতিগুলোকে কার্যকরী করার উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করেছিলেন। এইসব কর্মচারীদের দায়িত্বই ছিল, জনসাধারণকে ধম্মের বিভিন্ন নীতি সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে তোলা। প্রকৃতপক্ষে কালক্রমে এইসব কর্মচারীগণই ধম্মের মূল প্রবক্তায় পরিণত হয়। ফলে এক সময় দেখা গেল, ধম্মের প্রসার ঘটাতে গিয়ে তারাই এক নতুন শ্রেণীর পুরোহিত সম্প্রদায়ে রূপান্তরিত হ'ল, যাদের প্রভাব জনজীবনে বহুল পরিমানে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এ ভাবেই একদা মূল যে মহান নীতির উপর ভিত্তি করে প্রবর্তিত হয়েছিল ধম্ম, তা ক্রমশঃ বিনষ্ট হয়েছিল।

॥ অশোকের ধর্ম্মের ফলশ্রুতি ॥

এটা খুবই দুঃখজনক যে সুগভীর একনিষ্ঠতা ও একাগ্রতা থাকা সত্ত্বেও অশোকের ধর্ম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই ব্যর্থতার জন্য অশোকের অতি আগ্রহও একটি কারণ হতে পারে। কিংবা রাজত্বের শেষভাগে তিনি তাঁর ধর্ম নিয়ে এমন আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন যে সেটাই তাঁর দুর্বলতাকে প্রকট করে তুলেছিল। তাছাড়া অশোক ভেবেছিলেন যে তাঁর ধর্ম্মই সমসাময়িক সকল সমস্যাবলীর প্রতিবিধানতার যুক্তিহীনতা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। কারণ সামাজিক বিভেদ ও সংঘাত যেমন ছিল তেমন থেকেই গেল। তাই "In a sense Dhamma was too vague a solution because the problems lay at the roots of the system." তথাপি সকল ব্যর্থতার মধ্যেও অশোকের কৃতিত্ব এইখানেই যে তিনি অবস্থা যথাযথ অনুধাবন করে একটি সুস্পষ্ট ব্যবস্থা গ্রহণে অগ্রণী হয়েছিলেন এবং সেই ব্যবস্থাবলীকে রূপায়িত করতেও সচেষ্ট হয়েছিলেন।

কেউ কেউ অশোককে এই বলে অভিযুক্ত করেছেন যে তাঁর ধর্মই মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনকে ত্বরান্বিত করেছিল, তাঁর অনুসৃত নীতি ব্রাহ্মণদের বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দিক থেকে তিনি বৌদ্ধধর্মাবলম্বীও ছিলেন না, আবার ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরোধীও ছিলেন না। এর প্রমাণ বহুক্ষেত্রে বহুভাবেই পাওয়া যায়। তাঁর বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ হ'ল, তাঁর অহিংসা নীতির ফলে মৌর্য সৈন্যবাহিনী হীনবীর্য হয়ে পড়েছিল। কিন্তু তাঁর অহিংস নীতি বাস্তববোধ বর্জিত ছিল না, কিংবা সৈন্যবাহিনীকে অক্ষম করে ফেলার মত কোন নীতিও তিনি গ্রহণ করেন নি।

সুতরাং অশোকের ধর্মের উপর মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের সকল দায়িত্বভার আরোপ না করে আমাদের অন্যদিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। এই দিক থেকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হ'ল মৌর্য অর্থনীতির উপর ক্রমবর্ধমান চাপ। বিশাল সৈন্যবাহিনী রক্ষণাবেক্ষণের ব্যয়ভার, কর্মচারীদের বেতনদান, নতুন নতুন স্থানে বসতিস্থাপন প্রভৃতি কারণে রাজকোষের উপর অত্যধিক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। মৌর্যযুগের শেষভাগে মুদ্রায় রৌপ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছিল। এটা মৌর্য অর্থনীতির ক্রমাবনতিরই পরিচায়ক। মৌর্য অর্থনীতি যদিও ছিল মূলতঃ কৃষি নির্ভর তথাপি এর ব্যতিক্রমও ছিল। ফলে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত হয়েছিল তেমনি কেবলমাত্র কৃষি থেকে সংগৃহীত রাজস্বও সাম্রাজ্য পরিচালনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না।

আসলে "An imperial structure reares two essentials—a well—organised administration and the political loyalty of the subjects." মৌর্য শাসন ব্যবস্থা যতই সুগঠিত হোক না কেন ঐ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল ব্যর্থতার সম্ভাবনা। সম্রাটকে কেন্দ্র করে সমগ্র প্রশাসনিক কাঠামো সংগঠিত হওয়ার ফলে সম্রাটের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র প্রশাসনিক আনুগত্যেরও পরিবর্তন হ'ত।

কর্মচারী নিয়োগ প্রথা উচ্চ পদাধিকারীদের অভিরুচি দ্বারা পরিচালিত। ফলে এই নিয়োগ ব্যবস্থা কথনো শ্রেণী স্বার্থ বা জাতিগত স্বার্থকে অতিক্রম করতে পারে নি। তাই প্রশাসনের সঙ্গে জন সমর্থন বা জনমতকে যুক্ত করার কোন সুযোগই ছিল না। বরং সাম্রাজ্যের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করার জন্য যে গুপ্তচর বাহিনী নিযুক্ত ছিল তারা সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করার পরিবর্তে তাকে ক্রমান্বয়ে নানাভাবে শক্তিহীন করে তুলছিল।

আর রাজনৈতিক আনুগত্য—সে তো অনেক গভীর বিষয় বলা হয়েছে, "The factor of political loyalty implies amongst its essentials loyalty to the State, the state being a concept which is over and above that of king and the Government. প্রাচীন ভারতে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির পতনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র বিষয়ক চিন্তাধারাও অবসান ঘটে। পরিবর্তে রাজতান্ত্রিক প্রথা ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হতে থাকে এবং আনুগত্য বোধ রাষ্ট্রের পরিবর্তে জাতি বা গোষ্ঠীকেন্দ্রিক হয়ে যায়। ফলে রাষ্ট্রের ভিত্তি ক্রমশঃ দুর্বল হতে থাকে, যেমন হয়েছিল মৌর্য সাম্রাজ্যের ক্ষেত্রেও।

॥ ভারতে মুসলমান আগমণের ফলাফল : রাজনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ॥

॥ ভূমিকা ॥ যুগে যুগে ভারতে বহু বিদেশী এসেছে, কথনো কথনো বন্ধুর বেশে, কথনো আক্রমণকারীর ভূমিকায় আবার কথনো শোষকের ছদ্মবেশে। কিন্তু কোন্ অসচেতন মুহূর্তে যেন বৃহৎ ভারত-আত্মায় তাদের স্থায়ী আসন সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রাচীন ভারতে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি জাতির ভূমিকার কথা আমরা জানি। যদিও তাদের প্রথমদিকে ম্লেচ্ছ বলে মনে করা হ'ত তথাপি যেহেতু তারা গোঁড়া হিন্দু প্রধান অঞ্চলে নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করে নি, সে কারণে ধীরে ধীরে ক্রমশঃ ভারতীয় জন-জীবনের সঙ্গে মিলে যাওয়া তাদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। তাছাড়া তারা নিজেদের সঙ্গে বিশেষ কোন ধর্মমত বা ধর্ম প্রচারক নিয়ে আসে নি। ফলে হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের সঙ্গে সম্মুখ সংঘাতের কোন কারণ ঘটে নি।

কিন্তু মুসলমানদের আগমণের সঙ্গে সঙ্গে অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়ে গেল। তারা এদেশে এল ইসলাম ধর্ম এবং একটি পৃথক জীবনযাত্রা পদ্ধতি নিয়ে। এর আগে অন্যান্য আক্রমণকারীর সঙ্গে সহাবস্থানের সুযোগে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের অনেক পরিবর্তন এসেছিল। কিন্তু ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন স্বাভাবিক হ'ল না। তবে পরিবর্তনের গতিপথকে স্তব্ধ করে দেওয়া যায় নি। যেমন মুসলমানগণ ধীরে ধীরে ভারতীয় খাদ্য ও পোষাকে অভ্যস্ত হয়ে যাচ্ছিল। আবার মুসলমান সমাজ-চিন্তা ভারতীয় জীবনযাত্রার অঙ্গীভূত হচ্ছিল।

একদিক থেকে মোঙ্গলগণ এই পারস্পরিক বোঝাপড়ার পথকে প্রশস্ত করেছিল। কারণ তাদের বারংবার ভারত আক্রমণের ফলে আফগানিস্থান ও পশ্চিম এশিয়া বিপুল সংখ্যায় বিদেশী এদেশে আসে নি। তাই ভারতে ইসলামকে বেঁচে থাকার জন্য মূলতঃ ধর্মান্তরিতদের উপরই নির্ভর করতে হ'ত। আবার ভারতীয়গণ ধর্মান্তরিত হলেও তাদের জীবনযাত্রার বিশেষ কোন পরিবর্তন হ'ল না। ফলে তৈরী হতে লাগলো ক্রমশঃ পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্রটি।

কিন্তু দেশের শাসক সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে চিত্রটি ছিল অন্যরকম। কোন কোন ক্ষেত্রে ধর্মীয় প্রধানদের নির্দেশানুসারে, কখনো কখনো রাজনৈতিক কারণে এই সম্প্রদায় সর্বদাই সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন এবং দূরবর্তী রাখতে চাইতো। "The call to Muslim loyalty or Hindu loyalty could always be used for purpose other than religious and this sentiment could be exploited when convenient."

॥ রাজনৈতিক ক্ষেত্র ॥

রাজনৈতিক ক্ষেত্র সম্পর্কে হিন্দুধর্মের প্রবক্তাদের ঔদাসীন্য সহজেই বুঝা যায়। সমাজ-জীবনের সংঘবদ্ধতা বজায় রাখতেই ছিল তাদের আগ্রহ। তাছাড়া রাজনৈতিক সংগঠনের দিক থেকে সুলতানী যুগের ব্যবস্থাপনা হিন্দুদের ব্যবস্থাপনার তুলনায় খুব একটা নতুন কিছু ছিল না। তাই বলে সুলতানী ব্যবস্থাপনা যে অন্ধভাবে ইসলাম-অনুসারী ছিল তাও নয়। যেমন রাজপদ সম্পর্কে দৈব বিশ্বাস ইসলাম-নির্দেশনানুগ নয়। কিন্তু যেহেতু এ বিশ্বাস ভারতে প্রচলিত ছিল তারা নিজেদের সুবিধার কারণে এটা মেনে নিয়েছিল। তবে এসব পরিবর্তনের জন্য ইসলাম ধর্মের প্রবক্তাদের অনুমোদন নিতে হ'ত। প্রবক্তাগণও এসব ক্ষেত্রে অনুমোদন দিতেন। শুধু শর্ত ছিল, সুলতানগণ এঁদের ধর্মীয় ক্ষেত্রে সর্বশক্তিমান বলে মেনে নেবেন। ফলে হিন্দুদের মত তাদের মধ্যেও এই বিশ্বাস ঘনপিনদ্ধ হ'ল যে রাজা দেশের নিরাপত্তার জন্য অপরিহার্য, তাঁর অনুপস্থিতির অর্থই বিশৃঙ্খলা। সুলতানগণও পরিবর্তে উলেমাদের সম্মান করতেন, মসজিদ তৈরী করে দিতেন, আবার কখনো বিধর্মীদের উপর অত্যাচার করে তাঁদের ধর্মানুরাগের পরিচয় দিতেন।

অবশ্য সব সুলতানই যে এমন ব্যবস্থা মেনে নিতেন তা নয়। এর ব্যতিক্রমও নিশ্চয়ই আছে আর ব্যতিক্রম হলেই উলেমারা আরও সতর্ক হতেন "Since it would have been impolitic in a country of non-believers to show any internal dissensions publicly." সুলতানগণ তাঁদের রাজ সভায় যে জাঁক জমক ও বিলাস-বহুলতার ব্যবস্থা করতেন, তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, শাসক ও শাসিতের মধ্যে দূরত্ব স্পষ্ট করে দেখানো।

উলেমাগণ যেভাবে ব্যাখ্যা করতেন সেই ব্যাখ্যা মত কোরাণের নির্দেশানুসারে

স্থলতানকে চলতে হ'ত। তাঁর প্রধান উপদেষ্টা ছিলেন কাজী বা বিচারক। সাধারণতঃ রাজধানী ও মুসলমান প্রধান শহরাঞ্চলে ইস্‌লামীয় আইন প্রযুক্ত হ'ত। হিন্দু এলাকাতে হিন্দু আইনই কার্যকারী হ'ত। এই দ্বিমুখী পদ্ধতি থাকার ফলে নানান অস্থবিধে দেখা দিত। শেষ পর্যন্ত স্থির হয় যে, প্রয়োজনমত যে কোন আইনই প্রয়োগ করা যেতে পারে। শুধু লক্ষ্যণীয় হ'ল, কোন অবস্থাতেই রাষ্ট্রের নিরাপত্তা যেন বিঘ্নিত না হয়।

আইনতঃ স্থলতান ছিলেন খলিফার প্রতিনিধি। কিন্তু কার্যতঃ তিনি ছিলেন স্বাধীন। অবশ্য তাঁর উপর কতকগুলি বাধানিষেধ আরোপিত ছিল। যেমন তাঁর, কর্মপন্থার পেছনে ইসলামের সমর্থন। কিন্তু ষষ্ঠদশ শতাব্দীতে আকবর যে এইসব বিধিনিষেধকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছিলেন এতে প্রমাণ হয় যে ততদিনে রাষ্ট্রীয় প্রশাসন ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে। যাই হোক, নিজের কর্তৃত্বকে প্রশ্নাতীত রাখতে স্থলতানকে উলেমা, অভিজাতবর্গ এবং সেনাপতিদের সর্বদাই সন্তুষ্ট করতে হ'ত।

সাধারণ প্রশাসনের সর্বোচ্চে ছিলেন উজীর বা প্রধানমন্ত্রী। ইনি রাজস্ব সংগ্রহ ও আয়-ব্যয়ের হিসেব তদারক করতেন। অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা সাধারণভাবে স্থলতানের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপর নির্ভর করতো। অপর দুইজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মচারী হলেন সামরিক বিভাগীয় প্রধান ও বিভিন্ন প্রদেশের সঙ্গে সংযোগ রক্ষাকারী প্রধান।

প্রাদেশিক শাসকদের ক্ষমতা দুটি অবস্থার উপর নির্ভর করতো—এক, রাজধানী থেকে নৈকট্য, দুই, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধির উপস্থিতি। তাছাড়া স্থলতানের সঙ্গে শাসকদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের উপরও নির্ভর করতো। প্রাদেশিক শাসনের সর্বনিম্ন সংগঠনটি হ'ল পরগণা। পরগণার জন্য ছিল পৃথক একদল কর্মচারী।

মোট কথা হ'ল, শাসনতান্ত্রিক কাঠামোর দিক থেকে হিন্দু ব্যবস্থার সঙ্গে মুসলমান ব্যবস্থার খুব একটা পার্থক্য ছিল না। কেবলমাত্র রাজকর্মচারীদের পদবীর পরিবর্তন হয়ে সেখানে পারসিক নাম গৃহীত হয়েছিল এবং এই পরিবর্তনও ছিল খুবই স্বাভাবিক।

॥ সামাজিক ক্ষেত্র ॥

তুর্কী ও আফগানগণ এদেশে এসে শহরাঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে। ফলে শুরু হ'ল নগর সভ্যতার আরেক রূপ। ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত জীবন যাত্রার সূত্রপাত হ'ল। আর এই জীবন যাত্রার তাগিদের বিলাস দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে লাগলো। বিভিন্ন শহর ব্যবসা-কেন্দ্রে পরিণত হ'ল, ভারতীয়দের মধ্যেও ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্ম হ'ল।

ভারতে মুসলমান সমাজে পরিষ্কার তিনটি ভাগ দেখা গেল। যেমন, ধর্ম-নিরপেক্ষ বা ধর্মান্ধ অভিজাত বর্গ, বিভিন্ন শিল্পে পারদর্শী শ্রমিক শ্রেণী এবং কৃষক সম্প্রদায়। অভিজাতদের মধ্যে ছিল তুর্কী, আফগান, পারস্য ও আরব দেশীয় লোক। প্রথমে

নিজেদের মধ্যে এই জাতিগত বৈষম্য তারা রক্ষা করে চলতো। তারপর ক্রমশঃ তারা যখন এদেশে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে আরম্ভ করলো এবং দেখলো এদেশে তারাই হ'ল সংখ্যালঘিষ্ঠ তখন তাদের জাতিগত বৈষম্য দূর হয়ে যেতে লাগলো।

প্রথমে সুলতানের দয়া-দাক্ষিণ্য লাভের উপরই অভিজাতের স্তরে উন্নীত হওয়া নির্ভর করতো। পরে অবশ্য আভিজাত্য বংশানুক্রমিক হয়ে যায়। তাদের আয়ের পরিমাণ ছিল বিলাস-বহুল জীবন যাপনের পক্ষে যথেষ্ট, ফলে যথেষ্ট রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারীও ছিল তারা। আলাউদ্দীন খিলজী যথোচিত কারণেই এদের আয় হ্রাস করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই ব্যবস্থাকে আর অব্যাহত রাখা যায় নি।

কার্যক্ষেত্রে অভিজাতদের ছিল দুটি ভাগ—এক, যারা অস্ত্র ধারণ করতো, দুই, যারা কলম নির্ভর ছিল। প্রথমোক্ত যারা, তারা মূলতঃ সামরিক শক্তিতেই ছিল শক্তিমান। আর দ্বিতীয় দল ধর্ম নিয়েই থাকতো। এরা ছিলেন গোঁড়া সুন্নী সম্প্রদায়ভুক্ত। সমাজে বিশেষ সম্মানীয়। এমন কি সুলতানের পক্ষেও শ্রদ্ধেয় হিন্দু সমাজে গুরু বা সন্ন্যাসীগণ যে মর্যাদার অধিকারী মুসলমান সমাজে পীর বা শেখ ছিল সম মর্যাদা সম্পন্ন।

মুসলমান শিল্পীদের বাস ছিল প্রধানতঃ শহরাঞ্চলে। এরাই প্রধানতঃ ভারতীয় সভ্যতার সঙ্গে ইসলামীয় সভ্যতার সংমিশ্রণে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জীবন যাত্রার নৈমিত্তিকতায় কিংবা বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণ ক্রমশঃ দ্রুততর হতে থাকে।

তত্ত্বগত দিক থেকে মুসলমান সমাজে কোন জাতিভেদ না থাকলেও বাস্তবক্ষেত্রে অবস্থা ছিল অন্য রকম। ভারতের মুসলমানদের মধ্যে যারা ছিল পুরোপুরি বিদেশী (যথা, তুর্কী আফগান) তাদের বলা হ'ত আশরফ্ বা সম্মানীয়। এরপর ছিল উচ্চ শ্রেণীর ভারতীয় মুসলমানদের স্থান। সর্বনিম্নে ছিল অন্যান্য মুসলমানগণ। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক সাধারণতঃ স্থাপিত হ'ত না। "The grafting of caste on to profession was so firm and strong by now that no minority community could hope to dislodge to and this was at the root of social relationships."

বিদেশী মুসলমান দীর্ঘকাল নিজেদের পৃথক অস্তিত্ব বজায় রাখতে উদগ্রীব ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে এদেশের খাদ্য ও পোষাক অভ্যস্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে ভারতীয় মহিলাদের বিবাহ করার ফলে তাদের পৃথক সত্ত্বা ক্রমশঃ হারিয়ে যেতে থাকে। তা যাই হোক, হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও নারী ছিল অন্তঃপুর চারিণী। গার্গী, মৈত্রেয়ীর মত সুলতানা রিজিয়াও অবশ্যই একটি ব্যতিক্রম। কৃষক বা অন্যান্য শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে অবশ্য মেয়েদের অনেক স্বাধীনতা ছিল। এবং "this was doubtless due to economic necessity."

মুসলমানদের ভারত আগমনের ফলে ব্রাহ্মণগণ সমাজ জীবনে যে সম্মান ও মর্যাদা ভোগ করতো তা থেকে তারা বঞ্চিত হ'ল। আর তাদের শূন্যস্থান পূর্ণ করলো উলেমাগণ। আরও লক্ষ্যণীয়, ব্রাহ্মণদের মত উলেমাগণও যথেষ্ট ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিপত্তি ভোগ করতো।

ষষ্ঠদশ শতাব্দী নাগাদ হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান অনেকাংশে পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল। অবশ্য তখনো উভয় সম্প্রদায়কে একই মানদণ্ড দিয়ে বিচার করা হ'ত না। এমন কি নীচু বংশজাত হিন্দু, মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিতি হলে অনেক বেশী সামাজিক মর্যাদা ভোগ করতো। তাই জনৈক ঐতিহাসিক বলেছেন, "Had the muslims remained a foreign community there would have been a readier acceptance of there ideology by high-caste Hindus."

॥ ধর্মীয় ক্ষেত্র ॥

এর ফল হ'ল কি? ব্রাহ্মণগণ তাদের মর্যাদা হারিয়ে নিজস্ব সম্পদ ও ঐতিহ্যের নব মূল্যায়নে আত্ম নিয়োগ করলেন। এই উদ্যোগই পূর্ণতা লাভ করলো এক নতুন সামাজিক আন্দোলনে। এই আন্দোলনই ভক্তি আন্দোলন নামে পরিচিত।

বৈষ্ণব ও শৈব এই ছিল তখনকার হিন্দু সমাজের দুই প্রধান ধর্মমত। রামানুজ, চৈতন্য, মীরাবাঈ, সুরদাস প্রভৃতি ছিলেন নতুন আন্দোলনের প্রধান প্রবক্তা। অস্বীকার করার উপায় নেই, এঁরা বহুলাংশে ইসলাম ধর্মের সুফী মতবাদ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। লক্ষ্যণীয় হ'ল, এই নতুন আন্দোলনের প্রবক্তাগণ অধিকাংশই ছিলেন নীচুবংশ জাত। এই আন্দোলনের মূল কথা হ'ল: "Institutionalized religion and objects of our ship were attacked, cast-disregarded, women were encouraged to join in the gatherings and the teaching was entirely in the local vernacular language."

ঐতিহাসিক দিক থেকে ভক্তি আন্দোলনে সর্বাধিক অবদান হ'ল কবীর ও নানকের "Who expressed the sentiments of the urban class in towns and of the artisians in the village who were in contact with the towns." অবশ্যই তাঁদের বক্তব্যে ইসলাম ধর্মের প্রভাব ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট। কবীর ও নানকের নেতৃত্বে ভক্তি আন্দোলন এক নতুন বাঁক নিল। তাঁরা দুজনেই সর্বশক্তিমানের অদ্বিতীয়ত্ব প্রচার করেন। তাই বলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সাধনের কোন অভিসন্ধি তাঁদের ছিল না। তাঁরা শুধু তাঁদের উপলব্ধ সত্যকে ঘোষণা করেছিলেন। তাই দেখা গেল, তাঁরা একযোগে ব্রাহ্মণ ও উলেমাদের বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁরা যে প্রচুর জনসমর্থন পেয়েছিলেন এতে কোন সংশয় নেই। তাঁদের জনপ্রিয়তা লাভের সবচেয়ে বড় কারণ হ'ল, তাঁদের উদাত্ত কণ্ঠে সামাজিক সাম্য

প্রতিষ্ঠার আহ্বান। ফলে জাতিভেদ প্রচার বলি হয়েছিল যে সব মানুষ তারা আজ কবীর ও নানকের পাশে এসে দাঁড়ালো। একটি কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, কবীরের তুলনায় নানক-ই অধিকতর স্থায়িত্ব লাভ করেন ভারতবর্ষে। কিন্তু এর কারণ কি? কবীর তাঁর বক্তব্যে মাঝে মাঝেই ভগবানের নামোল্লেখ করতেন। ফলে ধারণা হয়ে যায় কবীর সম্ভবতঃ একটি পৃথক হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠী তৈরী করতেই আগ্রহী। অন্যদিকে নানক হিন্দু ও ইসলাম উভয় ধর্মকেই বর্জন করার কথা স্পষ্ট করে বলায় কোন ভুল ধারণার অবকাশ ছিল না।

।। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র ।।

যাই হোক ভক্তি আন্দোলনের অধিকাংশ প্রবক্তা সাধারণ মানুষের কথ্য ভাষায় নিজেদের বাণী প্রচার করায় দেখা গেল, বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় প্রাচীন সাহিত্য সমূহকে অনুবাদ করার এক অস্থির প্রবণতা। গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের ব্যাপক অনুবাদ এ সময় থেকেই আরম্ভ হয়। অন্যদিকে চৈতন্যদেবকে কেন্দ্র করে বাংলা ভাষার বিকাশ, শংকর দেবকে কেন্দ্র করে অসমীয়া ভাষার বিকাশ দ্রুততর হ'ল। জৈন ধর্মের প্রয়োজনে গুজরাটী ভাষা বিকশিত হ'ল। কবীর, নানক, সুরদাস ও মীরাবাঈয়ের সহায়তায় হিন্দি ভাষাও অধিকতর পরিচিতি অর্জন করলো।

অন্যদিকে মুসলমান সুলতানগণ সংস্কৃত ভাষার পরিবর্তে পারশিক ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দান করায় বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার প্রয়োজনও বহুলাংশে বৃদ্ধি পেল। কিন্তু তাই বলে সংস্কৃত ভাষা একেবারে উপেক্ষিত রইলো না। এই ভাষার চর্চাও অব্যাহত রইলো বিদ্বজন পরিবেশে।

ভারতীয় সভ্যতার ক্ষেত্রে ইসলাম সভ্যতার আরেকটি প্রভাব হ'ল চিত্র, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের ক্ষেত্রে। 'The Turks brought with them the traditions of Arab and Persian architecture, particularly the latter. Persian features included the pointed arch, the transverse vault, the dome and the octagonal form of the building under the dome. These were all new to Indian architecture, where the arch was topped by a linted or was rounded and the towers of Temples were corbelled.······Indian motifs such as the lotus in various forms, found their way into the new buildings. These motifs were introduced together with the classic Islamic decorative motifs—the geometrical patterns, arabesques and calligraplic forms."

।। আলোচনা ।।

গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে এমন এক সংকীর্ণ প্রবণতা প্রবল হয়ে উঠছে যাতে প্রমাণ করা যায় যে ভারতে কখনোই হিন্দু ও মুসলমান ভাবধারার পারস্পরিক আদান

প্রদান ঘটে নি। উভয় সম্প্রদায়ই সর্বদাই অত্যন্ত সতর্কভাবে নিজেদের পৃথক সত্বা বজায় রাখতে চেয়েছে। এই প্রবণতা 'historical back projection" এর এক প্রকৃষ্ট প্রমাণ, যেখানে সমসাময়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অতীতের আশ্রয় নেওয়া হয়। কিন্তু আমরা ভুলে যাই কি করে যে আজকের ভারতবর্ষে অধিকাংশ মুসলমানই হ'ল ধর্মান্তরিত হিন্দু? এটা কি প্রমাণ করে না যে তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন ছিল না প্রথম থেকেই? তা না হলে ধর্মান্তরিত হওয়ার বা করার সুযোগ আসে কেমন করে? আসলে সংকীর্ণ পন্থীরা প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেন ধর্মীয় প্রবক্তাদের অথবা সুলতানদের সভাষদের বিবরণী। কিন্তু এরাতো স্পষ্টতঃই রাজনৈতিক কারণে উভয় সম্প্রদায়ের বিভেদকে বড় করে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। The fusion of cultures in any case cannot be jadged by the writings of a prejudiced minority determined to hold aloof: it can only be judged by the cultural pattern of the society as a whole". কোন সন্দেহ নেই যে সুলতানী আমলে উভয় সভ্যতার সংমিশ্রণ হয়েছিল। তবে সেই সংমিশ্রণ নিশ্চয়ই সর্বপ্লাবী ছিল না। যেমন রাজনৈতিক জীবনে খুব একটি সক্রিয় প্রভাব নেই, কিন্তু সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনে যে প্রভাব ছিল কত ব্যাপক তার প্রমাণ ভক্তি আন্দোলন। অবশ্যই এইসব সংমিশ্রণ প্রক্রিয়ায় সে সময় রক্ষণশীলতার প্রতিরোধ ছিল অত্যন্ত তীব্র এবং এই তীব্রতা হ্রাস পেয়েছিল মাত্র উনবিংশ শতাব্দীতে "When with the emergence of the Indian middle class as a result of various factors, a new social and political pattern began to evolve."

॥ ভারতের ইতিহাসে আকবরের অবদান ॥

॥ ভূমিকা ॥ রাজতন্ত্রের মহিমা ব্যক্তি-নির্ভর। একক ব্যক্তিত্বের অপরিসীম কৃতিত্বের উপর একটি রাজবংশের ঐতিহাসিক স্থান নির্ভর করে। ভারতের ইতিহাসে মোগল রাজবংশের যা কিছু সাফল্য, কৃতিত্ব জনপ্রিয়তা সব কিছুই মূলতঃ আকবরের অবিস্মরণীয় কার্য-কলাপের উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তাই একদিক থেকে আকবরের সঠিক ঐতিহাসিক মূল্যায়নের অর্থ ই হ'ল মোগল রাজবংশের ঐতিহাসিক তাৎপর্য নির্ধারণ।

এই মূল্যায়নের জন্য আমাদের প্রথম বিচার্য, ভারতের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আকবর অবতীর্ণ হলেন কখন? চকিত বিদ্যুৎ চমকের মত শেরশাহের আবির্ভাবের স্মৃতি তখন ম্লান। পিতা হুমায়ুন তাঁর হৃত সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করেছেন মাত্র। আকবর তখন অপরিণত বয়স্ক বালকমাত্র। ফলে ভারতের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে তখন এক বিরাট শূন্যতা বিরাজমান। এবং সেই শূন্যতা যোগ্য নেতৃত্বের। মোগল রাজবংশের সৌভাগ্য এই বাঞ্ছিত নেতৃত্ব দানের প্রতিভা নিয়ে জন্মে ছিলেন আকবর এবং "that is why there is a Mughal Period in Indian history." বাবরের কৃতিত্ব আর

কতটুকু? তাঁর কৃতিত্ব এটুকুই যে তিনিই প্রথম ভারতে এসেছেন এবং তাঁর সামরিক সাফল্য উত্তর সূরীদের মনে এক উদ্দীপকের কাজ করেছিলো। আর হুমায়ুন তাঁর পিতার অবদানকে ধরে রাখতে পেরেছিলেন মাত্র। কিন্তু "The work of both would have been in vain if his successor had not possessed genious on his own account."

॥ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা ॥

আকবরের নেতৃত্বেই অর্ধেকেরও বেশী ভারতের ভৌগোলিক পরিসীমার উপর মোগল সাম্রাজ্য একটি অত্যন্ত স্পষ্ট বাস্তব ঘটনা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হ'ল। "It was not the more existence of empire so much which was important but the shape which it took and this it owed to Akbar more than to any other man." অবশ্যই সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব কিছু নেই। উনবিংশ শতাব্দীর লর্ড ডালহৌসীর মত তিনিও বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষকে তাঁর অধীনে নিয়ে আসার অর্থ ই হ'ল সাধারণ মানুষের মঙ্গল সাধন। তবে তাঁর কৃতিত্ব হ'ল, অন্যরা এই লক্ষ্য নিয়ে যেখানে সামগ্রিক সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি, আকবর তা পেরেছিলেন। যেমন: ডালহৌসী সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে এগিয়ে গিয়ে সিপাহী বিদ্রোহের পটভূমিকা রচনা করেছিলেন। আকবরের ক্ষেত্রে এ রকম কোন বিপরীত ও বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। কারণ "He possessed both personal magnetism, the ability to manoeuvre and to judge situations and the Napoleonic gift of rapid movement." মৃত্যুকালে তিনি বঙ্গোপসাগর থেকে কান্দাহার পর্যন্ত এক বিশাল ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। "His empire was balanced by the persian empire on the Iranian plateau, itself preoccupied with the Otteman turkish empire beyond and there was no one else whose power was comparable." ছিল তাঁর এক শক্তিশালী সংঘবদ্ধ সৈন্য বাহিনী, যা প্রায় অজেয়। ছিল তাঁর অধিকারভুক্ত রসাল বাংলাদেশের সম্পদ ও মধ্য-পূর্বাঞ্চলের বাণিজ্য, যা সাম্রাজ্যকে করেছিল সমৃদ্ধশালী। এবং ছিল এক সুদৃঢ় কেন্দ্রীয় প্রশাসন, যা এক প্রবল ব্যক্তিত্বকে প্রতিফলিত করে। এবং এদের সম্মেলনেই এক শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী এক সুদৃঢ় সাম্রাজ্যের মজবুত বনিয়াদ স্থাপিত হ'ল।

॥ নেতৃত্বের প্রতিভা ॥

আকবরের শাসন যদি শুধুমাত্র এক বিদেশী আক্রমণকারীর শাসন হিসেবেই পরিগণিত হ'ত তাহলে "it would have been brittle, however. Outwardly brilliant." কিন্তু তা হয় নি। কারণ আকবর একজন সাম্রাজ্য-বিজেতামাত্র কেবল এই পরিচয়ে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে চান নি। চেয়েছিলেন নিজেকে জনগণের নেতার

পদমর্যাদায় উন্নীত করতে। তিনি জানতেন. "Leadership, however inspired, is not enough ; it has to be creative leadership if it is to charm a mixed people to Co-operate in goodwill rather than acquiesce through fear." তাই তিনি সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমান সমাজের নেতার ভূমিকা থেকে সমগ্র হিন্দুস্থানের অবিসম্বাদিত নেতায় রূপান্তরিত হয়েছিলেন।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে আকবরের পূর্ববর্তী দিল্লীর সুলতানেরাও হিন্দুদের দেশ শাসনকার্যে নিয়োগ করেছেন, সৈন্য বাহিনীতে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তখন সাম্রাজ্য-শাসনের নীতি নির্দেশনার ক্ষেত্রে হিন্দুদের কোন রকম ভূমিকা ছিল না। তখন ছিল দেশে প্রকৃতপক্ষে সামরিক শাসন। জনগণ অনুগত অথবা সৌভাগ্যবান হলে সেই শাসন থেকে সুবিধা পেতে পারতো। কিন্তু অন্যদিকে আকবর সম্পূর্ণ খোলামন নিয়ে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক চিত্তে হিন্দুদের সহযোগিতা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। এর ফলও পেয়েছিলেন তিনি হাতে হাতে। ভারতের শৌর্য ও বীর্যের প্রতীক রাজপুত জাতি যে কি অপরিমেয় সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছিল আকবরের প্রতি তা তো সর্বজনবিদিত। প্রসঙ্গক্রমে কেবলমাত্র একটি উদাহরণ উল্লেখযোগ্য। যে শিবাজী পরবর্তীকালে মোগল সাম্রাজ্যের স্থায়িত্বের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন, প্রায় অপরাজেয় মোগল শক্তিকে পর্যুদস্ত করেছিলেন বারংবার, সেই শিবাজী একদা বন্দী ও ধৃত হয়ে মোগল দরবারে আনীত হয়েছিলেন এক রাজপুত বীরের সাহায্যেই—তিনি হলেন জয় সিংহ। তাই এক বিচক্ষণ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সুযোগ্য নেতার মত আকবর সত্যিকারের শক্তির উৎস সন্ধান করে নিতে ভুল করেন নি। মৈত্রী বন্ধন স্থাপন করে, আত্মীয়তার যোগসূত্র রচনা করে আকবর তাই রাজপুত জাতির সমর্থন সংগ্রহ করেছিলেন নিজেকে অধিকতর শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করার তাগিদে। রাজপুত চিত্ত জয় করার মধ্য দিয়ে যে তিনি সমগ্র ভারত মনকে বশীভূত করতে পারবেন, এই সত্য অনুধাবনে তাঁর কোন বিভ্রম ঘটে নি। নেতা হিসেবে এটাই যে তাঁর এক বিরাট সম্পূর্ণ নির্ভুল ও বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এই সত্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই।

॥ প্রশাসনিক নৈপুণ্য ॥

দেশ শাসনের প্রয়োজনে একটি সুসংহত শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন বহু সম্রাটই করেছেন এবং তাঁরা বহুলাংশে সাফল্য অর্জনও করেছেন। কিন্তু আকবরের স্বকীয় বৈশিষ্ট্য শুধু এতেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং তা অধিকতর পরিস্ফুট রাজকার্যের (imperial service) মর্যাদা বৃদ্ধিতে। প্রকৃতপক্ষে সম্রাটের প্রশাসনে সর্বান্তকরণে অংশগ্রহণ যে বিশেষ সম্মানীয় বিষয় এই বোধ আকবরই জাগ্রত করেছিলেন। অবশ্য তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা সত্তর ভাগই ছিল অভারতীয় আর বাকী তিরিশ ভাগ ভারতীয় হিন্দু ও মুসলমান। যাই হোক রাজ কার্যের মর্যাদা বৃদ্ধিতে মনসবদারী প্রথা বিশেষ ভূমিকা

গ্রহণ করেছিল। এই প্রথা সম্পর্কে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য বিষয়টি হ'ল, মনসবদারী পদ কখনোই পুরুষানুক্রমিক ছিল না, বরং যে কোন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি আপন যোগ্যতার পরিচয় দিয়ে এই পদ মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারতো। ফলে "Instead of seeking fame in obscure local independence, in insurrection, or in gang robbery, such youths could find both distinction and an outlet for energy in the Constructive service of the state."

এইভাবে আকবর রাজকার্যকে এক ভিন্নতর দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে শিখিয়েছিলেন দেশের সাধারণ মানুষকে। এবং এক্ষেত্রে তিনি যে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করেছিলেন তার প্রমাণ, অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্যন্ত আকবর প্রতিষ্ঠিত বিধি ব্যবস্থা সাধারণভাবে অপরিবর্তিত ছিল, এমন কি পদ মর্যাদা দানের উদ্দেশ্যে যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ তিনি করেছিলেন তা হায়দরাবাদের নিজাম ১৯৪৮ সালে হায়দরাবাদের ভারত-ভুক্তির পূর্ব পর্যন্তও অনুসরণ করেছিলেন।

॥ মহিমা-মণ্ডিত সম্রাটের সিংহাসন ॥

আকবরের আরেকটি কৃতিত্ব হ'ল, সাধারণ মানুষের সম্মুখে সম্রাট ও তাঁর সিংহাসন সম্পর্কে কেমন এক রহস্য মিশ্রিত সশ্রদ্ধ মনোভাব সৃষ্টি করা। প্রাচীন হিন্দু রাজারাও চেষ্টা করেছেন তাঁদের নিজেদের চারদিকে এমন এক পরিমণ্ডল রচনা করতে যেন সাধারণ মানুষের কাছে খুব পরিচিত হয়েও কেমন এক অপরিচয়ের আচরণে নিজেদের আবৃত রাখতে পারেন। এতে সুবেধেটা এই, শাসক ও শাসিতের দূরত্ব যেমন বিঘ্নিত হয় না তেমনি খানিক রহস্যময়তার অন্তরালে থেকে এক অদ্ভূত ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে—এবং সঙ্গে সঙ্গে জাগ্রত হয় এক অজানিত আশংকা মিশ্রিত কুণ্ঠা বা শ্রদ্ধা। এমন অবস্থাই শাসকের পক্ষে সুবিধাজনক। মুসলমান সুলতানেরাও এই চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল যে হন নি তার প্রমাণ "each dynasty was forgotten within a generation of its overthrow."

কিন্তু আকবর "restored this concept of imperial sanctity, the symbol of success being the addition of the 'nimbus' or halo to the imperial head in Mughal paintings from Akbar's time onwards." এবং অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গেই এমন কথা মনে করার যুক্তি সংগত কারণ আছে যে আকবর সম্রাট সম্পর্কে এমন একটি মনোভাব সৃষ্টি করার তাগিদে দীন-ইলাহী নামক ধর্মের প্রবক্তা হিসেবে নিজেকে পরিচিত করতে চেয়েছিলেন। অবশ্যই আকবরের জ্ঞান-পিপাসা ছিল অপরিমেয়, হৃদয়ের ঔদার্য ছিল বন্ধনহীন, উপলব্ধির গভীরতা ছিল অতল। কিন্তু জ্ঞান-পিপাসা বা ঔদার্য বা গভীর উপলব্ধি থাকলেই আকবরের মত একজন সূক্ষ্ম বাস্তববাদী রাজনীতিককে ধর্মীয় প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে—এমনটা কখনোই উদ্দেশ্য বিহীন হতে পারে। তাই সংশয় হয়, তাঁর দীন-ইলাহী কতটা

ধর্মীয় তত্ত্ব ছিল, কতটা ছিল রাজনৈতিক তত্ত্ব। এ ছাড়াও আকবর যদি প্রবলভাবে ধর্মীয় ভাবেই অনুপ্রাণিত হয়ে থাকবেন তবে নিশ্চয়ই উদ্যোগী হতেন তাঁর উপলব্ধ সত্য যেন জনসাধারণের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়, সমাদৃত হয়। তাতো আকবর করেন নি এবং বাস্তবে তাঁর দীন-ইলাহি কখনো তাঁরই রাজসভার চৌহদ্দী পেরিয়ে যেতে পারে নি।

সুতরাং আমরা এমন সিদ্ধান্তে পৌছুতে পারি যে দীন-ইলাহি বহুলাংশে তাঁর রাজপদ সম্পর্কে যে বিশ্বাস তাকেই অধিকতর বলিষ্ঠভাবে বিকশিত হতে সাহায্য করেছিল। এর প্রমাণ? দীন-ইলাহি প্রবর্তিত হ'বার পরবর্তীকালে দেখা গেল "Akbar himself was treated as a superhuman or semi divine person." শুধু এই নয়। তাঁর পুত্র জাহাঙ্গীর কি করেছিলেন? "Jahangir retained some details which tended to glorify the monarch while he discarded the cult as a whole."

কোন কোন ঐতিহাসিক দীন-ইলাহীকে আকবরের পরিণত বয়সের এক ভীমরতি বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু আকবর তো তাঁর ধর্মমত ব্যক্ত করেছিলেন চল্লিশ বৎসর বয়সে এবং যখন তিনি তাঁর অপরিসীম প্রাণ প্রাচুর্যে পূর্ণ। আবার আরেক দল বলেছেন যে আকবর এমন অর্বাচীন ছিলেন না যে তিনি ধর্মের মত একটি বিষয় নিয়ে প্রগল্‌ভ হয়ে তাঁর অন্যান্য বৃহৎ নীতিগুলি সংকটাপন্ন করে তুলবেন। কিন্তু আসলে আকবর তাঁর ধর্মমতকেও যে একটি নীতি হিসেবে প্রকাশ করেছিলেন তাও তো অস্বীকার করা যায় না। সেই নীতি কি? "The problem of every all Indian ruler in the past has been to find a basis for loyalty to the throne on the part of all classes. Akbar knew as well as anyone else that yau could neither draw Hindus and Muslims into a new religion nor induce one permanently to submit to the other. He therefore set out to establish a cult of the monarch, to present him as a semi-divine personage whom it was a religious duty to obey and sacrilege to oppose. Hence the aura, hence the religious prostrations."

এবং অন্যান্য নীতির মত তাঁর এই ধর্ম-ভিত্তিক এক সুষ্ঠু বাস্তব-বোধ সম্পন্ন নীতিও সফল হয়েছিল। তার প্রমাণ, ভারতীয়দের বিচারে মোগল সম্রাটগণ অন্যান্য রাজা-মহারাজাদের তুলনায় এক ভিন্ন ভূমিকায় স্থান পেলেন, দেশ শাসন করার বিষয়ে তাঁদের ঐশ্বরিক অধিকার মানুষ স্বীকার করে নিল। এবং এ কথাটা যে কতবড় সত্য তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহেও মুমূর্ষু মোগল সম্রাটকে রক্ষার এক ঐন্দ্রজালিক মোহ যেন বিদ্রোহীদের এবং তাদের সমর্থকদের আচ্ছন্ন করতে পেরেছিল।

অতএব "Akbar succeeded in re-growing the divinity that doth hedge a king. He provided India with the first Muslim dynasty to receive the free allegiaunce of Hindus as well as Muslims and whose

claim to rule was accepted for reasons other than the possession of superior force."

॥ ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ—তার অনিবার্যতা ॥

॥ ভূমিকা ॥

সত্যপক্ষে যারা ছিলেন ভারতে ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদী সংগঠনের একনিষ্ঠ কর্মী, তাঁরা সবাই ছিলেন মনে প্রাণে লর্ড ওয়েলেসলীর নীতির অন্ধ অনুগামী। কিন্তু যত অনায়াসে তাঁরা তাঁদের লক্ষ্যকে সফল করে তুললেন এবং সাম্রাজ্য গঠনের সুযোগে যত বেশী ভারতীয় পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে তাঁদের নিজেদের অনভিজ্ঞতা নিজেদের কাছেই স্পষ্ট হয়ে থাকছিল ততই তাঁরা এক বিস্ময়ে নিজেদের অবিশ্বাস্য সাফল্যে হতবাক হয়ে যাচ্ছিলেন। ফলে অনায়াসে লব্ধ সাম্রাজ্যকে হারাবার এক কারণ আশংকায় যেন প্রথম থেকেই তাঁরা সন্ত্রস্ত। তাঁদের আশংকা হচ্ছিল, হয়তো ঝড়ের মত কোন অদৃশ্য শক্তি তাঁদের নতুন সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে মজবুত হতে দেবে না কখনো। এমন আশংকা ছিল বলেই, সাম্রাজ্য যখন গড়ার কাজ চলছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যকে দৃঢ় বন্ধনে সংবদ্ধ করার প্রয়োজনে নানাবিধ সংস্কারমূলক কর্মপন্থা অনুসৃত হচ্ছিল, তখনই সাম্রাজ্যের সংগঠক এবং সংস্কারকগণ আপন কর্তব্য পালন কালেই দুরু দুরু বক্ষে স্বীকার করে ফেলেছিলেন যে হয়তো পাশ্চাত্য ভাবধারা পুষ্ট এইসব সংস্কারাবলী একদা ভারতে তাদেরই কবর রচনা করবে। এমন সচেতনতা ছিল ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের। ভবিষ্যদ্বাণী আরও হ'ল, এবম্বিধ পরিস্থিতিতে তারা নিজেদের সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছিলেন, যেমন এলফিনস্টোন বলেছিলেন, যেদিন আসে তা হবে "the most desirable death for us to die."

॥ মৌল সমস্যা ॥

কিন্তু ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের সাফল্যের চমৎকারীত্ব সত্যিই গভীর বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখে। কেননা মাত্র আশী বৎসরেরও কম সময়ে ভারতবর্ষের মত একটি দেশকে, যার নিজের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত সভ্যতা রয়েছে এবং যে দেশ রাজনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তাকে কত অনায়াসে একটি বিদেশী বণিক সংস্থা সম্পূর্ণ করতল গত করে ফেললো। অতএব এই অভাবিত, হয়তো বা অপ্রত্যাশিত ইংরেজ সাফল্যের পটভূমিকা বিশ্লেষণ বিশেষভাবে ঐতিহাসিক তাৎপর্য মণ্ডিত।

॥ সমস্যার বিচার ॥

এই প্রশ্ন বিচার করতে গিয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইয়োরোপে যেটা জনপ্রিয় মতবাদ ছিল তা হ'ল, সর্বক্ষেত্রে প্রাচ্যের তুলনায় পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠত্ব। তাই সেদিন খুব সহজেই বলা যেতে পারতো, "What could an Asian do against a Clive, or a Hastings, a Lawrence or a Nicholson." কিন্তু পরবর্তীকালে এঁদের তুলনায়

আরও বেশী বোঝা ইংরেজদের ধারণা এই বক্তব্যের অন্তরালে প্রকাশ পেল। সেই সেই আগের ইংরেজ ঐতিহাসিক সিরাজ-উদ্দৌলার চরিত্রে এবং দুই ... এই ষড়যন্ত্রের কারণ হবে বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু "there had never been a case where more balanced produced such large results," আগের পর্যায়ে দৃষ্টান্ত ... ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন ছিল আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত, যার ফলে ইংরেজ বাংলা হয়েছিল এত সহজ। কিন্তু এমন হয় কি আর আজ গ্রহণযোগ্য? সুতরাং সমস্যা সমাধানের পথ অন্বেষণ করতে হবে অন্তর।

অন্তর যে গুরুত্বটি সর্বপ্রথম উত্থাপিত হয় তা'র অভ্যন্তরীণের তুলনায় ইংরেজদের আদেশ শক্তি এবং নৈপুণ্যপূর্ণ নেতৃত্বের কথা। কিন্তু সমাজে ইংরেজ শাসকের প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় ভারতীয় নেতৃত্ব, যেমন হায়দর আলি, টিপু সুলতান, বাজী রাও প্রভৃতি কোনদিক থেকেই অযোগ্য ছিল না। আসলে "Brilliant leadership in itself can be disruptive as well as creative. The effectiveness of leadership depends on the actions of its executive and it is here that we can see British advantage." ইংরেজ শক্তিকে ভারতে ইংরেজগণ ছিল সুশৃঙ্খল এবং সমষ্টি সম্পন্ন। অর্থাৎ একই ভারতে ভারতীয় নেতৃত্ব ছিল ব্যক্তির, তুলনা সমাজের সংযোগ এবং ব্যক্তিগত আনুগত্যের প্রত্যক্ষ সমর্থন পুষ্ট। ফলে, "the Company's agents in a crisis tended to draw together, while prince's followers, in the same situation tended to fly apart. Changing sides, setting up one's own, was normal practice in eighteenth-century India." প্রকৃতপক্ষে শাসিতের শক্তিহীন এই কঠোর এবং স্পষ্ট প্রশ্ন কেউ অস্বীকার করার উপায় নেই।

ইংরেজ চরিত্রের শৃঙ্খলা পরায়ণতার নিদর্শন বিশেষভাবে উল্লেখের অপেক্ষা রাখে। চরিত্রের এই বৈশিষ্ট্য তাদের একই ধরনের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং তা শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই না, সাধারণ প্রশাসনিক ক্ষেত্রেও। আর একথাও ঠিক যে উক্ত শক্তির সহায়তায় প্রাথমিক স্তরে ইংরেজদের বাংলা অর্জনে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু আমরা দেখেছি অতি অল্প দিনের মধ্যে ভারতীয় রাজন্যবর্গও ইউরোপীয় সমর কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন এবং সেইভাবে নিজ নিজ সৈন্য বাহিনীকে শিক্ষিত করে তুলেছিলেন। যেমন টিপু সুলতানের সৈন্য বাহিনী, অথবা সিন্ধিয়ার বাহিনী অথবা রণজিতের নেতৃত্বে শিখ বাহিনী। কিন্তু এরপরেও যখন ইংরেজ বাংলা অধিকারে থাকে তখন তার সাফল্যের অন্য নির্দিষ্ট কয়টি কারণের খোঁজ নিতে হবে হয় না।

ইংরেজ-ভারতীয়দের শৃঙ্খলাপরায়ণতার মতে আরেকটি যে উপাদান সাহায্য করেছিল তা হ'ল তাদের প্রবল আত্মবিশ্বাস। ইউরোপের এই সময়কে বলা হয়েছে "one of mounting self-confidence and optimism." স্বাভাবিকই তাই ইংরেজ চরিত্রেও এই প্রত্যয় ও আশাবাদ প্রতিফলিত হয়েছিল এবং একসাথে যুক্ত হয়েছিল

নিজেদের অধিকতর সম্প্রসারণের এক উদগ্র কামনা। আবার এই সম্প্রসারণের তাগিদ তারা পেয়েছিল শিল্প বিপ্লব উদ্ভূত স্থবিধা এবং ক্রম-বর্ধমান বাণিজ্য থেকে। তাই বাধাহীন ভাবে কেবল সম্মুখের দিকে ধাবিত হওয়ার বাসনা যেমন একদা অনুপ্রাণিত করেছিল ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ে আরবদের কিংবা সোভিয়েট রাশিয়ায় কম্যুনিষ্টদের, তেমনভাবে তাড়িত করেছিল সেইসব দিনগুলিতে ভারতে রজদের। তখন তাদের কাছে "No defeat was more than a set-back, a a rut in the golden road of manifest desting……This state of mind gave the British leadership a tenacity of purpose, and a resilience which could not be matched on the Indian side."

আমাদের পরবর্তী বিবেচ্য হ'ল, পারস্পরিক শক্তি ও সামর্থের বিচার। সাধারণ দৃষ্টিতে একটি বৃহৎ উপমহাদেশের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক সংস্থার শক্তি সামর্থের তুলনামূলক বিচারই চলে না। কিন্তু বাস্তব অবস্থা ছিল অন্য রকম। কারণ ভারতীয় শক্তি ছিল বহুধা-বিচ্ছিন্ন, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে নিজেদের বিরুদ্ধেই প্রযুক্ত। আর ইংরেজরা অপূর্ব চাতুর্যের সঙ্গে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে ভারতীয় লোকবল ও অর্থবল প্রয়োগ করতে পেরেছিল। তা ছাড়া ভারতের কোন নিজস্ব মজবুত আর্থিক মেরুদণ্ডই ছিল না। অন্যদিকে প্রখর মধ্যাহ্নের মত উচ্ছ্বসিত ছিল এ সময়ের ইংরেজ অর্থনীতি—সারা বিশ্বে পরিব্যপ্ত। তারপর তাদের সামুদ্রিক অভিজ্ঞতা ও প্রাধান্য তাদের এক বাড়তি স্থবিধে দিয়েছিল। এক কথায় একদিকে ভারতীয় সম্পদ ছিল ক্ষয়িষ্ণু, অন্যদিকে ইংরেজ সম্পদ্ ছিল বর্ধিষ্ণু। তাই নিঃসন্দেহে বলা চলে, "while the company's resources. with British state support were concentrated, relatively well organised, and expansive, those of India were divided, contracting rather than expanding and' irreplaceable after loss."

ভারতীয়দের বিভেদকামীতা ইংরেজদের ছিল আরেকটি স্থবিধা। প্রকৃতপক্ষে ভারতের ভৌগোলিক পরিস্থিতিটাই এমন যে এখানে বিচ্ছিন্নভাবে নানা জাতির বাস এবং নানা সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়েছে। তাই প্রত্যেকটি গোষ্ঠী একেকটি স্বতন্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত হতে চেয়েছে, আভিজাত্যের গরিমায় নিজেকে স্বতন্ত্র রাখতে চেয়েছে। তারপর একদা বিস্মৃতির অতল গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ফলে "There was never an Indian concept of the balance of power of stable states within the orbit of Indian Culture." অথচ এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন, এক ছত্রাধিপতি হওয়ার খ্যাতি অর্জন, এমন অভিজ্ঞতাও যে ভারতে নতুন নয় তার প্রমাণ রাজস্য় বা অশ্বমেধ যজ্ঞের যুগ থেকে মোগল সাম্রাজ্য গঠন পর্যন্ত প্রচুর। তথাপি ভারতীয় রাষ্ট্রীয় চেতনায় সংহতি বলে কিছু ছিল না, ছিল না সামগ্রিক শক্তিসাম্য অক্ষুণ্ণ রাখার কোন উদ্যোগ।

তাই এই সময় যে জাতীয় চেতনা ইউরোপে অত্যন্ত প্রবল ভারতে ছিল তা চিন্তারও বাইরে। বরং "In India the horizontal divisions of caste and the vertical divisions of religion were more important than those of race." তাই দেখি, উচ্চ গাঙ্গেয় উপত্যকার রোহিলাগন কখনো একটি জাতিতে উন্নীত হতে পারলো না, কারণ ধর্ম ও সম্প্রদায় গত বিভেদের ফলে তারা ছিল স্থানীয় হিন্দু কৃষক ও ভূস্বামীদের থেকে বিচ্ছিন্ন। মাতৃভূমির প্রতি সুগভীর আনুগত্য থাকা সত্বেও রাজপুতগণ বিচ্ছিন্ন এক অভিজাত সম্প্রদায়ই থেকে গেল, কারণ "they could not unite physically and psychiacally with their immediate neighbours." সত্যিকারের জাতীয়তাবোধের স্ফুলিঙ্গ কেবলমাত্র আমরা দেখতে পাই মারাঠাদের মধ্যে। এর কারণও অস্পষ্ট নয়। তারা ভৌগোলিক দিক থেকেই বিচ্ছিন্ন একটি অঞ্চলে বসবাস করতো, তাদের ভাষা ছিল এক, স্বাধীন চেতা ছিল তারা, বিদেশী মোগলদের হস্তক্ষেপে তারা ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল, ইসলাম ধর্মের বিরোধিতায় তারা ঘনপিনদ্ধ হয়েছিল, আর শিবাজীর সুযোগ্য বলিষ্ঠ নেতৃত্ব তাদের একটি জাতিতে পরিণত করেছিল। অথচ এই মারাঠা জাতিও মাত্র পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে নিজেদের ক্ষয় করে ফেললো এবং তার কারণও ঐ গতানুগতিক—ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্বার্থ, জাতি বৈষম্য, পারস্পরিক সম্প্রীতি ইত্যাদি। সবচেয়ে দুঃখের হ'ল, এই জাতীয় চেতনার অভাব হেতু দেখা গিয়েছে যুগে যুগে ভারতীয় রাজন্যবর্গ তাদের নিজদেশীয় কোন প্রতিবেশী আক্রমণকারী বা শক্তির কাছে সাহায্যপ্রার্থী হতে কখনো কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

এর সঙ্গে সঙ্গে যে প্রসঙ্গ এসে যায় তা হ'ল ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র। মোগল শাসনকালে প্রচুর সম্পদ নিয়মিত সঞ্চিত হ'ত কেন্দ্রীয় সরকারের রাজকোষে। ভোগ-বিলাসে মোগল সম্রাটগণ প্রচুর অর্থ ব্যয় করেও, অবশিষ্ট অর্থ দিয়ে তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গেই দেশ শাসন বা বিদেশী আক্রমণ প্রতিহত করতে পারতেন। কিন্তু মোগল যুগের শেষ ভাগে দীর্ঘকাল ব্যাপী মারাঠা, পারস্য ও আফগানদের মোকাবিলা করতে গিয়ে মোগল রাজকোষ ক্রমশঃ শূন্য হয়ে যায়। ফলে দেশ শাসনেও এল দুর্বলতা। এরই সুযোগে কেন্দ্রীয় সরকারকে অবজ্ঞা করবার সাহস পেল বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌছালো যখন লুঠতরাজই ছিল সৈন্যবাহিনী পোষণ করার একমাত্র লক্ষ্য এবং এই সব বাহিনীর ভরণ পোষণ নির্বাহ হ'ত লুটের ভাগের উপর। সেই ভাগের হের ফের হলে সেনাপতিদের বিপর্যয় ছিল অবধারিত। তাই সেনাপতিগণ শত্রুদের চেয়েও নিজ বাহিনীর সৈন্যদের ভয় পেতেন অনেক বেশী।

এই ছিল সামগ্রিক ভাবে সমসাময়িককালের ভারতীয় পরিস্থিতি এবং এমন পরিস্থিতিতে খুব সরল গাণিতিক নিয়মেই এসেছিল ইংরেজদের সহজ সাফল্য। কিন্তু তাহলেও সকল প্রশ্ন মীমাংসিত হ'ল না। অতঃপর যে প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যায় তা হ'ল, একটি সাধারণ বাণিজ্যিক সংস্থা হয়েও ইংরেজগণ নিজেদের মূল ভূখণ্ড

থেকে বহুদূরবর্তী একটি পররাজ্য গ্রাসে উদ্যোগী হ'ল কেন? পার্সিভাল স্পীয়ার বলেছেন, "The essential answer is commerce and vested interests."

এদেশে ইংরেজদের প্রধান বাণিজ্যিক দ্রব্য ছিল তূলা, মসলা, নীল, লবন প্রভৃতি। কোম্পানীর বাণিজ্য ছাড়াও পাশাপাশি গড়ে উঠেছিল কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং এই ব্যবসা-বাণিজ্যগত কারণেই তারা ভারতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসীদের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হয়েছিল। আর এই সংঘর্ষের পরিণতিতে তাঁরা বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলো, যুদ্ধ শুধু তাদের বাণিজ্যিক নিরাপত্তাই ছিল না, পরন্তু এক সাম্রাজ্য গড়ে তোলার স্বর্ণদ্বার উন্মুক্ত করে দিল। অবশ্য ওয়ারেন হেষ্টিংসের শাসনকাল পর্যন্ত তারা ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্পর্কে এমন নিশ্চিন্ত-বোধ করে নি যার জন্য কোন পরিচ্ছন্ন নীতি গ্রহণ করতে পারে নি। কিন্তু এর পরের অবস্থা অন্য রকম। তারা নিশ্চিত যে ভারতবর্ষ তাদেরই করতলগত। সুতরাং এবার প্রয়োজন হ'ল এক মৌল প্রশ্ন বিচার করার। তা হ'ল, সমগ্র ভারতবর্ষ জয় করে তাকে শাসন করাই কম ব্যয় সাপেক্ষ না পরস্পর বিবদমান ভারতের রাজ্য-গুলির অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সুযোগ নেবার উদ্দেশ্যে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা এই তিন কেন্দ্রে সুসজ্জিত সদাজাগ্রত সৈন্যবাহিনী পোষণ করাই অধিকতর ব্যয় সংকোচের সুযোগ? "The imperialist answer, represented by Lord Wellesley was an unhesitating 'March'." অবশ্য এই সময় নেপোলিয়নের ভারত আক্রমণের আশংকা ওয়েলেস্‌লীর বক্তব্যকে আরও জোরদার করে তুলেছিল। কিন্তু পিট ও তাঁর উত্তরসূরীগণ যে ভারতে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবকে সমর্থন জানিয়েছিলেন তার পেছনে বাণিজ্যিক কারণই ছিল প্রধান। প্রকৃতপক্ষে এদেশের শাসনতান্ত্রিক ব্যয় নির্বাহ করে কোম্পানীর বাণিজ্য খুব লাভজনক ছিল না। বরং চীন দেশ থেকে চা আমদানী করে কোম্পানী অনেক বেশী লাভবান হ'ত। "While China provided tea for the company it was willing to take opium from India." আর এই আফিং চীন দেশে চোরা পথে চালান করে কোম্পানীর লাভের পরিমাণ ক্রমশঃই স্ফীত হচ্ছিল। এবং এই বাণিজ্যকে সচল ও সক্রিয় রাখার তাগিদে প্রয়োজন ভারতের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব দখল। অতএব "A cogent economic argument for the hegemony of India was the preservation of the china trade."

এভাবেই চলছিল এবং মানুষের লোভ তো ক্রমবর্ধমান। লণ্ডনের ব্যবসায়ীগণ ভারতের আয়তন ও জনসংখ্যার বিচারে একটি বিরাট ব্যবসায় কেন্দ্রের সম্ভাব্য ক্ষেত্র নিয়ে ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হচ্ছিল। তারা দেখলো, কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার তাদের বাণিজ্যিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে চরিতার্থ করার একমাত্র প্রতিবন্ধক। অতএব তারা চাইলো, কোম্পানী রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হোক্, আর এই সুযোগে তারা তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করুক।

এর সঙ্গে যুক্ত হ'ল কায়েমী স্বার্থবাদীর দল। কোম্পানীর স্ববাদে ভারতে বহু ব্যক্তিগত স্বার্থ গজিয়ে উঠ্‌ছিল। তারা দেখলো, "A withdrawal from India would ruin their products, the status-quo would leave them uncertain, but advance would improve them." আফিং ব্যবসার স্বার্থ তো ছিলই, তার চেয়ে অনেক বেশী স্বার্থগুলি রঙ্গমঞ্চের অন্তরালে ছিল অত্যন্ত সক্রিয় এবং তা খোদ ইংলণ্ডেই। যেমন ইংলণ্ডের স্বাধীন জাহাজ শিল্প যার উপর ভারতে ইংরেজ-ভাগ্য-নির্ভরশীল ছিল। তাছাড়া সামরিক ও বেসামরিক প্রশাসনে প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রী, যা ভারতে লভ্য ছিল না, এদেশে রপ্তানী করে বিশেষ মুনাফা অর্জন। তারপর ইংলণ্ডের বস্ত্র বয়ন শিল্পের একটি আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় বাজার ছিল এই ভারতবর্ষ। সর্বোপরি ছিল ব্যক্তিগত ভাগ্যান্বেষীদের স্বার্থ। একদা যে ভারতবর্ষ ছিল ইংরেজের কাছে সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য, সেই ভারতবর্ষই এখন ব্যক্তিগত ভাগ্য পরিবর্তনের স্বপ্নিল সবুজ প্রান্তরে পরিণত। অতএব "The argument for retaining the position in India was fundamentally economic. Once this was admitted the argument for advance as a long-term economy grew stronger with every year of central Indian anarchy." এবং এখানেই হ'ল ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের অনিবার্যতা।

প্রতিষ্ঠিত ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ—অতঃ কিম্ ?

সাম্রাজ্যলাভের মুহূর্তে ভারতবর্ষ :—

রাজনৈতিক :—১৮১৮ সালে শতদ্রু পর্যন্ত ভারতে যে ইংরাজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, সে সাম্রাজ্যের সঙ্গে মোগল সাম্রাজ্যের সাদৃশ্য প্রায় অদৃশ্য! নতুন যে সাম্রাজ্য অর্জিত হ'ল তা যেন ধ্বংসস্তূপের সাম্রাজ্য। ঐতিহ্য মণ্ডিত অতীত আর সুসমৃদ্ধ অতীতের ধ্বংসাবশেষ। উত্তর হোক আর দক্ষিণ হেকে সর্বত্রই বিক্ষিপ্ত বিধ্বস্ত দূর্গ, পরিত্যক্ত রাজপ্রাসাদ, জলহীন জলসেচের খাল, দীর্ঘকাল অব্যবহারে ভগ্ন পুষ্করিণী, পদচিহ্নহীন রাজপথ, আর কোলাহলহীন রাজধানী। দীর্ঘ স্থায়ী যুদ্ধে অথবা দীর্ঘকালীন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও অস্থিরতায় ভারতবর্ষ তখন ক্লান্ত, উদ্যমহীন এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভারমুক্ত ভাবনাহীন।

মোগল রাজশক্তির কর্তৃত্বাধীনে যে রাজনৈতিক কাঠামো ভারতে গড়ে উঠেছিল মারাঠাদের বারংবার আঘাতে তা পর্যুদস্ত। কিন্তু মারাঠাও নিজেদের মোগল শক্তির বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে পারলো না। বরং তারা এমন নীতি গ্রহণ করেছিল যার ফলে তারা রাজপুত, বাঙ্গালী, মোগল ও মুসলমানদের দ্বারা সমভাবে নিন্দিত ও ঘৃণিত। তাই ভারতের রঙ্গমঞ্চ থেকে তাদের বিদায় একান্তই অশ্রুত, অসম্মানীয়। ফলে সামগ্রিক ভাবে কেন্দ্রীয় শাসনের অনুপস্থিতি রাজনৈতিক চঞ্চলতা সৃষ্টি করেছিল, যার সূত্রে রাজনৈতিক অখণ্ডত্ব খণ্ডাংশের রূপলাভ করেছিল। রাজস্ব-সংগ্রাহক বলপ্রয়োগ করে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। সাধারণ শৃঙ্খলার অভাবে জনজীবন হ'ল বিপর্যস্ত। এক কথায় "The rule of force was universal and politically there was no hope.

অন্যদিকে দেওয়ানী লাভের সূত্রে যে অঞ্চলের উপর কোম্পানীর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রকারান্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সে অঞ্চলের চিত্র অবশ্য অন্যরকম। এখানে সাধারণ ভাবে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত ছিল, সাধারণ মানুষ নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারতো। রাজস্ব আদায়ে একটি নীতি গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল। এই প্রসঙ্গেই কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কথা এসে যায়। সমসাময়িক অবস্থার বিচারে এই বন্দোবস্ত একটি তাৎক্ষণিক প্রতিষেধক হলেও কার্যক্ষেত্রে কৃষক, রায়ত বা জমিদার কারো কাছেই এই ব্যবস্থা গ্রহণযোগ্য হয় নি। অবশ্য এই সময়েই মোগল শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইংরেজ শাসনের এক তুলনামূলক বিচারের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল। জনৈক ঐতিহাসিক ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে 'aloofness, absorption in their own concerns and surrounding themselves with sycophants' বলে অভিযোগ করেছেন।

অর্থনৈতিক :—যখন দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি এরকম তখন বিপরীত কোন অর্থনৈতিক পরিবেশও প্রত্যাশিত নয়। ডাকাতি ও লুটতরাজের আশংকায় ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। যা কিছু ব্যবসায়িক তৎপরতা ছিল তা দেখা যেত বৃহৎ বৃহৎ বন্দরগুলিতে। ভারতের যে নিজস্ব তাঁত শিল্প ছিল তাও এক গভীর সংকটের সম্মুখীন হয়। এই সংকটের কারণ একদিকে যেমন ভারতের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি অন্যদিকে তেমনি ছিল ইংলণ্ড থেকে আমদানী করা বস্ত্রের প্রাচুর্য। এক কথায়, মোগল শাসনাধীনে যে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, এই সময়ের মধ্যে তা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত।

সমাজ ও সংস্কৃতি :—সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেও দেশ তখন এক গভীর সংকটের সম্মুখীন। সবচেয়ে ভয়াবহ ছিল সমগ্র মধ্য ভারত জুড়ে ব্যাপক লুটতরাজ ও ডাকাতি। এই অঞ্চলেই পিণ্ডারীগণ যে কি এক প্রচণ্ড দুঃস্বপ্ন ছিল সাধারণ মানুষের কাছে সে সব কাহিনী আমাদের জানা। ঠগীদের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতার বিবরণও আমাদের অজানা নয়। তা ছাড়া সতীদাহ প্রথা, গঙ্গায় পুত্র বিসর্জন, পুরীর জগন্নাথের চাকার সামনে আত্মাহুতি—এমন বহু কুসংস্কার সমাজ-জীবনের চলৎ শক্তি প্রায় নিঃশেষ করে ফেলেছিল। সবচেয়ে লক্ষ্যণীয় হ'ল, ধর্মের নামে এমন সব অমানবিক পৈশাচিক সংস্কার সমাজ জীবনে প্রচলিত ছিল যেগুলো দেখে বিশ্বাস করাই যায় না যে অহিংসাই হ'ল ভারতের সনাতন ধর্মের মৌল শিক্ষা।

শিল্প চর্চার ক্ষেত্রেও সৃষ্টি হয়েছিল এক বিরাট শূন্যতা। কেননা যারা ছিলেন শিল্পানুরাগী ও পৃষ্ঠ পোষক তারা নিজেরাই চলমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থায় এত বেশী প্রপীড়িত যে শিল্পীর ও শিল্পের সমাদর করার সুযোগ আর তাদের ছিল না। "So architectore declined in size, vigour of conception. Even where money was available, as in Lucknow, taste was lacking, so that we find there a mixture rather than a fashion of styles and imitation rather than creation." দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও একই রকমের অচলাবস্থা। যেন প্রথাগত গতিতে সংস্কৃত ও আরবি ভাষার চর্চা চলছিল যথাক্রমে টোল ও মাদ্রাসায়।

অতএব এমন পারিপার্শ্বিকতায় সাম্রাজ্য গড়ে তুললো ইংরেজ বণিক সম্প্রদায়।

॥ নতুন সাম্রাজ্যবাদীদের ভূমিকা ॥

ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা করায়ত্ত করার মুহূর্তে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে সেদিন একবার থমকে দাঁড়াতে হয়েছিল। কারণ অপ্রত্যাশিত ভাবে অপরিমেয় প্রাপ্তিতে সেদিন তারা হয়েছিল হতচকিত, উল্লসিত। কিন্তু প্রাথমিক উত্তেজনা কেটে যেতেই তাদের আরেকবার থমকে যেতে হয় যে গুরুভার দায়িত্ব তারা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিল তার দিকে তাকিয়ে। যারা বিচক্ষণ তারা সেদিনই

বুঝেছিলেন, "Though triumphant at the moment the more farseeing regarded India more as a temporarily quiescent valcano which might erupt again at any moment than a prostrate body."

তাই উনবিংশ শতাব্দী ধরেই ইংলণ্ডে আরম্ভ হয়েছিল এক তুমুল আলোচনার ঝড়। এই ঝড় যতটা না পার্লামেন্টের অধিবেশনে প্রতিফলিত তার চেয়ে অনেক বেশী পরিস্ফুট বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, পথে-ঘাটে, রেঁস্তোরায়। এ বিষয়বস্তু হ'ল, এই যে ভারতবর্ষে নতুন এক সাম্রাজ্য গঠিত হ'ল, এর পর কি হবে? এই দেশে আইন শৃঙ্খলার পুনঃ প্রতিষ্ঠা নিরাপত্তা বিধান তুলনামূলক ভাবে সহজ কাজ। কিন্তু সে দেশের জনসাধারণ যাদের মঙ্গলসাধনের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই এডমণ্ড বার্কের নেতৃত্বে বৃটিশ পার্লামেন্ট প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তাদের সম্পর্কে কি করা হবে? এটাই অনেক গভীর ও জটিল প্রশ্ন।

এই প্রশ্নের যে প্রথম উত্তর পাওয়া গেল, তা রক্ষণশীল, প্রবক্তা হলেন হেষ্টিংস, উইলসন প্রভৃতি। এঁরা বললেন, "The company should govern in the Mughal and general Indian tradition, that is, proviling a framework of security beneath which traditional society could continue its wanted course." এ পথেই দেশে শান্তি স্থাপিত হবে, শান্তিপূর্ণ পরিবেশেই ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি হবে, ফলতঃ কোম্পানীর মৌল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এর বেশী কিছু করতে যাওয়াই মারাত্মক হবে। কেননা ধর্মান্ধ ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় বিধি ব্যবস্থার কোন রকম হস্তক্ষেপ আত্মহত্যারই সামিল হবে। তাই তাঁরা এদেশে খৃষ্টান ধর্ম প্রচারক প্রেরণেরও বিরোধী ছিলেন। ইংলণ্ডের দক্ষিণপন্থী টোরীগণ এ মত-বাদকেই সমর্থন জানালো।

কিন্তু শীঘ্রই এই মতবাদের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হ'ল। একদল, মূলতঃ মিশনারী, বললেন যে তাদের কর্তব্য হ'ল "to preach the gospel whose light would dissolve the mists of superstition and cruelty enshronding the Indian people." আরেক দল যারা পাশ্চাত্য চিন্তা-চেতনার শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী বললেন, পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞানের আলো ভারতবর্ষেও সঞ্চারিত করতে হবে সে দেশকে অন্ধত্ব, অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অন্ধকার থেকে মুক্ত করতে। তৃতীয় দল ভারতে নিযুক্ত কোম্পানীর তরুণ কর্মচারীবৃন্দ, যারা আকস্মিক ভাবে কোন ব্যাপক পরিবর্তনের পরিবর্তে ভারতীয়দের মানিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে এদেশের রূপান্তরের পক্ষপাতী ছিলেন।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত মিশনারী ও পাশ্চাত্য পন্থীদের মতবাদই গৃহীত হ'ল। এবং এই সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে যুগান্তকারী, কারণ এই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ভারতের বিবর্তনের সূত্রপাত যার পূর্ণাঙ্গ পরিণতি ১৯৪৭ সালে।

এই নতুন সিদ্ধান্তকে এদেশে কার্যকরী করতে প্রথম এলেন লর্ড উইলিয়ম

বেন্টিংক। মনে প্রাণে তিনি ছিলেন পাশ্চাত্যপন্থী ও মানবতাবাদী, ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সহানুভূতিহীন। তাঁরই উদ্যোগে পাশ্চাত্য ভাবধারা, চিন্তা চেতনার শেকড় ভারতীয় হৃদয়েও প্রোথিত হ'ল। আরম্ভ হ'ল ব্যাপক পরিবর্তনের সাজসজ্জা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এই প্রথম পরস্পরের মুখোমুখি হ'ল, পরিচয় হ'ল, আরম্ভ হ'ল পারস্পরিক ভাব ও মত বিনিময়ের প্রস্তাবনা। এখানে নবগঠিত ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের সদ্য গৃহীত সিদ্ধান্তের চরমতম সাফল্য, যার পরিমাপ আপাত বিচারে কখনোই সম্ভব নয়।

॥ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥

[ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঘটনাবলী ইতিহাসগত দিক থেকে এতই সাম্প্রতিক যে এই সব ঘটনাবলী থেকে সাংবাদিকতার আবরণটি এখনো পরিত্যক্ত হয় নি। তারফলে এই পর্যায়ের নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের সময় এখনো আসে নি। অবশ্য তাই বলে ভারতের ইতিহাসের এই স্তর নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা থেমে নেই। প্রকাশিত হয়েছে এই প্রসঙ্গে অসংখ্য পুস্তক, যেগুলো কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণাঙ্গ, কখনো বা খণ্ডাংশ। তবে এই সময়ের ইতিহাস রচনার সবচেয়ে বড় প্রতি-বন্ধক হ'ল, নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক মূল্যায়নের জন্য যে সব মৌলিক বা প্রত্যক্ষ উপাদানের (যথাঃ সরকারী দলিল ইত্যাদি) প্রয়োজন তা লভ্য নয়। ফলে ঐতিহাসিককে পরোক্ষ উপাদানের উপরই নির্ভর করতে হয়।

এসব সত্ত্বেও মধ্য শিক্ষা পর্ষদের নতুন পাঠ্যক্রমে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কাহিনী আবশ্যিক পাঠ্য হিসেবে নির্দেশিত। এই দীর্ঘ কাহিনীর বিস্তারিত আলোচনা এখানে সুযোগ স্বল্পতার জন্য সম্ভব নয়। তাই এই কাহিনীর একটি রূপ রেখা এখানে উপস্থাপিত হ'ল। এক্ষেত্রেও স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন অধ্যায়ের উপর সাম্প্রতিক গবেষণা লব্ধ ফলাফলকেই যতটা সম্ভব সংকলিত করার চেষ্টা করা হ'ল।]

॥ উনবিংশ শতাব্দীর "নবজাগরণ" ॥

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমিকা অনুসন্ধান করতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে উনবিংশ শতাব্দীতে, যখন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে এক জাগরণ এসেছিল, যে জাগরণকে বহু ঐতিহাসিক নবজাগরণ বলে চিহ্নিত করেছেন। এই তথাকথিত 'নবজাগরণের' প্রথম সূত্রপাত বঙ্গদেশে।

বঙ্গদেশে এই জাগরণ আরম্ভ হ'ল রাজা রামমোহন রায়কে কেন্দ্র করে। তারপর এলেন ডিরোজিও ও তাঁর ইয়ং বেঙ্গলের দল। এরপর ব্রাহ্ম সমাজের সংস্কারকগণ এবং অক্ষয় দত্ত, বিদ্যাসাগর এসেছেন ক্রমান্বয়ে। এই জাগরণের পর্ব শেষ হ'ল হিন্দু মেলা, ন্যাশন্যাল থিয়েটার এবং ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন প্রভৃতি সংগঠনের মধ্য দিয়ে।

কিন্তু যাকে আমরা নবজাগরণ বলতে চাইছি তার প্রকৃত স্বরূপ কি? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণ করতে গেলে আমাদের পরীক্ষা করে দেখতে হয় এ সময়কার বিভিন্ন মহামানবদের জীবন-কাহিনীও তাঁদের কার্য্যাবলী এবং যেসব সম্ভাবনাপূর্ণ সংগঠন গড়ে উঠেছিল সেইসব সংগঠনের বক্তব্য ও কর্ম পন্থা। এ কাজ জটিল, তথ্যবহুল এবং সময় সাপেক্ষ। অন্ততঃ যে প্রশ্নগুলির সূক্ষ্ম ও সুচারু বিচার হওয়া প্রয়োজন এই প্রসঙ্গে, সেগুলি হ'ল:

(এক) এইসব ব্যক্তিদের ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে মতামত কি ছিল? তাঁরা কি বিদেশী শাসনমুক্ত একটি স্বাধীন দেশের স্বপ্ন দেখতেন? নাকি তাঁরা ইংরেজ সাম্রাজ্য-বাদের কিছু দৃষ্টি বিভ্রান্তকারী সংস্কারেই সন্তুষ্ট ছিলেন?

(দুই) দেশের বৃহত্তর জনসমাজ, বিশেষ করে কৃষক সম্প্রদায় সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কি ছিল? কৃষক সম্প্রদায়ের কথাই এ প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে এসে যায়। কারণ তদানিন্তন পারিপার্শ্বিকতায় কৃষক সমাজকে এড়িয়ে গেলে বৃহত্তর জনসমাজকেই এড়িয়ে যাওয়া হয়। অতএব আমাদের বিচার করা কর্তব্য, এই যুগের নেতৃবৃন্দ কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বা সামন্ততান্ত্রিক সুবিধাবাদের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন? নাকি তাঁরা ছিলেন এমন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রতিভূ যাঁরা অন্ততঃ কৃষক-সমস্যা সম্পর্কে গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন?

(তিন) বহুধা-বিচ্ছিন্ন ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য কি ছিল? এই বিচ্ছিন্নতা একদিকে যেমন ছিল হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য দিকে তেমনি ছিল জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার মধ্যে। তাঁদের কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে কতটা ধর্মনিরপেক্ষতার মানসিকতা পরিস্ফুট?

(চার) ভারতের যে নিজস্ব প্রগতিবাদী ঐতিহ্য সে সম্পর্কে তাঁরা কতটা সচেতন ছিলেন? তাঁরা কি মনে করতেন যে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ সুপরিকল্পিত ভাবে ভারতকে তার নিজস্ব অতীত থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চায়? এবং যা সার্থকভাবে করতে পারলে ভারতের ভবিষ্যৎকেও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলা যাবে?

(পাঁচ) এবং ভারতের বাইরে ঊনবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী যে দ্রুত গতিতে ধাবমান এবং যে ধাবমানতার সঙ্গে সঙ্গে সামগ্রিক পরিস্থিতি ছিল নিয়তই পরিবর্তনশীল,—এইসব পরিবর্তনশীলতার সঙ্গে তাঁদের সখ্যতা ছিল কতটুকু?

এইসব প্রশ্নের যথোচিত বিচার ও বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই স্থির হয়ে যাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর জাগরণের স্বরূপ কি? সত্যিই, 'নবজাগরণ' বলে আখ্যা কি বাস্তব তথ্য-নির্ভর নাকি তা আমাদের একান্তই সুখদায়ক কষ্ট-কল্পিত এক কাহিনী মাত্র?

অতএব আমাদের প্রথম প্রশ্ন, ইংরেজ শাসন সম্পর্কে এই সময়কার সংস্কারক-গণের মনোভাব। নিঃসন্দেহে এঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ শাসনের সমর্থক। এঁরা বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের কেবলমাত্র সুফলটুকুই দেখেছিলেন এবং ইংরেজ-শাসনকে

আশীর্বাদ হিসেবেই বিবেচনা করতেন। ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে সে কারণে এঁদের মতামত ছিল অত্যন্ত কঠোর। সাধারণভাবে শিক্ষিত সমাজ এই বিদ্রোহের বিরোধীতাই করেছিলেন।

দ্বিতীয়তঃ কৃষক সমাজ সম্পর্কে এঁরা কখনোই সহৃদয়তার পরিচয় দেন নি। এঁদের অধিকাংশই ছিলেন জমিদার গোষ্ঠীর পৃষ্ঠ পোষক। তাই বিভিন্ন কৃষক সম্প্রদায়ের বিদ্রোহকে এঁরা নিন্দাই করেছেন। তাঁদের অভিমত নগ্নভাবে প্রকাশ পায় ১৮৭৩ সালের পাবনার কৃষক বিদ্রোহ।

তৃতীয়তঃ এইসব সংস্কারকগণ কেবল মুসলমান—বিরোধীই ছিলেন না, জাতিভেদ প্রশ্নেও ছিলেন অত্যন্ত রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন।

চতুর্থতঃ তদানীন্তন অবস্থার বিচার ও বিশ্লেষণে এঁরা উপনিবেশিকতাবাদের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়াকে মেনে নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক যে অববাদ ভারতকে আচ্ছন্ন করে ছিল তাঁরা এদেশের স্বভাবসিদ্ধ রক্ষণশীলতাকেই তার জন্য দায়ী করেছেন। উল্টো দিকে তাঁরা এমন কথাও বলেছেন যে ইউরোপীয়গণের মাধ্যমেই এদেশে এসেছে পাশ্চাত্য ভাবধারা পুষ্ট গতিশীলতা, যার সাহায্যে ভারত তার দীর্ঘ দিনের তন্দ্রাচ্ছন্নতাকে কাটিয়ে উঠ্‌তে পারে।

কিন্তু তাই বলে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তখন পর্যন্ত এদেশে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া ভুল হবে। বরং হয়েছিল এবং তুমুলভাবেই হয়েছিল। বিভিন্নস্থানের অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ, বিক্ষিপ্ত হলেও, ঐ প্রতিক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। ওয়াবী আন্দোলন কিংবা সন্ন্যাসীদের বিদ্রোহ আপাতঃদৃষ্টিতে অকিঞ্চিৎকর মনে হলেও এসব ঘটনার প্রতিক্রিয়া সুদূর প্রসারী। অন্যদিকে ইংরেজ শাসনের গোড়া পত্তনের কাল থেকেই মীরকাশিম, টিপু সুলতান বা নানা ফড়নবীসের ইংরেজ বিরোধীতা এই সব শাসকবর্গের ইংরেজ-শাসন সম্পর্কে দূরদৃষ্টির পরিচয় বহন করে। এবং এ ধরনের নানা ঘটনার এবং মানসিকতার সংমিশ্রণের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের মধ্য দিয়ে।

সুতরাং এইসব তথ্যের ভিত্তিতে আমাদের বিচার্য, উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণকে আমরা নবজাগরণ আখ্যা দিতে পারি কি না। এমন কি যে ঐতিহাসিক গুরুত্ব এই জাগরণের উপর আরোপিত হয়ে থাকে তাও যথোচিত কি না। বরং একদিক থেকে বলা যায় তথা কথিত নবজাগরণের প্রবক্তাগণ তাঁদের বক্তব্য ও কার্যাবলীর দ্বারা জাতীয় গতিশীলতাকে পেছনের দিকে ঠেলে না নিলেও কিছুদিনের জন্য স্তব্ধ করে দিয়েছিলেন। কিন্তু নবজাগরণের গতিবেগ কি কখনো পশ্চাদগামী হয়, নাকি কখনো অচঞ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে ?

[এ বিষয়ের উপর উৎসাহী যারা তাঁরা নীচের বইগুলো অবশ্যই পড়বেন :

১। Notes on Bengal Renaissance and other Eassays—by Susobhan Sarker

২। Reform and Regeneration in India—by Amitabha Mukherjee.
৩। Awakening in Bengal in Early 19th century—ed. by Gautam Chatterjee.
৪। Civil disturbances in India—by S. B. Chowdhury.

॥ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ॥

॥ সংগ্রামের ইতিহাস রচনার অসুবিধা ॥

অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে, তুলনামূলকভাবে ভারতের জাতীয় আন্দোলন এখনো সাম্প্রতিক বিষয়। স্বভাবতঃই এ কারণে সংগ্রামের ইতিহাস রচনার উপযুক্ত সময় আসে নি। তবুও ইতিহাসের এই চিত্তাকর্ষক অধ্যায়টিকে কেন্দ্র করে ঐতিহাসিকদের মুখর জিজ্ঞাসা কখনো স্তব্ধ হয়ে থাকতে পারে না। তাই রচিত হয়েছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য পুস্তক।

ফলে একটা বিষয়ে অন্ততঃ সুবিধে হয়েছে। তা হ'ল পুস্তকের সংখ্যাধিক্য হেতু এখন এই পর্য্যায়ের ইতিহাস রচনার দুরূহতা সম্পর্কে ধারণা করা গিয়েছে। প্রকাশিত পুস্তকগুলির রচনাশৈলীর ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা সাধারণভাবে প্রকট আগামী দিনের ইতিহাস রচনার গতি-নির্দেশক এবং এ সব দুর্বলতাগুলো হ'ল প্রধানতঃ

(এক) অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘটনার বিশ্লেষণে অতিরিক্ত সরলীকরণের (Over simplification) চেষ্টা। ইতিহাসে প্রতিটি ঘটনার বিচার বিশ্লেষণ যে এক জটিল প্রক্রিয়া তা আমরা দেখেছি। পদ্ধতিগত দিক থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণে এই প্রক্রিয়া অনুপস্থিত। কারণ হয়তো এটা হতে পারে যে, এখনো আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যারা স্বাধীনতা-আন্দোলনের প্রত্যক্ষদর্শী। কিন্তু ব্যক্তিগত প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই যে ঘটনার একমাত্র বিচারক হতে পারে না, বিশেষ করে স্বাধীনতা আন্দোলনের মত আবেগ প্রধান বিষয় নিয়ে ইতিহাস রচনা কালে, তাতো সহজেই অনুমেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এমন এক অনড় মনোভাব তৈরী করে দেয়, যা অন্ততঃ নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনার সহায়ক নয়।

(দুই) প্রধানতঃ ভারতীয়দের মধ্যে বীর পূজার মনোভাব (attitude of Hero-worship) অত্যন্ত প্রবল, ফলে নৈর্ব্যক্তিক ইতিহাস রচনার এই মনোভাব হয়ে দাঁড়ায় এক বিরাট প্রতিবন্ধক। আর স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে এমন 'বীরের' উপস্থিতি একান্তই স্বাভাবিক যিনি আমাদের হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি আকর্ষণ করেন। সেক্ষেত্রে প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্যায়ন যথেষ্ট বিঘ্নিত হয়। বাস্তব ক্ষেত্রে ঘটছেও তাই। যতটুকু জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস আজ পর্যন্ত লিখিত হয়েছে সর্বত্রই এই বীর পূজার প্রবণতা অত্যন্ত স্পষ্ট। ফলে সামগ্রিক বিচার-বিশ্লেষণ বিশেষভাবে ব্যাহত হয়।

(তিন) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের আরেকটি অনুল্লেখনীয় সংকট হ'ল আঞ্চলিক প্রীতি বা আনুগত্য (regional loyalty)। যেমন সাধারণভাবে আমরা লক্ষ্য করি, ভারতের ইতিহাস রচনায় উত্তর ভারতের প্রাধান্য এবং তুলনামূলকভাবে দক্ষিণ ভারত উপেক্ষিত, তেমনি স্বাধীনতার আন্দোলনের কাহিনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে আঞ্চলিক প্রীতি একটি বড়ো ধরনের সমস্যাও থাকে। বিশেষ করে এই আন্দোলনে যখন ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল সমভাবে এগিয়ে আসে নি কিংবা সম পরিমাণ অংশও নেয় নি এবং এটা হয়তো সম্ভবও নয়। কেননা, স্বাধীনতা আন্দোলনে শামিল হওয়াটা কখনো তুলাদণ্ডে মেপে ভাগ-বাটোয়ারা করার বিষয় নয়। কিন্তু ইতিহাস রচনাকালে যদি অধিকতর অগ্রণী অঞ্চল প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাধান্য পেয়ে যায় কিংবা এই প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি অন্য অঞ্চল উপেক্ষিত বা অনাদৃত থাকে তবে তা সঠিকভাবে ইতিহাস রচনার সহায়ক হবে না। সাধারণভাবে একদৃষ্টিতে আমরা বলতে পারি, স্বাধীনতা আন্দোলনে বাংলা, পাঞ্জাব ও মহারাষ্ট্র অধিকতর অগ্রণী হয়েছিল। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে এই তিন প্রদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামই ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম। বরং অন্যান্য অঞ্চল কতটুকু অংশ নিয়েছিল, কিংবা উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করতে পারলো না কেন কিংবা উল্লিখিত অঞ্চলগুলো অধিকতর অগ্রণী হ'ল কেন তার কারণ অনুসন্ধানই সত্যান্বেষী ঐতিহাসিকের দায়িত্ব।

(চার) ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের অপর একটি অনস্বীকার্য বৈশিষ্ট্যই এই আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস রচনায় আরেকটি বড় বিঘ্ন। সে বৈশিষ্ট্যটি হ'ল: স্বাধীনতা অর্জনে প্রযুক্ত অহিংস নীতি। এই বৈশিষ্ট্যই একটি সংকট। সংকট এ কারণে যে আন্দোলনের প্রধান নেতৃবৃন্দ নিঃসন্দেহে অহিংস নীতির উপর অবিচল আস্থা রেখে আন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা অর্জনও সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু অহিংস নীতির পাশাপাশি সহিংস পথও অবলম্বিত হয়েছিল। ভারতে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ এবং জাতীয় জীবনে এই আন্দোলনের প্রভাবও ছিল অপরিসীম এই সিদ্ধান্ত অধিক যুক্তিতর্কের দ্বারা প্রতিষ্ঠার অপেক্ষা রাখে না। শেষ পর্যন্ত নেতাজী সুভাষচন্দ্র যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের পথ বেছে নিয়েছিলেন, তা কার্যত: ব্যর্থ হলেও তাঁর কর্ম প্রচেষ্টা সীমাহীন ঐতিহাসিক তাৎপর্য-মণ্ডিত। অতএব কেবলমাত্র অহিংস নীতি নয়, অহিংস ও সহিংস উভয় নীতিই অনুসৃত হয়েছিল জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যে।

যাই হোক, ইতিহাস রচনাকালে দেখা গেল এই দুই পথের তাৎপর্য ও সাফল্য বিশ্লেষণ করা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতদ্বৈধতা। অবশ্য এই মতদ্বৈধতা কেবল ঐতিহাসিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রাজনীতিবিদ, রাষ্ট্রতত্ত্ববিদ, সাধারণ দেশপ্রেমিক মানুষ—সবাই এই মতদ্বৈধতার দ্বারা আক্রান্ত। ফলে ঐতিহাসিকের নিকট সংকট আরও বেশী ঘনীভূত হয়। তাই দেখা যায়, উভয় নীতির সাফল্যের তুলনামূলক

বিচারের পরিবর্তে একটি পূর্ব-নির্ধারিত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ইতিহাস রচনার প্রবণতা। ফলে নীতি ছুটোর নিজস্ব অবদান নির্ধারণ থেকে যায় অবহেলিত।

॥ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভংগী ॥

অতএব দেখা গেল, উপরোক্ত বিঘ্নগুলিকে অপসারণ করা আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। অথচ বিঘ্নগুলি যতক্ষণ প্রকট ততক্ষণ নিরপেক্ষ ইতিহাসও আবিষ্কৃত হতে পারে না, রচিত হবে না। কিন্তু এই বিঘ্ন আছে বলেই—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নিয়ে পর্যালোচনা আপাততঃ স্থগিত রাখবো, এটাও বাঞ্ছিত নয়।

তাই আমাদের উদ্যোগ নিতে হয় যেন অন্ততঃ আমরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে একটি নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভংগী গ্রহণ করতে পারি, অন্ততঃ সংগ্রামের বিভিন্ন ধারাগুলোকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে পারি। এপথে আর কিছু না হোক্, স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন ঘটনাবলী অন্ততঃ নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হতে পারবে।

এই দৃষ্টিভংগী থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামকে বিচার করলে তিনটি পরিষ্কার প্রবাহ ফুটে ওঠে।

প্রথম এবং প্রধান প্রবাহটি হ'ল, বিশেষ করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন থেকে আরম্ভ করে স্বাধীনতা অর্জন পর্যন্ত যে দীর্ঘ সময়, এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের অনুসৃত নীতি, তার বাস্তবায়ন এবং সাফল্য। এই সময়ে জাতীয় কংগ্রেসই হ'ল ভারতের একমাত্র রাজনৈতিক সংগঠন, যেখানে দেশের বৃহত্তর জনমত প্রকাশিত ও প্রচারিত হবার সুযোগ পেয়েছিল। আরো বড় কথা হ'ল, মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেসই স্বাধীনতা সংগ্রামকে মুষ্টিমেয় কিছু সুবিধা ভোগীর রাজনৈতিক উত্তাপ অনুভবের পরিবর্তে এক বৃহৎ গণ আন্দোলনে রূপায়িত করেছিল, ভারতের যা কিছু জাতীয় চেতনা তা এই কংগ্রেসের মাধ্যমেই বিকশিত হয়েছিল এবং জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব অহিংস পথে স্বাধীনতা আন্দোলনের এক নতুন ঐতিহাসিক নজীর রচনা করে এক গৌরবময় উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। তাই—উল্লিখিত সময়ে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করতে পারলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে আসে।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রবাহটি হ'ল সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন। প্রকৃতপক্ষে বর্তমানে জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকার উপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন যথোচিত বিচার ও মূল্যায়ন থেকে বঞ্চিত হয়। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্য জনক। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে যাঁরা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাঁদেরও একটি নিজস্ব বিচারবোধ ছিল, নীতিবোধ ছিল এবং সেই নীতির রূপায়ণে নিঃসন্দেহে তাঁরা একনিষ্ঠ ছিলেন। অতএব এইসব কর্মবীর দেশপ্রেমিকদের যথোচিত ঐতিহাসিক মর্যাদাদান আমাদের জাতীয় কর্তব্য। শুধু তাই নয়। আমাদের আরও বিচার করে দেখতে

হবে, এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, হয় বিক্ষিপ্ত এবং বিচ্ছিন্নই হোক না কেন, ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদকে কতটা সন্ত্রস্ত ও সংকুচিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্ত বলেই এই আন্দোলনকে অবজ্ঞা করা চলে না। কারণ সন্ত্রাসবাদ কখনো প্রচলিত অর্থে সুসংগঠিত ক্রিয়াই হতো না, যদিও সংগঠিত সন্ত্রাসবাদীদের অবশ্যই হতে হয়। তাছাড়া রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্বাহ্নে নিহিলিস্টদের ভূমিকা যদি অগ্রাহ্য করার মত না হয়, যদি এখনো আমরা ইতালীর ঐক্যসাধনে কারবোনারি দলের ভূমিকা বিস্মৃত হতে না পেরে থাকি, তাহলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে সন্ত্রাসবাদীদের প্রতি অবজ্ঞা বা উপেক্ষা প্রদর্শনের কোন যুক্তিযুক্ত কারণ নেই।

তৃতীয় প্রবাহটি হ'ল শ্রমজীবী মানুষের ক্রমবর্ধমান সচেতনতা। দীর্ঘকাল মুখ বুঁজে মার খেতে খেতে এইসব মানুষেরা ক্রমশঃ সংগঠিত হয়েছিল, সংগঠন গড়ে তুলেছিল এবং এইসব সংগঠন যে কেবলমাত্র তাদের ন্যূনতম জীবীকার প্রয়োজনের মুখপাত্র ছিল তা নয়, বরং জীবন ধারণের দাবিদার সংগ্রামের মধ্যে দিয়েই তারা অনুভব করেছিল সাম্রাজ্যবাদের নিরঙ্কুশ অন্ধকার রূপটি এবং হৃদয়ংগম করেছিল যে সাম্রাজ্যবাদের বেড়াজাল ছিন্ন করতে না পারলে জীবন ধারণের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটার কোন অবকাশই নেই। তাই প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে শ্রমিক সংগঠনগুলো স্বাধীনতা আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পথটিকে অধিকতর প্রশস্ত ও পিচ্ছিল করে তুলেছিল। অতএব স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস আলোচনা কালে এদিকেও যথেষ্ট আলোকপাত করাও একান্তই অপরিহার্য।

[ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বিস্তারিত পাঠের জন্য কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বইয়ের নাম নীচে দেওয়া হ'ল। উৎসাহী যারা, তারা বইগুলো পড়লে এই ইতিহাস সম্পর্কে তাত্ত্বিক বিচার বিশ্লেষণের সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন।]

এক. ডঃ রমেশ মজুমদারের লেখা ইংরেজীতে তিন খণ্ডে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস।

দুই. India's struggle for freedom—by Prof. Hiren Mukherjee.

তিন. India's freedom—by Jawaharlal Nehru.

চার. Freedom Struggle—by Bipin Chandra, Amalesh Tripathi and Barun De.

পাঁচ. The Evolution of India and Pakistan—edited by C. H. Phillips.

॥ ভরতের ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী ॥

সময়	ঘটনাবলী
খৃষ্ট পূর্ব ৩০০০	বৎসর আগে সিন্ধু সভ্যতার বিকাশ।
,, ২৫০০	বৎসর আগে বৈদিক যুগের আরম্ভ।
,, ষষ্ঠ শতকে	মহবীরের আবির্ভাব ও মগধের অভ্যুদয়।
,, ৫৬৭	বুদ্ধদেবের আবির্ভাব।
,, ৩২৭—৩২৬	আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।
,, ৩২৪	চন্দ্রগুপ্ত ও মৌর্যবংশের অভ্যুদয়।
,, ২৭৩	অশোকের রাজত্ব আরম্ভ।
খৃষ্টাব্দ ১১৯ বা ১৫৫—	কণিষ্কের রাজ্যভার গ্রহণ।
,, ৩৮০	গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যারোহণ।
,, ৩৯৯—৪১৪	ফা হিয়েনের ভারত ভ্রমণ।
,, ৬০৬	এই সময় নাগাদ বাংলার গৌড়ে শশাংকের স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
,, ৬২৯—৪৪	হিউয়েন সাং-এর ভারত ভ্রমণ।
,, ৬৩৪	চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর নিকট হর্ষবর্ধনের পরাজয়।
,, ৬৪৩	হর্ষ কর্তৃক ধর্মসভার অনুষ্ঠান।
,, ৭৭০—৮১০	বাংলায় ধর্মপালের শাসনকাল।
,, ৮১০—৮৫০	বাংলায় দেবপালের শাসনকাল।
,, ৯৭৩	রাষ্ট্রকূট শক্তির অবসান।
,, ৯৯৮—১০৩০	সুলতান মামুদের শাসনকাল।
,, ১১৯০—৯১	তরাইনের প্রথম যুদ্ধ।
,, ১১৯২	তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ।
,, ১২০৬	কুতুবউদ্দীন আইবক কর্তৃক দিল্লীর সিংহাসন লাভ।
,, ১২১১—১২৩৬	ইলতুৎসমিসের রাজত্বকাল।
,, ১২৬৬—৮৭	গিয়াসউদ্দীন বলবনের রাজত্বকাল।
,, ১২৯০	খিলজী বংশের প্রতিষ্ঠা।
,, ১২৯৬—১৩১৬	আলাউদ্দীন খিলজীর শাসনকাল
,, ১৩২০	তুঘলক বংশের প্রতিষ্ঠা।
,, ১৩২৫—১৩৫১	মহাম্মদ বিন তুঘলকের শাসনকাল।
,, ১৩৩৩	ইবন বতুতার ভারত আগমণ।
,, ১৩৫১—১৩৮৮	ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকাল।
,, ১৪৩৭	বাহমনী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।

সময়	ঘটনাবলী
খৃষ্টাব্দ ১৪৬৯—১৫৩৮	গুরু নানকের জীবন-কাল।
,, ১৪৮৫-১৫৩৩	শ্রীচৈতন্যের জীবন-কাল।
,, ১৪৮৯-১৫১৭	বাংলায় হুসেন শাহের রাজত্বকাল।
,, ১৫২৬	বাহমনী রাজ্যের অবসান ও পানিপথের প্রথম যুদ্ধ।
,, ১৫২৭	খানুয়ার যুদ্ধ।
,, ১৫২৬-১৫৩০	মোগল সম্রাট বাবরের রাজত্বকাল।
,, ১৫৩০-১৫৪০	হুমায়ুনের রাজত্বকাল।
,, ১৫৩৯	শেরশাহের নিকট চৌসার যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়।
,, ১৫৪০	আবার বিল্বগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনের পরাজয়।
,, ১৫৪০-১৫৪৫	শেরশাহের রাজত্বকাল।
,, ১৫২৬-	হুমায়ুনের মৃত্যু, আকবরের রাজ্যলাভ ও পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ।
,, ১৫২৬-১৬০৫	আকবরের শাসনকাল।
,, ১৫৬৫	তালিকোটার যুদ্ধ ও বিজয়নগর রাজ্যের ধ্বংস।
,, ১৫৭১	ফতেপুর সিক্রি নগরীর প্রতিষ্ঠা।
,, ১৫৭৯	আকবরের ফরমান অনুযায়ী সপ্তগ্রামে পর্তুগীজ কুঠি নির্মাণ ও প্রথম ইংরেজ ধর্মযাজক স্টীভেন্স-এর ভারত আগমণ।
,, ১৫৮২	দীন-ইলাহি ধর্মের ঘোষণা।
,, ১৫৯৭	রাণা প্রতাপের মৃত্যু।
,, ১৬০০	আহ্‌মদ নগরের পতন, সেলিমের মৃত্যু ও ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা।
,, ১৬০৫-১৬২৭	জাহাঙ্গীরের রাজত্বকাল।
,, ১৬০৮	ইংরেজ কাপ্তেন হকিন্‌সের ভারত আগমন জাহাঙ্গীরের কাছে ইংরেজ কারখানা স্থাপনের অনুমতি প্রার্থনা ও সুরাটে প্রথম ইংরেজ কারখানা স্থাপন।
,, ১৬১৫	স্যার টমাস রো-র জাহাঙ্গীরের রাজসভায় আগমন ও বাণিজ্যিক অনুগ্রহ ভিক্ষা।
,, ১৬২৮-১৬৫৮	শাহজাহানের রাজত্বকাল।
,, ১৬৩০-১৩৩২	দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ।
,, ১৬৫৮-১৭০৭	ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।
,, ১৬৭৪	শিবাজীর রাজ্যাভিষেক ও ছত্রপতি উপাধি গ্রহণ।
,, ১৬৮০	ইংরেজদের অবাধ বাণিজ্যিক অধিকার দিয়ে ঔরঙ্গজেবের ফরমান জারী।

সময়	ঘটনাবলী
খৃষ্টাব্দ ১৬৯০	জব চার্ণকের সুতানুটি আগমন এবং ইংরেজদের সুতানুটি, গোবিন্দপুর ও কলিকাতার ইজারা লাভ।
,, ১৭৩১	চন্দননগরের শাসনকর্তা হিসেবে ডুপ্লের আগমণ।
,, ১৭৪৪-৪৮	প্রথম ইঙ্গ ফরাসী (কর্ণাটক) যুদ্ধ।
,, ১৭৫০-৫৪	দ্বিতীয় ইঙ্গ ফরাসী (কর্ণাটক) যুদ্ধ।
,, ১৭৫৬	বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলা।
,, ১৭৫৭	পলাশীর যুদ্ধ, সিরাজের পরাজয় ও মীরজাফরের পুত্র মীরণের হাতে মৃত্যু।
,, ১৭৬১	তৃতীয় পাণিপথের যুদ্ধ।
,, ১৭৬৫	মীরজাফরের মৃত্যু, বাংলায় নবাবী আমলের অবসান, ইংরেজ কোম্পানীর বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ, বাংলায় দ্বৈত শাসন।
,, ১৭৭০	ছিয়াত্তরের মন্বন্তর।
,, ১৭৭৩	রেগুলেটিং এ্যাক্ট, কলকাতায় সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠা, লাসায় ইংরেজ দূত প্রেরণ।
,, ১৭৭৬	পুরন্দরের সন্ধি।
১৭৮২	সলবাই-এর সন্ধি ও হায়দর আলীর মৃত্যু।
১৭৮৪	টিপু ও ইংরেজদের মধ্যে ব্যাংগালোরের সন্ধি। পিটের ইণ্ডিয়া এ্যাক্ট।
,, ১৭৯০-৯২	তৃতীয় মহীশূর যুদ্ধ। টিপুর পরাজয় ও শ্রীরঙ্গ পত্তনের সন্ধি।
,, ১৭৯৩	চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত।
,, ১৭৯৮	লর্ড ওয়েলেস্‌লি ও অধীনতামূলক মিত্রতা।
,, ১৭৯৯	চতুর্থ মহীশূর যুদ্ধ। টিপুর মৃত্যু।
,, ১৮০০	ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠা।
,, ১৮০৯	ইংরেজদের সঙ্গে শিখদের বন্ধুত্বঃ অমৃতসরের সন্ধি।
,, ১৮১৩	চার্টার এ্যাক্ট।
,, ১৮১৭-১৮	তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ।
,, ১৮২৪-২৬	ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরেজদের প্রথম যুদ্ধ।
,, ১৮২৬	গর্ভনর জেনারেল পদে লর্ড বেন্টিংক্‌।
,, ১৮৩১	ওয়াহাবী আন্দোলনের শুরু।
,, ১৮৩৩	চ্যার্টার অ্যাক্ট।
,, ১৮৩৮-৪২	প্রথম আফগান যুদ্ধ।
,, ১৮৪৫-৪৬	প্রথম শিখ যুদ্ধ।

সময়	ঘটনাবলী
খৃষ্টাব্দ ১৮৪৮-৪৯	দ্বিতীয় শিখ যুদ্ধ।
,, ১৮৪৮	লর্ড ডালহৌসি ও স্বত্ববিলোপ নীতি।
,, ১৮৫২	দ্বিতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ।
,, ১৮৫৭	সিপাহী বিদ্রোহ।
,, ১৮৫৮	মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণা পত্র।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

সময়	ঘটনাবলী
খৃষ্টাব্দ ১৮৮৫	বোম্বাই-এ জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন।
,, ১৮৯০	বাংলা সরকার কর্তৃক সরকারী কর্মচারীদের কংগ্রেসে যোগদান নিষিদ্ধ।
,, ১৮৯৬	স্বদেশী শিল্প প্রদর্শনীর ব্যবস্থা।
,, ১৮৯৭	স্বামী বিবেকানন্দের রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা।
,, ১৮৯৮	রাজদ্রোহের আইন।
,, ১৯০৫	বঙ্গ বিভাগের ব্যবস্থা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।
,, ১৯০৬	কংগ্রেস কর্তৃক 'স্বরাজ' শব্দের প্রথম ব্যবহার।
,, ১৯০৭	কংগ্রেসে উগ্রপন্থী ও নরমপন্থীদের মধ্যে বিভেদ।
,, ১৯০৮	সংবাদ পত্র দলন আইন।
,, ১৯০৯	মর্লে-মিন্টো সংস্কার।
,, ১৯১১	বঙ্গভঙ্গের ব্যবস্থা রদ।
,, ১৯১৫	নরম পন্থীদের অধীনে কংগ্রেস ও বাঘা যতীনের মৃত্যু।
,, ১৯১৬	কংগ্রেস-লীগ চুক্তি, কংগ্রেসে ঐক্য প্রতিষ্ঠা।
,, ১৯১৮	রাওলাট আইন।
	কংগ্রেস কর্তৃক মণ্টেগু চেম্‌সফোর্ড শাসন সংস্কারের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান।
,, ১৯১৯	৬ই এপ্রিল দেশব্যাপী হরতাল, গান্ধীজী গ্রেপ্তার, জালিয়ান ওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ও রবীন্দ্রনাথের 'নাইট' উপাধি ত্যাগ।
,, ১৯১৯-২২	খিলাফৎ আন্দোলন।
,, ১৯২০	কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ।
,, ১৯২০-২২	দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন।
,, ১৯২২	গান্ধীজীর কারাদণ্ড।
,, ১৯২৩	স্বরাজ্য দল গঠন।
,, ১৯২৪	সারা ভারত ট্রেড য়ুনিয়ন কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও কানপুর ষড়যন্ত্রের মামলা।

সময়		ঘটনাবলী
খৃষ্টাব্দ	১৯২৫	দেশবন্ধুর মৃত্যু।
,,	১৯২৬-২৭	শ্রমিক-কৃষক পার্টির প্রতিষ্ঠা।
,,	১৯২৭	সাইমন কমিশন, কংগ্রেস কর্তৃক সাইমন কমিশন বর্জন ও পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।
,,	১৯২৮	কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা।
,,	১৯২৯	মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা, কংগ্রেসের পূর্ণ স্বরাজ, আইন অমান্য ও খাজনা বন্ধের প্রস্তাব গ্রহণ।
,,	১৯৩০	গান্ধীজীর ড্যাণ্ডি অভিযান।
,,	১৯৩০-৩২	দেশব্যাপী আইন-অমান্য আন্দোলন। গোলটেবিল বৈঠক।
,,	১৯৩১	গান্ধী-আরউন চুক্তি, দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকে গান্ধীজীর যোগদান ও কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত।
,,	১৯৩২	তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক ও সাম্প্রদায়িক বাটোয়ারা।
,,	১৯৩৪	সোশ্যালিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা ও কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত।
,,	১৯৩৫	ভারত শাসন বিধি।
,,	১৯৩৭	বিভিন্ন প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ।
,,	১৯৩৮	কংগ্রেস সভাপতি পদে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু।
,,	১৯৩৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ, কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ, সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের সভাপতি পদত্যাগে বাধ্য।
,,	১৯৪০	সুভাষচন্দ্রের কংগ্রেসের সভ্যপদ খারিজ। মুসলীম লীগের পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ।
,,	১৯৪১	সুভাষচন্দ্রের দেশত্যাগ।
,,	১৯৪২	স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসের ভারত আক্রমণ ও দৌত্যে ব্যর্থতা। ৯ই আগষ্ট গান্ধীজী ও কংগ্রেসে নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার, কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত ও "ভারত-ছাড়ো" আন্দোলন শুরু।
,,	১৯৪৩	সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ ও আজার হিন্দ সরকার গঠন।
,,	১৯৪৪	রাজাগোপালাচারির কংগ্রেস-লীগ ঐক্য প্রয়াস।
,,	১৯৪৫	কংগ্রেস নেতাদের মুক্তি, সিমলা সম্মেলন ও আজাদ ফৌজের তিন নায়কের বিচার ও দণ্ড।
,,	১৯৪৬	বোম্বাই-এ নৌ বিদ্রোহ, ক্যাবিনেট মিশন, সকল দলের সংবিধান সভার নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ২৯শে জুলাই সারা বাংলা হরতাল, ১৬ই আগষ্ট কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা।
,,	১৯৪৭	মাউণ্ট ব্যাটেন পরিকল্পনা, ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে ভারতের স্বাধীনতা বিধি পাস, ১৫ই আগষ্ট ভারতের স্বাধীনতা লাভ।
,,	১৯৪৮	৩০শে জানুয়ারী, গান্ধীজীর মৃত্যু।
,,	১৯৫০	২৬শে জানুয়ারী, প্রজাতন্ত্র দিবস, ভারত রাষ্ট্রের সংবিধান প্রবর্তিত।

ইতিহাস শিক্ষণ পদ্ধতি

তৃতীয় পর্ব

পাঠ পরিকল্পনা
[LESSON PLAN]

প্রথম অধ্যায়

ইতিহাসের পাঠ পরিকল্পনা

॥ বিষয় বস্তু ॥

পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন—পাঠ পরিকল্পনা রচনার কয়েকটি নীতি—পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর—পাঠ পরিকল্পনার সার্থকতার মূল্যায়ন—কয়েকটি নমুনা পরিকল্পনা।

"The best part of a student's training in the art of teaching consists not in listening to eloquent lectures, but in preparing lessons and in giving them under the guidance over right of a skilled tutor."

"Careful lesson-planning is the foundation of all good teaching from the first day of student-teaching to the last day of the month of the retirement year."

॥ পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজন ॥

ইতিহাস শিক্ষণে বিভিন্ন পদ্ধতি এতক্ষণ আমরা আলোচনা করেছি। সম্ভাব্য শিক্ষকেরা সে সব আলোচনা প্রনিধান করবার চেষ্টাও করেছেন। কিন্তু সব আলোচনাই থেকে যাবে একান্তই তাত্ত্বিক, যদি না সেগুলোর বাস্তব প্রয়োগ ঘটে। এই প্রয়োগ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলবে শ্রেণীকক্ষে, দৈনন্দিন কর্তব্য-কর্ম করবার মধ্য দিয়ে। তাই বিভিন্ন তাত্ত্বিক পদ্ধতির ব্যবহারিক প্রয়োগ-কৌশলের জন্য প্রয়োজন নৈমিত্তিক পাঠদানের পাঠ পরিকল্পনা।

পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে শিক্ষার আদর্শ প্রতিফলিত হয়, বিষয়-বস্তুর সুনির্বাচন সম্ভব হয়, পাঠদান কৌশল স্থিরীকৃত হয়।

সঠিক পথ অনুসরণ

পাঠ পরিকল্পনা শিক্ষককে পাঠদানে সঠিক পথে নিয়ন্ত্রিত করে, ফলে শিক্ষাদানে ক্রমিক অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। কারণ শিক্ষক সুচিন্তিত ভাবে এমন সব কার্য্যাবলী নির্বাচন করেন যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করা যায়।

পাঠ পরিকল্পনা অযথা অপব্যয় রোধ করে। পরিকল্পনাহীনভাবে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কর্মসূচীর ফলে যে বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, পাঠ পরিকল্পনা থাকলে তেমন অবস্থা কখনো সৃষ্টি হবে না।

পাঠ পরিকল্পনা থাকলে শিক্ষক শ্রেণীকক্ষে গিয়ে কখনো এমন অস্বস্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হবেন না, যখন তার মনে হবে যে তিনি হয়তো ফুরিয়ে গিয়েছেন অথবা আলোচনাকালে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে আলোকপাত করতে তিনি বিস্মৃত হয়েছেন। "The teacher can enter the class without anxiety, ready to embark with confidence upon a job he understands and prepared to carry it to work-man-like conclusion."

শিক্ষকের স্বস্তিবোধ

সর্বোপরি পাঠ পরিকল্পনা অনিয়ন্ত্রিত ও অবিন্যস্ত পাঠক্রমকে সঠিক পথে নিয়ে আসতে সাহায্য করে। পাঠ পরিকল্পনা যেহেতু শিক্ষকের সামগ্রিক কাজ-কর্মের একটি কাঠামো-বিশেষ, সেই হেতু এখানে অকারণ ও অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের কোন স্থান নেই। তা ছাড়া পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে সমগ্র পাঠদানের একটি ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়।

॥ পাঠ পরিকল্পনা রচনার কয়েকটি নীতি ॥

প্রথমতঃ শিক্ষক তার পাঠ পরিকল্পনা নিশ্চয়ই বিশেষ যত্নের সঙ্গে তৈরী করবেন, কিন্তু এই পাঠ পরিকল্পনা কখনোই শিক্ষকের উপর প্রতিবন্ধক হিসেবে আরোপিত হবে না। বরং শিক্ষকের এই স্বাধীনতা থাকবে যে তিনি প্রয়োজন অনুসারে সেই পরিকল্পনা থেকে সরে আসতে পারবেন। "The plan is to be used as a guide rather than as a rule of thumb to be obeyed blindly."

শিক্ষাদানের সহায়ক

দ্বিতীয়তঃ যে বিষয়ের উপর শিক্ষক পাঠদান করবেন, সেই বিষয়ের উপর তাকে যথেষ্ট দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য অর্জন করতে হবে। এই দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য না থাকলে একটি সম্পূর্ণ নির্ভুল পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়ে যাবে।

তৃতীয়তঃ শিক্ষককে ইতিহাস শিক্ষাদান সম্পর্কীত পদ্ধতিগুলোর সঙ্গে গভীরভাবে পরিচিত হতে হবে।

চতুর্থতঃ শিক্ষক অবশ্যই তার শিক্ষার্থীদের আন্তরিক ভাবে জানবেন। এই জানার ভিত্তিতেই তিনি তার বিষয়-বস্তুকে বিন্যস্ত করবেন শুধু যুক্তিবাদী দৃষ্টিকোণ থেকেই নয়, মনস্তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকেও বটে।

পঞ্চমতঃ শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা এমন ভাবে রচনা করবেন যেন সেখানে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ থাকে।

ষষ্ঠতঃ পরিকল্পনাটি যেন বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়, সেদিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে। যে কোন ধরনের একঘেঁয়েমি শ্রেণীর প্রাণশক্তিকে নিঃশেষ করে ফেলে। এই ত্রুটি যেন পাঠ পরিকল্পনার মধ্য দিয়েও প্রকটিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

॥ পাঠ পরিকল্পনার বিভিন্ন স্তর ॥

প্রথম হ'ল পাঠ পরিকল্পনায় উদ্দেশ্য নির্ণয়। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষক যাচ্ছেন। শিক্ষার্থীগণ তার জন্য অপেক্ষিত। শিক্ষককে পরিষ্কার স্থির করে নিতে হবে, কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছুবার সিদ্ধান্ত নিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াবেন। এটা অত্যন্ত জরুরী। কারণ উদ্দেশ্যবিহীন কোন কাজই সার্থকতায় উত্তীর্ণ হতে পারে না। এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করেই তিনি বিষয়বস্তু বিন্যস্ত করবেন, পাঠদান পদ্ধতি নির্বাচন করবেন, এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষার উপকরণ প্রস্তুত করবেন। প্রকৃতপক্ষে শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকের সমগ্র কর্মধারা নির্ধারিত হবে তার শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য দ্বারা।

উদ্দেশ্য নির্ণয়

পাঠ পরিকল্পনার দ্বিতীয় স্তর হ'ল আয়োজন। এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মন পাঠাভিমুখী করে তুলবেন। শিক্ষকতায় শিক্ষক কতটা নৈপুণ্য ও দক্ষতা অর্জন করেছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় এই স্তরে। কারণ এই স্তরে যত বেশী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করতে পারবেন তত বেশী তার সাফল্য লাভের সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। তাই আয়োজনের স্তরকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তুলতে আমরা বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থা অবলম্বন করতে পারি। যেমন: চিত্তাকর্ষক বিভিন্ন রকমের উপকরণ প্রদর্শন, তাৎক্ষণিক কোন নাটিকাভিনয়ের উদ্যোগ, এমন প্রশ্নের অবতারণা, যা পাঠদানের বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহশীল করে তুলতে পারে, ইত্যাদি।

আয়োজন

পাঠ পরিকল্পনার পরবর্তী স্তর হ'ল পাঠ ঘোষণা। অর্থাৎ শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করেন তা তিনি পরিষ্কারভাবে শিক্ষার্থীদের জানিয়ে দেবেন। তবে এই জানিয়ে দেওয়ার কাজটি আকস্মিকভাবে সম্পাদিত হওয়া উচিত নয়। বরং বেশ প্রস্তুতি নিয়ে জানানোই প্রয়োজন। তাহলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে।

পাঠঘোষণা

এরপর উপস্থাপন। এই স্তরে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বয়স ও মানসিক সামর্থ তাদের অভিরুচি ইত্যাদি দিকগুলো বিবেচনা করে বিষয়বস্তু শ্রেণীকক্ষে উপস্থাপিত করবেন। এই স্তরে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন শিক্ষকের একক প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়ে না যায়। প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীদেরও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করবার সুযোগ যেন থাকে। শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখাও এই স্তরে শিক্ষকের একটি অবশ্য কর্তব্য। তিনি সমগ্র শ্রেণী জুড়ে নানাবিধ প্রশ্নের অবতারণা করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় রাখতে পারেন। কিংবা শিক্ষার্থীদের দিক থেকেও তিনি প্রশ্ন আহ্বান করতে পারেন। তিনি লক্ষ্য রাখবেন শ্রেণীর সবাই যেন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণে তৎপর ও উৎসাহী থাকে।

উপস্থাপন

উপস্থাপনের পর আলোচ্য বিষয়ের একটি **সংক্ষিপ্তসার রচনা করতে হবে।**

উপস্থাপন স্তরে আলোচনার সুবিধার জন্য হয়তো আলোচ্য বিষয়কে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করে নেওয়ার প্রয়োজন হতে পারে। এখন এই খণ্ডাংশগুলোকে একটি সমগ্ররূপ দেওয়ার জন্যই গোটা পাঠের সংক্ষিপ্তসার রচনার প্রয়োজন আছে।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষিপ্তসার রচনা শেষ হবার পর অভিযোজনের স্তর। এই স্তরে সমগ্র পাঠের পুনরালোচনা করা হবে। পুনরালোচনার মধ্য দিয়েই উপস্থাপিত বিষয় আরো বেশী স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। উপস্থাপনের সময় কোন ক্ষেত্রে কোন অস্বচ্ছতা থাকলে এই সময় তা পরিষ্কার করে নেবার সুযোগ পাওয়া যায়। ফলে শিক্ষার্থীর নতুন জ্ঞান অর্জনের কাজ সুসম্পন্ন হয়।

অভিযোজন

পাঠ পরিকল্পনার সর্বশেষ স্তর হ'ল গৃহকাজ। গৃহকাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর নব লব্ধ জ্ঞানের সংহতি সাধন সম্ভব হয়। মানচিত্র আঁকতে নির্দেশ দেওয়া, কোন প্রশ্নের উত্তর লিখতে বলা, কোন বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর নিজের মতামত লিখে আনতে বলা প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের কর্ম পন্থা অনুসৃত হতে পারে।

গৃহকাজ

॥ পাঠ পরিকল্পনায় সার্থকতার মূল্যায়ন ॥

পাঠ পরিকল্পনার আসল উদ্দেশ্য সুষ্ঠুভাবে পাঠদান কার্য পরিচালনা করা। এই কাজে শিক্ষক কতটা সফল হলেন, প্রয়োজন হয় তার মূল্যায়নেরও। মূল্যায়নের কাজটি শিক্ষক নিজেও সম্পন্ন করতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে নীচে একটি প্রশ্নমালা দেওয়া হ'ল। এই প্রশ্নমালার উত্তরগুলো বিশ্লেষণ করে শিক্ষক নিজেই উপলব্ধি করবেন, কতটা তিনি সফল হলেন।

॥ প্রশ্নমালা ॥

প্রশ্নাবলী	উত্তর	মন্তব্য
(১) নতুন জ্ঞানার্জনে শিক্ষক কি শিক্ষার্থীদের যথাযথ আগ্রহশীল করে তুলতে পেরেছেন ?		
(২) সমগ্র বিষয় পাঠদান কালে তিনি কি শিক্ষার্থীদের এই আগ্রহকে ধরে রাখতে পেরেছেন ?		
(৩) শিক্ষক কি সুনির্দিষ্ট ভাবে এবং সবার জন্যে যথাযথ প্রশ্ন করেছেন ?		
(৪) শিক্ষার্থীগণও কি কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন ?		

প্রশ্নাবলী	উত্তর	মন্তব্য
(৫) বিষয়-বস্তু সম্পর্কে শিক্ষক নিজে কি যথেষ্ট প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলেন ?		
(৬) শিক্ষক কি যথাযথ শিক্ষার উপকরণ সার্থকভাবে ব্যবহার করেছেন ?		
(৭) তুলনামূলক ভাবে অন্তর্মুখী ছাত্রদেরও কি তিনি উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছেন ?		
(৮) তুলনামূলকভাবে অধিক অগ্রসর ছাত্রদের কৌতূহল কি শিক্ষক নিবৃত্ত করতে পেরেছেন ?		
(৯) কোন বিষয় শিক্ষকের অজানা হলে তিনি কি তা অকপটে স্বীকার করেছেন ?		
(১০) যথোচিত গৃহকাজের নির্দেশ কি তিনি শিক্ষার্থীদের দিয়েছেন ?		

এইবার আমরা বিভিন্ন পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে কয়েকটি পাঠ পরিকল্পনা নমুনা হিসেবে প্রণয়ন করছি ॥

পাঠ-পরিকল্পনা (১)

বিদ্যালয়ের নাম—	বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা
শ্রেণী—অষ্টম	বিশেষ বিষয়—ভারতে ব্রিটিশ শক্তির বিস্তার
ছাত্রসংখ্যা—	অদ্যকার পাঠ— শিখ জাতির নেতা রণজিৎ সিংহ
গড় বয়স—	
তারিখ—	
সময়—	
শিক্ষকের নাম—	

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষঃ শিখজাতির নেতা রণজিৎ সিংহের জীবন-কাহিনীর সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত হতে সাহায্য করা।

পরোক্ষঃ ইতিহাস পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচার বোধ, যুক্তি বোধ ও কল্পনাশক্তিকে জাগ্রত করে তাদের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা ॥

উপকরণ—রণজিৎ সিংহের প্রতিকৃতি, তদানীন্তন কালের ভারতবর্ষের মানচিত্র, সময় রেখা ও শ্রেণী পরিচালনার সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—শিক্ষার্থীদের মন অদ্যকার পাঠাভিমুখী করার উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর অবতারণা করবেন :—

(এক) কবে আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি ?

(দুই) স্বাধীন হওয়ার আগে আমরা কাদের অধীন ছিলাম ?

(তিন) কোন্ যুদ্ধে জয়লাভের ফলে ভারতে ইংরেজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার সূচনা হ'ল ?

পাঠ ঘোষণা—কিন্তু তখনও ভারতে ইংরেজ শক্তি সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। সেই সময়ই ভারতের এক বীর সন্তান ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, "সব্ লাল হো জায়গা।" অর্থাৎ গোটা ভারতবর্ষ ইংরেজদের অধীন হয়ে যাবে। (এই স্থলে রণজিৎ সিংহের চিত্রটি প্রদর্শিত হবে।) সেই বীর সন্তানই হ'ল রণজিৎ সিংহ। আমরা তাঁর জীবন কথাই আজ আলোচনা করবো। —এই ভূমিকা দিয়ে শিক্ষক অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করবেন।

উপস্থাপন—

বিষয়	পদ্ধতি
	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠদান কার্য অগ্রসর হবে। প্রয়োজনানুসারে উপকরণ ব্যবহৃত হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে বিভক্ত হবে। 'ক' শীর্ষ—ভূমিকা ও প্রথম জীবন 'খ' শীর্ষ—সাম্রাজ্য বিস্তার 'গ' শীর্ষ—ইংরাজদের সঙ্গে বিরোধ 'ঘ' শীর্ষ—কৃতিত্ব বিচার
॥ "ক" শীর্ষ ॥ মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের অনুসৃত নীতির ফলে ভারতে দুই যোদ্ধা জাতির উত্থান ঘটে। এক মারাঠা অন্য শিখ জাতি। উভয় জাতির উত্থানে ভৌগোলিক অবস্থিতির অবদান অপরিসীম। যাই হোক, ঔরঙ্গজেবের পরবর্তীকালে যোগ্য নেতার অভাবে শিখজাতির ঐক্য নষ্ট হয়ে যায়। তারা কতকগুলো ছোট ছোট গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। এই গোষ্ঠীগুলিকে বলা হত মিস্‌ল।	এই স্থলে অনুবন্ধ প্রণালীর সাহায্যে শিখজাতির উপর ভৌগোলিক প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে। (এক) ঔরঙ্গজেবের পর শিখজাতির ঐক্য নষ্ট হয়েছিল কেন ? (দুই) মিস্‌ল কাকে বলে ? (তিন) কত সালে রণজিৎ সিংহের জন্ম হয় ? (চার) কোথায় তাঁর জন্ম হয়েছিল ?

বিষয়	পদ্ধতি
এমনি এক মিস্‌ল-এর নাম স্বকুর চাকিয়া। এখানে ১৭৮০ সালে জন্ম হয় রণজিৎ সিংহের। দশ বৎসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন আর সতেরো বৎসর বয়সে তিনি এই মিস্‌ল-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন।	(পাঁচ) কত বৎসর বয়সে তিনি তাঁর মিস্‌ল-এর দায়িত্ব নেন ?
॥ খ শীর্ষ ॥	
রণজিৎ সিংহের লক্ষ্য ছিল, শিখ জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা এবং এক বিশাল শিখ রাজ্য গঠন করা।	(এক) রণজিতের লক্ষ্য কি ছিল ?
১৭৯৮ সালে কাবুলের জামান শাহ পাঞ্জাব আক্রমণ করলে রণজিৎ তাঁকে বাধা দেন। জামান তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন ও তাঁকে রাজা উপাধি দেন।	(দুই) কে পাঞ্জাব আক্রমণ করেন ? (তিন) এই আক্রমণের ফল কি হয়েছিল ?
এরপর রণজিৎ লাহোর ও অমৃতসর দখল করেন। ধীরে ধীরে তিনি শতদ্রু নদীর পশ্চিম দিকের সব মিস্‌ল জয় করেন। ফলে রণজিৎ এ অঞ্চলে বিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠেন।	(চার) কিভাবে রণজিৎ নিজেকে শক্তিশালী করে তুললেন ?
॥ গ শীর্ষ ॥	
রণজিতের এই শক্তি বৃদ্ধিতে ইংরেজগণ বিশেষ আতংকিত হ'ল। কিন্তু তারা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চেয়েছিল। কারণ সেই সময় তুরস্ক ও পারস্যের সাহায্যে ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিম ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল।	(এক) ইংরাজেরা তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে চাইলো কেন ?
যাই হোক এ সময় রণজিৎ লুধিয়ানা জয় করলে শতদ্রুর পূর্বদিকের শিখ মিস্‌ল গুলো ইংরেজ সাহায্য চাইলো। ইংরেজরা তখন রণজিতের সঙ্গে মৈত্রীর প্রস্তাব করলে তিনি সমগ্র শিখ জাতির উপর প্রভুত্ব দাবী করলেন।	(দুই) ইংরাজেরা মৈত্রীর প্রস্তাব করলে রণজিৎ কি দাবী করলেন ?

বিষয়	পদ্ধতি
এ অবস্থায় ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠ্‌লো। কিন্তু তিনি যুদ্ধ না করে ১৮০৯ সালে ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি স্থাপন করলেন। স্থির হ'ল তিনি শতদ্রুর পূর্বদিকে অগ্রসর হবেন না।	(তিন) কত সালে অমৃতসরের সন্ধি হয় ?
এরপর তিনি ক্রমে ক্রমে মুলতান, কাশ্মীর ও পেশোয়ার জয় করে এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।	(চার) এই সন্ধিতে কি স্থির হ'ল ?
॥ ঘ শীর্ষ ॥	
সামান্য অবস্থা থেকে নিজ বাহুবলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পাশ্চাত্য পদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি এক শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন।	(এক) তিনি কেমন করে সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী করেছিলেন ?
তাঁর অপর কৃতিত্ব হ'ল তিনি শিখজাতিকে ঐক্যবদ্ধ করে শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। অপর কোন শিখ নেতা একাজে এতটা সাফল্য লাভ করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে কোন পাঞ্জাবী জাতির জন্ম হয় নি—আজকের ঐতিহাসিকেরা এই মতই প্রকাশ করেছেন। এই মহান বীর নেতার মৃত্যু হয় ১৮৩৯ সালে।	(দুই) তাঁর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কি ? (তিন) আজকের ঐতিহাসিকেরা কি মত প্রকাশ করেছেন ? (চার) কত সালে তাঁর মৃত্যু হয় ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় আজকের পাঠের সারাংশ শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় তুলে নেবার নির্দেশ দেবেন।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে :—

(এক) ঔরঙ্গজেব অনুসৃত নীতির ফল কি হ'ল ?

(দুই) রণজিত যখন জন্মান তখন শিখ জাতির অবস্থা কেমন ছিল ?

(তিন) কে তাঁকে রাজা উপাধি দিয়েছিলেন ?

(চার) রণজিতের জীবনে ১৮০৯ সালটি গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

(পাঁচ) তাঁর সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব কি ?

গৃহকাজ—ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র অংকন করে তাতে রণজিতের সাম্রাজ্যের সীমানা চিহ্নিত করে আনবার জন্য শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেবেন।

পাঠ পরিকল্পনা (২)

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ :—ভারতের শিল্প ও স্থাপত্য বিষয়ে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত জ্ঞান লাভে সহায়তা করা।

পরোক্ষ :—ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে তাদের স্বদেশ-সচেতন করে তোলা।

উপকরণ—পেরিক্লিসের ছবি ও গ্রীসের মানচিত্র, এলিজাবেথের ছবি ও ইংলণ্ডের মানচিত্র, প্রাক্ গান্ধার ও গান্ধার শিল্পের নিদর্শনমূলক চিত্র, অজন্তা ও ইলোরার ছবি, ফতেপুর সিক্রি, বুলন্দ দরওয়াজা ও আকবরের ছবি, ফ্লানেল বোর্ড ও অন্যান্য উপকরণ।

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাবরণ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীদের অন্তকার পাঠে আকৃষ্ট করার জন্য নিম্নরূপ কার্যক্রম অনুসৃত হবে :

(১) প্রশ্নাবলী :

(ক) প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার মণ্ডপে মণ্ডপে বেড়াতে গিয়ে কোন কোন প্রতীমার সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। এমনটা কেন হয়।

(খ) শিল্প কলা প্রধানতঃ কয় রকমের ?

(গ) স্থাপত্য শিল্প কাকে বলে ?

(২) শিক্ষকের সংগৃহীত ছবিগুলিকে শিক্ষার্থীদের নিজেদের ইচ্ছেমত বিভিন্ন ভাগে ভাগ করতে বলা হবে।

(২) নিম্নোক্ত পংক্তিদ্বয় শিক্ষক আবৃত্তি করবেন :

"স্থপতি মোদের স্থাপনা করেছে বরবুদরের ভিত্তি,
শ্যাম-কম্বোজ ওংকারধাম মোদেরই প্রাচীন কীর্তি।"

পাঠঘোষণা—আজ আমরা ভারতীয় স্থাপত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগ সম্বন্ধে আলোচনা করবো।

উপস্থাপন—আলোচনার সুবিধার্থে অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে ভাগ করা হবে :

'ক' শীর্ষ—ভূমিকা

'খ' শীর্ষ—প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকলার রূপরেখা

'গ' শীর্ষ—মোগল শিল্পের বৈশিষ্ট।

বিষয়-বিন্যাস	অভিজ্ঞতা-অভীক্ষা	অনুসন্ধানী উপকরণ ও পদ্ধতি
॥ ক শীর্ষ ॥ জীবন সংগ্রাম যখন কঠোর নয়, দেশে সাংস্কৃতিক বিকাশের প্রশস্ত সময় তখনই। তাই প্রাচীন ভারতে শিল্প ও সংস্কৃতির অবিশ্রান্ত বিকাশ।	**প্রশ্ন ঃ** কোন দেশে শিল্প-কলার বিকাশ সম্ভব হয় কখন ?	**তুলনীয় বিষয় ঃ** ক) পেরিক্লিসের গ্রীস (খ) এলিজাবেথের ইংল্যাণ্ড।
॥ খ শীর্ষ ॥ শিল্পকলার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষে গ্রীক প্রভাব—গান্ধার শিল্প ও তার প্রভাব।	**সক্রিয় কর্মোদ্যোগ ঃ** এই ছবিগুলি থেকে কোথায় কোথায় নিরূপণে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।	প্রাক্‌-গান্ধার শিল্প এবং গান্ধার শিল্পের চিত্র প্রদর্শন।
গুপ্তযুগে ব্যবসা-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার—জনজীবনে শৃংখলা—অজন্তা ইলোরার সৃষ্টি।	**প্রশ্ন ঃ** * অজন্তা ইলোরা নির্মিত হয়েছিল কখন ?	অজন্তা ও ইলোরার শিল্প-কীর্তির চিত্র প্রদর্শন
প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য শিল্প ছিল মূলতঃ ধর্মভিত্তিক।	*প্রাচীন ভারতে স্থাপত্য শিল্পের মূল ভিত্তি কি ?	
॥ গ শীর্ষ ॥ ভারতীয় শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে মোগল যুগে। আকবরের অবদান—পারসিক ও তুর্কী রীতির আমদানি—সঙ্গে হিন্দুরীতির সংমিশ্রণ।		আকবরের প্রতিকৃতি ও ফতেপুরসিক্রির স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন প্রদর্শন

বিষয়-বিন্যাস	অভিজ্ঞতা-অভীক্ষা	অনুসন্ধানী উপকরণ ও পদ্ধতি
নতুন শিল্পকলার নজীর—বুলন্দ দরওয়াজা দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ানই-খাস পাঁচ মহল, জামি মসজিদ্ প্রভৃতি। মোগল স্থাপত্যকলার বৈশিষ্ট লাল পাথরের ব্যবহার-সূক্ষ্ম জ্যামিতিক পরিমাপ—পাখি ও পদ্মফুলের যথেচ্ছ ব্যবহার —বিশাল আকার—ধর্মের পরিবর্তে প্রাত্যহিক জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের প্রাধান্য।	প্রশ্ন ঃ * ফতেপুরসিক্রি সম্পর্কে ঐতিহাসিক কি বলেছেন ? * মোগল শিল্পে কোন্ কোন্ শিল্পরীতির সংমিশ্রণ ঘটেছে ? * মোগল শিল্পকলার বৈশিষ্ট কি কি ?	তুলনীয় বিষয় ঃ ঐতিহাসিক ফার্গুসনের মন্তব্য। চিত্রের সাহায্যে বৈশিষ্ট্য-গুলো নির্দেশ করা হবে।

বোর্ডের কাজ – শিক্ষক শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লিখবেন ও তাদের তা নিজেদের খাতায় তুলে নিতে নির্দেশ দেবেন।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে ঃ

(১) গান্ধার শিল্প কাকে বলে ?
(২) এই শিল্পের বৈশিষ্ট্য কি কি ?
(৩) মোগল শিল্প বলতে কি বোঝ ?
(৪) শিল্প সংস্কৃতির বিকাশ কখন্ সম্ভব ?

গৃহকাজ—পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্যের অন্যতম তাজমহল। এই তাজমহলের মোগল শিল্পের বৈশিষ্ট কতটা পরিস্ফূট এবং তাজমহল কাব্য কবিতায় কিভাবে বর্ণিত, এ সম্পর্কে একটি সংগ্রহমূলক নিবন্ধ রচনা করতে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা হবে।

পাঠ পরিকল্পনা (৩)

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ ঃ—ঐতিহাসিক প্রমাণাদির মাধ্যমে মোগলযুগে ভারতবর্ষের সমাজ জীবন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

পরোক্ষ ঃ—ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিচার শক্তি, কল্পনাশক্তি ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে তাদের সত্যানুসন্ধানী করে তোলা।

উপকরণ—সাধারণ উপকরণ ও

(ক) মোগল সম্রাটদের নাম-তালিকা সম্বলিত একটি চার্ট।

(খ) বিভিন্ন য়ুরোপীয় পর্য্যটকদের আগমন নির্দেশিত একটি সময় রেখা।

(গ) মোগল ভারতের মানচিত্র।

(ঘ) বিভিন্ন পর্য্যটক ও সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন উক্তির সংকলন।

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি এবং শিক্ষার্থীদের আজকের পাঠে আকৃষ্ট করতে নিম্নরূপ প্রশ্ন করা হবে :

(১) তাজমহল কে নির্মাণ করেন ?

(২) মোগল সম্রাটদের তৈরী আর দু/একটি স্থাপত্যকীর্তির নাম বল।

(৩) তোমার মতে একজন সম্রাটের কি কি দায়িত্ব থাকা উচিত ?

এরপর শিক্ষার্থীদের রবীন্দ্রনাথের "ভারতবর্ষের ইতিহাস" থেকে নিম্নলিখিত অংশটুকু পাঠ করে শোনানো হবে :

"ভারতবর্ষের যে ইতিহাস আমরা পড়ি এবং মুখস্থ করিয়া পরীক্ষা দেই তাহা ভারতবর্ষের নিশীথকালের একটা দুঃস্বপ্ন কাহিনী মাত্র। কোথা হইতে কাহারা আসিল, কাটাকাটি মারামারি পড়িয়া গেল, বাপে ছেলের, ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন লইয়া টানাটানি চলিতে লাগিল। একদল যদি-বা যায় কোথা হইতে আর একদল উঠিয়া পড়ে—যেন ভারতবাসী নাই, কেবল যাহারা কাটাকাটি, খুনোখুনি করিয়াছে তাহারাই আছে।......এই কাটাকাটি খুনোখুনিই যে ভারতবর্ষের প্রধানতম ব্যাপার তাহা নহে। সেদিনও সেই ধূলি সমাচ্ছন্ন আকাশের মধ্যে পল্লীর গৃহে গৃহে যে জন্ম-মৃত্যু ও সুখ দুঃখের প্রবাহ চলিতে থাকে, তাহা ঢাকা পড়িলেও মানুষের পক্ষে তাহাই প্রধান।"

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা এই মানুষেরই কাহিনী—মোগল আমলে ভারতের সমাজজীবনের কথা আলোচনা করবো।

উপস্থাপন—আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে ভাগ করে নেওয়া হবে।

'ক' শীর্ষ—ভূমিকা

'খ' শীর্ষ—সম্রাটের জীবনযাত্রা

'গ' শীর্ষ—অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবনযাত্রা

'ঘ' শীর্ষ—সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা

'ঙ' শীর্ষ—সমালোচনা

সামগ্রিক বিষয় নিরীক্ষণ	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ	অনুসন্ধান মূলক কার্য
॥ ক শীর্ষ ॥ মোগল যুগের গৌরবময় সময়—আকবর থেকে ঔরঙ্গজীব—য়ুরোপ থেকে রো, হকিন্স, তাভার্নিয়ে, বার্ণিয়ে, পেলসার্ট, টেরী প্রভৃতি ভ্রমণকারীদের আগমন—ভারতের সমাজ সম্পর্কে তাঁদের মতামত—সামাজিক কাঠামো।	* চার্ট থেকে কয়েকজন মোগল সম্রাটের নাম বল। * এদের মধ্যে বিখ্যাত কারা ? * সময় রেখা দেখে বল কে সবচেয়ে বেশীদিন দেশ শাসন করেছিলেন ? * কোন্ কোন্ বিদেশী পর্যটক এ সময় এ দেশে এসেছিলেন ? * তাঁরা কোন্ বিষয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন ?	চার্ট, মানচিত্র ও সময় রেখার ব্যবহার। তুলনা : হিন্দু রাজাদের আমলে মেগাস্থিনিস, ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং-এর আগমন।
॥ খ শীর্ষ ॥ জাহাঙ্গীরের সময় রো ও হকিন্সের আগমন—সম্রাটের সর্বোচ্চ মর্য্যাদা—তাঁর নির্দেশেই দেশ শাসন। আকবরের সভাকবি আবুল ফজল—সম্রাটের বিলাসী জীবন—সাধারণ সম্পর্কে উদাসীন। শাহজাহানের সময় তাভার্ণিয়ে সম্রাটের জাঁকজমকপ্রিয়তা।	* রোর লেখা থেকে সম্রাটের মর্য্যাদা সম্পর্কে কি ধারণা হয় ? * সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চে কে ছিলেন ? * সাধারণ লোক সম্পর্কে সম্রাটের মনোভাব রোর মতে কেমন ছিল ? * এ বিষয়ে আবুল ফজল, হকিন্স, তাভার্ণিয়ে কি বলেন ?	রো, হকিন্স ও তাভার্ণিয়ের বক্তব্য পাঠ। প্রয়োজনমত সময়-রেখা ব্যবহার। তুলনা : রাজপদের দৈবস্বত্ব মতবাদ আইন-ই-আকবরী থেকে অংশবিশেষ পাঠ।
॥ গ শীর্ষ ॥ পেলসার্ট, বার্ণিয়ে ও রোর লেখা থেকে অভিজাতদের অবস্থা—মর্য্যাদায় সম্রাটের পর—বিলাস বহুল	* চার্ট দেখে বল, সম্রাটের পর কাদের স্থান। * অভিজাতদের সম্পর্কে পেলসার্ট কি বলেন ?	চার্টের ব্যবহার। পেলসার্ট, রো ও বার্ণিয়ের বক্তব্য পাঠ।

সামগ্রিক বিষয় নিরীক্ষণ	অভিজ্ঞতাভিত্তিক পাঠ	অনুসন্ধানমূলক কার্য
জীবন—সকল সামাজিক সুযোগ ভোগ—অথচ সাধারণ মানুষের প্রতি অত্যাচারী।	* এ বিষয়ে রো এবং বার্ণিয়ে কি বলেছেন?	
॥ ঘ শীর্ষ ॥ সাধারণ লোক সম্পর্কে বার্ণিয়ে ও পেলসার্টের তথ্য—শ্রমিক, দোকানদার, কৃষক, চাকর এরাই সাধারণ শ্রেণী-ভুক্ত—এদের দুঃখ-দুর্দশার বিবরণ।	* চার্ট দেখে বল সমাজে সবচেয়ে নীচে কারা। * পিলসার্টের মতে সাধারণ মানুষ বলতে কাদের বোঝায়? * বার্ণিয়ে কাদের কথা বলেছেন? * শ্রমিকদের খাদ্য ও পোষাক কেমন ছিল? * এদের বাসস্থান কেমন ছিল? * বার্ণিয়ে কৃষকদের সম্পর্কে কি বলেছেন?	চার্টের ব্যবহার। পেলসার্ট ও বার্ণিয়ের বক্তব্য পাঠ। তুলনা: ইংলণ্ডের গৌরবময় বিপ্লব—১৬৮৮
॥ ঙ শীর্ষ ॥ দেশে খাদ্যাভাব ছিল না—তবু দুর্ভিক্ষ—বদাউনী এবং আব্দুল হামিদের বর্ণনা—সম্রাটের উদাসীনতা—অভিজাতদের অত্যাচার—দুর্ভিক্ষের দায়িত্ব।	* সময় রেখা দেখে বল, টেরী কখন ভারতে আসেন? * টেরী কি বলেছেন? * বদাউনী ও হামিদ কি বর্ণনা করেছেন? * দুর্ভিক্ষে সাধারণ লোকের অবস্থা কেমন হ'ত? * দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী কাকে মনে হয়?	সময় রেখা ব্যবহার। টেরি, বদাউনী ও হামিদের বক্তব্য পাঠ।

বোর্ডের কাজ—উপস্থাপন স্তরেই শিক্ষক প্রতিটি শীর্ষ সম্পর্কে পৃথক পৃথক ভাবে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থীদের সেগুলো নিজেদের খাতায় তুলে নিতে বলবেন।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিয়ে একটি বিতর্ক সভার আয়োজন করা হবে। বিতর্কের বিষয়ঃ "মোগল আমলে সাধারণ মানুষ এখনকার চেয়ে সুখী ছিল।"

বিতর্কে দুইজন করে শিক্ষার্থীকে পক্ষে ও বিপক্ষে অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হবে। তবে সমগ্র শ্রেণীকে পক্ষ ও বিপক্ষ এই দুই ভাগে ভাগ করে দেওয়া হবে এবং প্রতিপক্ষ নিজেদের বক্তাদের যৌথভাবে প্রস্তুত করে দেবার দায়িত্ব নেবে।

গৃহকাজ—বিভিন্ন পর্য্যটকদের মধ্যে কে তোমাকে বেশী মুগ্ধ করেছে এবং কেন?—এই প্রশ্নটির সমাধান শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে তৈরী করে আনতে বলা হবে।

পাঠ পরিকল্পনা (৪)

শ্রেণী—ষষ্ঠ	বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা। অদ্যকার পাঠ—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন।

উদ্দেশ্য—**প্রত্যক্ষ**ঃ—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

পরোক্ষঃ—সবদেশের ইতিহাস জানার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের স্বদেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং নিজস্ব উত্তরাধিকার সম্পর্কে তাদের সচেতন করা।

উপকরণ—অবিভক্ত বঙ্গদেশের মানচিত্র,

প্রতিকৃতি—কার্জন, সুরেন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বিপিনপাল, প্রফুল্লরায়, বালগঙ্গাধর তিলক, অরবিন্দ ঘোষ।

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্যে তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে:—

এক। বর্তমান কালে কাকে বঙ্গবন্ধু বলে ডাকা হয়?

দুই। তিনি কোন্ দেশের রাষ্ট্রপতি?

তিন। বাংলাদেশ এর আগে কি নামে পরিচিত ছিল?

চার। পূর্ব পাকিস্তান নামক দেশটির সৃষ্টি হয় কখন?

পাঠঘোষণা—ইংরেজরা এদেশ ছেড়ে যাবার আগে বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দিয়ে গেল। তারা এদেশকে ভেঙ্গে দেবার চক্রান্ত আরেকবার করেছিল। সেবার আমরা সবাই মিলে যুক্তভাবে তুমুল বাধা দিয়েছিলাম। তাই তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়। আজ আমরা এই চক্রান্তের কাহিনী আলোচনা করবো।

উপস্থাপন—আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ আমরা নিম্নোক্ত শীর্ষে ভাগ করে নেবো।

'ক' শীর্ষ—বঙ্গ-ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ও কারণ
'খ' শীর্ষ—সিদ্ধান্ত বিরোধী আন্দোলন
'গ' শীর্ষ—ফলাফল

আলোচনাকে হৃদয়গ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য উপযুক্ত স্থানে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করা হবে।

বিষয়-বিন্যাস	সক্রিয় কর্মোদ্যোগ	অভিজ্ঞতা অভীক্ষা
॥ ক শীর্ষ ॥ ছোটবেলা থেকেই যাঁর স্বপ্ন ছিল ভারতের ভাইস্‌রয় হবেন সেই লর্ড কার্জন সত্যিই ভাইস্‌রয় হয়ে ভারতে এলেন ১৮৯৯ সালে। কিন্তু এদেশে তিনি তাঁর কার্য্যাবলীর দ্বারা বহু সমালোচিত ও নিন্দিত। এমনই একটি কাজ হ'ল বঙ্গদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা।	লর্ড কার্জনের চিত্র প্রদর্শন।	প্রশ্নাবলী ঃ (১) কে স্বপ্ন দেখতেন ভারতের ভাইস্‌রয় হবেন বলে ? (২) তিনি ভারতে এত নিন্দিত হয়েছিলেন কেন ? (৩) তাঁর এ সব কাজের একটি উদাহরণ দাও। (৪) তিনি বঙ্গদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা করেছিলেন কেন ?
তখন বঙ্গদেশের আয়তন ছিল বিশাল। কলকাতায় বসে এত বড় প্রদেশের শাসন খুবই অসুবিধে হ'ত। তাই শাসন কার্যের সুবিধার জন্য ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন বঙ্গদেশ বিভক্ত করার আদেশ জারী করলেন।	সমসাময়িক মানচিত্রের সাহায্যে সে সময়কার বাংলার আয়তন নির্দেশ এবং কার্জন নির্দেশিত বঙ্গ-ভঙ্গের সীমানা প্রদর্শন।	
কেউ কেউ বলেন, তখন বাংলাদেশ ছিল হিন্দু-মুসলমান সমপ্রীতির নিদর্শন এবং ইংরেজ-বিরোধী মনোভাবের প্রাণকেন্দ্র। তাই প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশকে বিভক্ত করার।		

বিষয়-বিন্যাস	সক্রিয় কর্মোদ্যোগ	অভিজ্ঞতা অভীক্ষা
॥ খ শীর্ষ ॥ কার্জনের আদেশ জারী হ'বার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বঙ্গদেশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল। তীব্র ক্ষোভে রবীন্দ্রনাথ বললেন : "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে, জননী !"	রবীন্দ্রনাথের চিত্র প্রদর্শন।	(১) ১৯০৫, ৭ই আগষ্ট কোন্ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ? ( ) এই আন্দোলনকে কি আন্দোলন বলা হয় ? (৩) এই আন্দোলনে নেতৃত্ব দিলেন কারা ? (৪) ১৬ অক্টোবর কি করা হ'ল ?
১৯০৫ সালের ৭ই আগষ্ট এক বিরাট জনসভায় বিদেশী জিনিস বর্জনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হ'ল। একেই বলা হয়েছে স্বদেশী আন্দোলন। রজনীকান্ত সেনের কণ্ঠে ধ্বনিত হল : "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।" আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ। সঙ্গে থাকলেন বিপিন পাল। ১৬ই অক্টোবর, যেদিন বঙ্গদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা প্রয়োগ করার কথা সেদিন সমগ্র বঙ্গদেশে হরতাল পালন করা হ'ল। বাংলার ছেলেমেয়েরা সেদিন গান গাইতে গাইতে পরস্পরের হাতে রাখী বেঁধে দিলেন। এই গান রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন। গানটি হ'ল "বাংলার মাটী, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান।"	রজনীকান্ত, সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিন পালের চিত্র প্রদর্শন।	(৫) এ দিনের গানটি কে লিখেছিলেন ? (৬) গানটি কি ?

বিষয়-বিন্যাস	সক্রিয় কর্মোদ্যোগ	অভিজ্ঞতা অভীক্ষা
॥ গ শীর্ষ ॥		
সেদিন বাংলা দেশে যে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল, তার ফলে ইংরেজরা বাধ্য হ'ল বিভক্ত করার পরিকল্পনা বাতিল করতে।		(১) আন্দোলনের ফল কি হ'ল ?
কিন্তু এর থেকেও এই আন্দোলনের বড় প্রবাহ হ'ল বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ভারতবাসীর মনে নতুন ভাবে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা জাগৃত করলো।		
ধনী দরিদ্র হিন্দু মুসলমান সবাই যেভাবে মনেপ্রাণে এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল তাহা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।		(২) এই আন্দোলনের কোন্‌টি খুব গুরুত্বপূর্ণ দিক ?
আচার্য প্রফুল্লরায় জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার কথা বললেন। জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাও এ সময় গড়ে তোলা হ'ল।	আচার্য প্রফুল্লরায়ের চিত্র প্রদর্শন।	(৩) কে জাতীয় শিল্প গড়ে তোলার কথা বললেন ?
কংগ্রেসের উপরও এই আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল। এতকাল যে আবেদন নিবেদনের নীতি কংগ্রেস অনুসরণ করেছিল এবার তা বাতিল করার দাবী উঠ্‌ল। বাতিল করার দাবী তুললেন বাল গঙ্গাধর তিলক ও অরবিন্দ ঘোষ।	তিলক ও অরবিন্দের চিত্র প্রদর্শন।	(৪) কংগ্রেসের উপর কি প্রভাব পড়লো ?
তাই এই আন্দোলন ভারতের এক ঐতিহাসিক আন্দোলন।		(৫) নতুন মতের নেতা ছিলেন কারা ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠের সংক্ষিপ্তসার বোর্ডে লেখা হবে ও শিক্ষার্থীদের তা নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীগণ নবলব্ধ জ্ঞান কতটা আয়ত্ব করতে পেরেছে তা যাচাই করবার জন্য তাদের নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর সমাধান করতে বলা হবে :—

এক। বঙ্গদেশ বিভক্ত করতে কে চেয়েছিলেন এবং কেন চেয়েছিলেন ?

দুই। বঙ্গদেশ বিভক্ত করার পরিকল্পনা বাতিল করার উদ্দেশ্যে কবে সারা দেশে হরতাল পালন করা হয়েছিল ? সেদিন আর কি করা হয়েছিল ?

তিন। কংগ্রেস এতকাল কি নীতি অনুসরণ করতো ? বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে কি পরিবর্তনের দাবী উঠলো ?

চার। নীচের বাক্যগুলিতে ভুল থাকলে সংশোধন কর :—

(ক) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃত্ব দিলেন অরবিন্দ ঘোষ ও বালগঙ্গাধর তিলক।

(খ) এই আন্দোলন কালেই রজনীকান্ত সেন গান লিখলেন, বাংলার মাটী/বাংলার জল/পুণ্য হউক/পুণ্য হউক/হে ভগবান।

(গ) এই আন্দোলনের ফলেই কংগ্রেসে আবেদন-নিবেদনের নীতি গ্রহণের দাবী উঠলো।

গৃহকাজ—শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে নীচের নির্দেশমত তিনটি মানচিত্র এঁকে আনতে বলা হবে।

(ক) ১৯০৫ সালে বঙ্গদেশ

(খ) ১৯৪৭, ১৫ই আগষ্টের বঙ্গদেশ

(গ) ১৯৭১ এর পরের বঙ্গদেশ

পাঠ পরিকল্পনা (৫)

শ্রেণী—সপ্তম | বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা
অদ্যকার পাঠ—আকবরের অবদান

উদ্দেশ্য :– **প্রত্যক্ষ** : আকবরের অবদান সম্পর্কেশিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।
পরোক্ষ : ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্তিবোধ, কল্পনা শক্তি ও বিচার শক্তি জাগ্রত করে তাদের সত্যানুসন্ধানী করে তোলা।

উপকরণ :–

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষা এবং তাদের অদ্যকার পাঠের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর অবতারণা করা হবে :

(১) আমাদের স্বাধীন ভারত ধর্মের দিক থেকে নিরপেক্ষ নীতি গ্রহণ করেছে কেন ?

(২) প্রাচীন ভারতের এমন এক রাজার নাম বল যার নীতি আমরা এখনো অনুসরণ করি।

(৩) মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন কে ?

(৪) কাকে মোগল সাম্রাজ্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় ?

(৫) একজন সম্রাটকে শক্তিমান হতে হলে তার কি কি যোগ্যতা থাকা উচিত বলে তোমার মনে হয় ?

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা মোগল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিমান ও জনপ্রিয় সম্রাট আকবরের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবো।

উপস্থাপন—আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠদান কার্য অগ্রসর হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে বিভক্ত হবে :

(ক) আকবরের দেশ শাসন সংক্রান্ত নীতি।

(খ) আকবরের ধর্মীয় নীতি।

(গ) বিভিন্ন ক্ষেত্রে আকবরের অবদান।

(ঘ) তুলনামূলক আলোচনা।

বিষয়	পদ্ধতি
॥ ক শীর্ষ ॥ যে কোন দেশে যেখানে একজনের উপরই দেশ শাসনের সমগ্র দায়িত্বভার অর্পিত থাকে সেখানে তাঁর ভূমিকা অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। দেশ জয়েই নয়, দেশ শাসনেই শাসকের নৈপুণ্যের প্রকাশ ঘটে বেশী। আকবর ভারতব্যাপী এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর দেশ জয়ের উদ্দেশ্য ছিল বহুরাজ্যে বিচ্ছিন্ন ভারতকে এক শাসকের অধীনে এনে দেশব্যাপী সংহতি প্রতিষ্ঠা করা। আবার দেশ জয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেন নি। সাম্রাজ্যকে দৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন সুদক্ষ প্রশাসন। আর জনসমর্থনই হ'ল প্রশাসনের মূল ভিত্তি। এই সমর্থন অর্জনের জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও জানতেন, হিন্দু-প্রধান ভারতবর্ষে হিন্দুদের সমর্থন অর্জন ছিল খুবই জরুরী।	(১) শাসকের অধিক নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায় কোথায় ? (২) আকবরের দেশ জয়ের উদ্দেশ্য কি ছিল ? (৩) সাম্রাজ্য দৃঢ় করার জন্য কি প্রয়োজন ? (৪) প্রশাসনের মূল ভিত্তি কি ? (৫) তাই আকবর কি চেয়েছিলেন ?

বিষয়	পদ্ধতি
॥ খ শীর্ষ ॥ মধ্যযুগে মানুষের ধর্মবোধ ছিল এক বিরাট দুর্বল স্থান। আকবর কখনোই এই দুর্বল স্থানে আঘাত হানতে চান নি। কিন্তু বিচক্ষণ প্রশাসক হিসেবে তিনি বুঝেছিলেন ধর্মীয় ক্ষেত্রে এমন নীতি অনুসরণ প্রয়োজন যেন হিন্দু মুসলমান কেউই আহত বোধ না করে। তাই তাঁর নীতি হ'ল ধর্মীয় বিষয়ে নিরপেক্ষ থাকা। তিনিই প্রথম সর্ব ধর্ম সমন্বয়ের কথা বললেন। প্রবর্তন করলেন নতুন ধর্মমতের। তার নাম দীন-ইলাহি। কিন্তু তিনি এই ধর্মমতও কারো উপর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। নতুন ধর্মের লক্ষ্যই ছিল সম্রাটের পদটিকে অধিকতর শ্রদ্ধেয়, সম্মানীয় এবং শক্তিশালী করা।	(১) মধ্যযুগে মানুষের দুর্বলস্থান ছিল কোথায়? (২) ধর্ম বিষয়ে আকবর কোন্ নীতি অনুসরণ করেছিলেন? (৩) তিনি প্রথম কি বললেন? (৪) তাঁর নতুন ধর্মের নাম কি? (৫) নতুন ধর্মের লক্ষ্য কি ছিল?
॥ গ শীর্ষ ॥ আকবরের বিশাল ব্যক্তিত্বের প্রভাব ছিল অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। কেবল দেশ জয় আর দেশ শাসনেই নয়, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব অপরিসীম। আকবরই ভারতে এক নতুন রীতির শিল্পকলার প্রবর্তন করেন। এই রীতিই মোগল শিল্প নামে পরিচিত। এই রীতি বলতে বোঝায় ভারতীয় রীতির সঙ্গে আরব ও পারস্য দেশীয় রীতির সংমিশ্রণ। ভারতীয় সংগীতের সর্বকালের কুলশিরোমণি তানসেন ছিলেন তাঁরই সভাসদ। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর কৌতূহল ছিল সীমাহীন। এ সবের চর্চাও হ'ত নিরবচ্ছিন্ন গতিতে। শিক্ষা-ব্যবস্থাতেও তাঁর দৃষ্টিভংগী ছিল বেশ আধুনিক।	(১) দেশ জয় এবং শাসন ছাড়া আর কোথায় আকবরের প্রভাব দেখা যায়? (২) মোগল শিল্প বলতে কি বোঝায়? (৩) তানসেন কে ছিলেন? (৪) শিক্ষা সম্পর্কে আকবরের দৃষ্টি ভংগী কেমন ছিল?
॥ ঘ শীর্ষ ॥ জওহরলাল আকবরকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলে অভিহিত করেছেন। তিনি প্রথম ভারতবর্ষকে একই সূত্রে বাঁধতে চেয়েছিলেন। আকবরের মত বিরাট প্রতিভা ভারতের ইতিহাসে খুবই দুর্লভ। অশোক নিশ্চয়ই মহান। কিন্তু তাঁর মহত্ত্ব আকবরের মত সর্বগ্রাসী ছিল না। তাঁর সমসাময়িক ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথ যেমন নিজগুণে ইংলণ্ডকে মহিমান্বিত করেছিলেন তেমনি কৃতিত্ব দেখিয়েছেন আকবর।	(১) জওহরলাল আকবরকে কি বলে অভিহিত করেছেন? (২) আকবর কি চেয়েছিলেন? (৩) আশোকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য কোথায়? (৪) তাঁর সঙ্গে মিল দেখা যায় কার?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজেদের খাতায় তুলে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিম্নের প্রশ্নটির সমাধান করতে বলা হবে :—

সম্রাট হিসেবে আকবর যা চেয়েছিলেন তা রূপায়ণে তাঁর ধর্মমত কতটা সাহায্যকারী হয়েছিল ?

গৃহকাজ—অদ্যকার পাঠের অনুসরণে সম্রাটের সাফল্য অর্জনের জন্য কি কি যোগ্যতা অর্জন করা উচিত তা বাড়ী থেকে লিখে নিয়ে আসবার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হবে।

পাঠ পরিকল্পনা (৬)

শ্রেণী অষ্টম	বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা অদ্যকার পাঠ—ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ ঃ ভারতে ইঙ্গ ফরাসীদ্বন্দ্ব সম্পর্কে জ্ঞানার্জনে শিক্ষার্থীদের সাহায্য করা।

পরোক্ষ ঃ ইতিহাস পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের কল্পনা শক্তি, বিচার শক্তি ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে তাদের সত্যানুসন্ধানী করে তোলা।

উপকরণ—সমসাময়িককালের ভারতের মানচিত্র, সময় রেখা, ডুপ্লে ও ক্লাইভের প্রতিকৃতি ও শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এবং শিক্ষার্থীদের অর্জিত বিষয়গত জ্ঞান যাচাই-এর প্রয়োজনে নিম্নরূপ প্রশ্নাবলীর অবতারণা করা হবে।

এক। কোন্ মোগল সম্রাটের শাসনকালে এক ইংরেজ বাণিজ্য করার উদ্দেশ্যে কুঠী নির্মাণের আবেদন করেছিল ?

দুই। সেই ইংরেজের নাম কি ?

তিন। বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে কখন ?

পাঠ ঘোষণা—আজ আমরা ভারতে ইংরেজ ও ফরাসীজাতির পারস্পরিক দ্বন্দ্বের কারণ ও ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করবো। "—এই বলে অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করা হবে।

উপস্থাপণ—

বিষয়	পদ্ধতি
	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠদান করা হবে। প্রয়োজন মত উপকরণ ব্যবহৃত হবে। আলোচনাকে যুক্তি বিন্যাসী করতে অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে বিভক্ত হবে। 'ক' শীর্ষ—ভূমিকা 'খ' শীর্ষ—প্রথম-কর্ণাটকের যুদ্ধ 'গ' শীর্ষ—দ্বিতীয়-কর্ণাটকের যুদ্ধ 'ঘ' শীর্ষ—তৃতীয়-কর্ণাটকের যুদ্ধ
॥ ক শীর্ষ ॥ বণিকের ছদ্মবেশে একদা দলে দলে বিভিন্ন ইউরোপীয়: জাতি ভারতে এসেছিল। তারপর চিরকালীন সাম্রাজ্যবাদের অতি পরিচিত প্রক্রিয়ায় দেশের রাজনৈতিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও দুর্বলতার সুযোগে তারা ভারতবর্ষেও রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। এই উদ্যোগেরই এক পরিণতি হ'ল ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব।	॥ প্রশ্নাবলী ॥ *সাম্রাজ্যবাদের অতি পরিচিত প্রক্রিয়াটি কি?
॥ খ শীর্ষ ॥ বঙ্গোপসাগরের করমণ্ডল উপকূল ও তার সংলগ্ন ভূ-ভাগকে বলা হয় কর্ণাটক। এই কর্ণাটক অঞ্চল নিয়েই দীর্ঘকাল ইঙ্গ ফরাসী দ্বন্দ্ব চলেছিল।	* কোন্ অঞ্চলকে কর্ণাটক বলা হয়?
অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে অষ্ট্রীয়ার সিংহাসনের উত্তরাধিকার নিয়ে যেমন ইংরেজ ও ফরাসীদের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হয় তেমনি ঘটনাকে কেন্দ্র করে তাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয় ভারতবর্ষে।	* ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসীদ্বন্দ্বের কারণ কি?

বিষয়	পদ্ধতি
তখন দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজ ছিল ইংরেজদের ঘাঁটি আর পণ্ডিচেরি ফরাসীদের। ইউরোপের যুদ্ধের সূত্র ধরে মরিশাস্ দ্বীপের ফরাসী শাসক লা বুর্দোনে ভারত সমুদ্রে হানা দিয়ে ইংরেজদের পরাজিত করেন এবং মাদ্রাজ দখল করেন। বুর্দোনে চেয়েছিলেন, প্রচুর ক্ষতিপূরণ নিয়ে মাদ্রাজ ইংরেজদের ফিরিয়ে দিতে। কিন্তু ভারতের ফরাসী শাসক ডুপ্লে এতে মত দিলেন না। ঠিক সময়ই আই লা-স্যাপেলের সন্ধি দ্বারা ইউরোপে ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল। ফলে ভারতেও ডুপ্লে একান্ত অনিচ্ছা সত্বে বাধ্য হলেন ইংরেজদের মাদ্রাজ ফিরিয়ে দিতে। এই যুদ্ধই ইতিহাসে প্রথম কর্ণাটকের যুদ্ধ নামে পরিচিত।	* তখন মরিশাসে ফরাসী শাসক কে ছিলেন ? * তিনি ভারতে এসে কি করলেন ? * তাঁর সঙ্গে কি নিয়ে ডুপ্লের মতবিরোধ ঘটলো ? * কোন্ সন্ধি দ্বারা ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্বের অবসান হ'ল ? * এই সন্ধি দ্বারা কি স্থির হ'ল ?
॥ গ শীর্ষ ॥ ডুপ্লে মাদ্রাজ ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হলেও সুযোগ খুঁজতে লাগলেন, ইংরেজদের সঙ্গে আরেকবার মোকাবিলার। তেমন সুযোগও শীঘ্রই এসে গেল।	
১৭৪৮ সালে দাক্ষিণাত্যের সুবাদার হায়দরাবাদের নিজার-উল মুল্‌কের মৃত্যু হয়। তখন তাঁর পুত্র নাসির জং উত্তরাধিকারী হলেও পৌত্র মুজফ্‌ফর জং মোগল সম্রাটের সনদ অনুসারে সিংহাসন দাবী করলেন।	* নিজাম-উল-মুল্‌কের মৃত্যুর পর দাক্ষিণাত্যের সুবাদারী নিয়ে কি অবস্থার সৃষ্টি হ'ল ?
অন্যদিকে কর্ণাটকের নবাব পদে নিজাম নির্বাচিত আনোয়ার উদ্দীনকে অস্বীকার করে কর্ণাটকের মৃত নবাব দোস্তআলীর জামাতা চাঁদা সাহেব নিজের দাবী উপস্থিত করলেন।	* কর্ণাটকের নবাব পদে অপর দাবীদার কে ছিলেন ?
ডুপ্লে ভারতীয় রাজন্যবর্গের এই আভ্যন্তরীণ কলহের সুযোগ নিয়ে মুজফ্‌ফর জং ও চাঁদা সাহেবের পক্ষ সমর্থন করলেন। ১৭৪৯ সালে এক যুদ্ধে আনোয়ার উদ্দীন পরাজিত ও নিহত হলেন। তখন তাঁর পুত্র মহম্মদআলী ইংরেজ সাহায্য চাইলেন।	* ভারতীয় রাজন্য বর্গের এই বিবাদে ফরাসীগণ কাদের পক্ষ অবলম্বন করলো ? * এই বিবাদে ইংরাজেরা অবতীর্ণ হ'ল কখন ?

বিষয়	পদ্ধতি
এইবার ইংরেজ নাসির জং ও মহাম্মদআলীর পক্ষ নিল। ফলে আরেকটি যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হ'ল। এই যুদ্ধে রবার্ট ক্লাইভ অপূর্ব কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত ইংরেজদের সাফল্যে আনে। কর্ণাটকের এই দ্বিতীয় যুদ্ধে ফরাসী বিপর্যয়ের পথ প্রশস্ত হ'ল।	* এই যুদ্ধে সর্বাধিক কৃতিত্ব কার ? * এই যুদ্ধ কোন্ পথ প্রশস্ত করে দিল ?
॥ ঘ শীর্ষ ॥	
১৭৫৬ সালে ইউরোপে যখন সাত বৎসরের যুদ্ধ আরম্ভ হ'ল তখন ভারতেও আরেকবার শুরু হ'ল ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব। এবারকার যুদ্ধের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল ফরাসী সেনাপতি লালী মাদ্রাজ জয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন। আর ইংরেজ সেনাপতি আয়ার কুট বন্দিবাসের যুদ্ধে (১৭৬০) ফরাসীদের শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং পণ্ডিচেরি দখল করেন। পরে অবশ্য প্যারিসের সন্ধির ফলে ফরাসীগণ পণ্ডিচেরি ফিরে পেয়েছিল। কিন্তু এই যুদ্ধের পর ভারতে আর তাদের মাথা তুলে দাঁড়াবার শক্তি থাকলো না। ফলে ভারতে ইংরেজ শক্তির ক্রমবিকাশে বাধা দেবার মত কোন ইউরোপীয় শক্তিই বাকী রইলো না। এই হ'ল তৃতীয় কর্ণাটকের যুদ্ধ।	* ভারতে তৃতীয় বার ইঙ্গ-ফরাসী দ্বন্দ্ব শুরু হ'ল কখন ? * তখন ফরাসী সেনাপতি কে ছিলেন ? * তিনি কিসে ব্যর্থ হলেন ? * কোন্ যুদ্ধে ফরাসীগণ শোচনীয়ভাবে পরাজিত হল ? * এই যুদ্ধে ইংরেজ সেনাপতি কে ছিলেন ? * কোন্ সন্ধি দ্বারা সাত বৎসরের যুদ্ধের অবসান হ'ল ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজেদের খাতায় তুলে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে :

এক। কর্ণাটকের তিনটি যুদ্ধ আমাদের কি শিক্ষা দেয় ?

দুই। ভারতের আভ্যন্তরীণ কলহে ইংরেজ ও ফরাসীগণ কিভাবে অনুপ্রবেশ করেছিল ?

তিন। কর্ণাটকের বিভিন্ন যুদ্ধে বিখ্যাত নায়ক কারা ? এঁদের মধ্যে কে তোমাকে সর্বাপেক্ষা মুগ্ধ করে এবং কেন ?

গৃহকাজ –শিক্ষার্থীদের একটি ভারতের মানচিত্র এঁকে তাতে কর্ণাটকের তিনটি যুদ্ধের বিখ্যাত স্থানগুলি নির্দেশ করে আনতে বলা হবে।

পাঠ পরিকল্পনা (৭)

শ্রেণী– নবম

বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা
অন্তকার পাঠ– প্রাচীন ভারতে দাক্ষিণাত্যের ভূমিকা।

উদ্দেশ্য –প্রত্যক্ষ :–প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পটভূমিকায় দক্ষিণ ভারতের অবদান সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

পরোক্ষ :–ইতিহাস চর্চার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিচার শক্তি ও যুক্তিবোধ জাগ্রত করে তাদের সামগ্রিক চিন্তাধারার বিকাশ সাধন এবং সত্যানুসন্ধানে আগ্রহী করে তোলা।

উপকরণ -সমসাময়িককালের ভারতের মানচিত্র, বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত চার্ট, শিল্পের নিদর্শন এবং শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন –শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনীয় বাতাবরণ সৃষ্টি করা এবং শিক্ষার্থীদের অন্তকার পাঠের প্রতি আগ্রহশীল করে তোলার উদ্দেশ্যে তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে :—

এক ॥ ভারতকে প্রায় সমান দুভাগে দ্বিখণ্ডিত করেছে কোন্ পর্বতমালা?
দুই ॥ উত্তর ভারতের প্রাকৃতিক গঠন কেমন?
তিন ॥ দক্ষিণ ভারতের প্রাকৃতিক গঠন কি রকম?
চার ॥ উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান ভাষা কি?
পাঁচ ॥ দক্ষিণ ভারতে বহু কথিত ভাষাগুলি কি কি?
ছয় ॥ প্রাচীন উত্তর ভারতের দু/একটি বিখ্যাত রাজ বংশের নাম কর।
সাত ॥ এই সময়ে দক্ষিণ ভারতের বিখ্যাত রাজবংশের নাম বল।
আট ॥ উত্তর ভারতের বিখ্যাত সম্রাট হর্ষবর্ধন দক্ষিণ ভারতের কোন্ বীরের কাছে পরাজিত হয়েছিলেন?

পাঠঘোষণা : 'আজ আমরা প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার বিকাশে দক্ষিণ ভারতের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করবো।' এই বলে অন্তকার পাঠ ঘোষণা করা হবে।

উপস্থাপন ঃ

বিষয়	পদ্ধতি
	আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠদান কার্য অগ্রসর হবে। প্রয়োজন মত উল্লিখিত কারণ সমূহ ব্যবহৃত হবে। আলোচনার সুবিধার্থে অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে ভাগ করা হবে :— ॥ ক ॥ শীর্ষ—ভূমিকা ॥ খ ॥ শীর্ষ—প্রশাসনিক ব্যবস্থা ॥ গ ॥ শীর্ষ—সমাজ ও সাহিত্য ॥ ঘ ॥ শীর্ষ—শিল্প
॥ক শীর্ষ॥ উত্তর ভারতের মত দক্ষিণ ভারতেও বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে সংঘর্ষ বহুবার ঘটলেও সেখানকার সমাজ সাহিত্য শিল্প সভ্যতার ক্ষেত্রে এমন সব বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট যে আজও এসবের অস্তিত্ব অক্ষুণ্ণ আছে। তবে উত্তর ভারতের মত এত বেশী ক্ষুদ্র রাজ্য গড়ে ওঠে নি দক্ষিণ ভারতে। তবুও রাজনৈতিক দিক থেকে সর্বদাই উত্তর ভারতের প্রাধান্যই স্বীকৃতি পেয়েছে। এমন কি ধর্ম ও সংস্কৃতির চর্চার ক্ষেত্রেও উত্তর ভারতের প্রভাব রয়েছে।	* কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে উত্তর ভারত দক্ষিণ ভারতকে প্রভাবিত করেছে?
কিন্তু জনসাধারণের সহযোগিতায় যে সুন্দর স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতে গড়ে উঠেছিল তা তাদের নিজস্ব। তাদের নিজস্ব একটি শক্তিশালী নৌ বাহিনী হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও। বিশেষ করে মালাবার উপকূলের নাবিকেরা অতুলনীয় সাহস ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছে। চোল শাসনকালে নৌবাহিনীর কৃতিত্বে বঙ্গোপসাগরকে বলা হ'ত চোল হ্রদ। দক্ষিণ ভারতের নৌবাহিনীর কৃতিত্বে	* দক্ষিণ ভারতের নিজস্বতা কোথায় কোথায়। * চোল শাসনকালে বঙ্গোপসাগরকে কি বলা হ'ত? * কোথাকার নাবিকেরা অতুলনীয়

বিষয়	পদ্ধতি
ভারতীয় প্রভাব চীন ও মালয় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল।	সাহস ও নৈপুণ্যের অধিকারী ? * দক্ষিণ ভারতের নৌ-বাহিনীর কৃতিত্বে ভারতীয় প্রভাব কোথায় কোথায় বিস্তৃত হয়েছিল ?
॥ খ শীর্ষ ॥ দক্ষিণ ভারতেও রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু রাজতন্ত্র স্বেচ্ছাচারী ছিল না। রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতো পুরোহিত, দৈবজ্ঞ, বৈদ্য, মন্ত্রীমণ্ডল ও সাধারণ প্রজা। এদের বলা হ'ত 'পঞ্চ মহাসভা'। স্থায়ী ও বেতন-ভোগী সৈন্যদল থাকায় জায়গীরদার ধরনের শ্রেণী রাজশক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে নি।	* দক্ষিণ ভারতের শাসন ছিল কেমন ? * রাজতন্ত্র নিয়ন্ত্রণ করতো কারা ? * জায়গীরদার ব্যবস্থা না থাকার সুফল কি হয়েছিল ?
গ্রাম ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তি। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে 'কুবরম্' ; কয়েকটি 'কুবরম্' নিয়ে 'নাড়ু' বা জেলা ; কয়েকটি জেলা নিয়ে 'কোট্টম' ; এবং কয়েকটি 'কোট্টম' নিয়ে মণ্ডলম্ বা প্রদেশ গঠিত হ'ত। রাজ বংশীয় ব্যক্তিদের সাধারণতঃ প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হ'ত। উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসেবে নেওয়া হ'ত। তা ছাড়া জল কর, খনি, অরণ্য ব্যবসায়ের লভ্যাংশ থেকেও রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত।	* প্রশাসনিক কাঠামোটি ছিল কেমন ? * কাদের প্রদেশের শাসনকর্তা হিসেবে নিয়োগ করা হ'ত ? * কোন্ কোন্ উৎস থেকে রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত ?
এই প্রশাসনের স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল গ্রামাঞ্চলে সাধারণ মানুষের সামাজিক অধিকার ও দায়িত্ব। গ্রাম সভার হাতে থাকতো সকল দায়িত্ব। গ্রামের বৃদ্ধ ও প্রধানেরা গ্রামসভা পরিচালনা করতো। জনহিতকর বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব বিভিন্ন সমিতির উপর অর্পন করা হ'ত। অধিকারী নামে এক ধরনের রাজ কর্মচারী কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে স্থানীয় শাসনের যোগসূত্র রক্ষা করতো।	* এই শাসনের স্মরণীয় বৈশিষ্ট কি ? * গ্রামসভা পরিচালনা করতো কারা ? * জনহিতকর কার্যাবলী কিভাবে সম্পন্ন হ'ত ? * কেন্দ্রীয় শাসনের সঙ্গে স্থানীয় শাসনের যোগাযোগ রক্ষা করতো কারা ?

বিষয়	পদ্ধতি
॥ গ শীর্ষ ॥ সাধারণ লোক শান্তিতে বসবাস করতো। ধর্মে—শিল্পে—সাহিত্যে তাদের উৎসাহ ছিল। সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীর লেখক তিরুভল্লুভার কুরুল নামে যে ভক্তি ও নীতিমূলক কাব্য রচনা করেন তা আজিও জনপ্রিয়। বৈষ্ণব সাধু নম্মলভার ও শৈব সাধু মাণিক্ক ভচকর বহু অপূর্ব কবিতা রচনা করেছিলেন। বস্তুতঃ তামিল সাহিত্যের যথার্থ মূল্যায়ণ আজও আমরা করতে পারি নি।	* সাধারণ লোকের অবস্থা তখন কেমন ছিল? * কুরুল কি এবং কে রচনা করেন? * বৈষ্ণব সাধুর কি নাম? * শৈব সাধু কে ছিলেন?
॥ ঘ শীর্ষ ॥ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে দক্ষিণ ভারতের বৈভব বিপুল ও বিস্ময়কর। পল্লব যুগের প্রস্তর ও কাষ্ঠ স্থাপত্যের নয়ন-মুগ্ধকর নিদর্শন পাওয়া যায় কাঞ্চী ও মহাবলিপুরমের মন্দিরে ও সমুদ্র সৈকতে।	* পল্লব যুগে কোন্ স্থাপত্য শিল্পে নৈপুণ্য দেখিয়েছিল? * এই শিল্পের নিদর্শন পাওয়া যায় কোথায়?
চালুক্য শাসনকালের গুহা মন্দিরগুলি শিল্পে উৎকর্ষের এক অক্ষয় কীর্তি। যেমন আইহোলের গোলাকার দুর্গা মন্দির। অজন্তার বহু চিত্র এ সময়েই অংকিত হয়েছিল।	* চালুক্যদের অক্ষয় কীর্তি কি? এই কীর্তির নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?
রাষ্ট্রকূটদের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল ইলোরার জগদ্বিখ্যাত কৈলাস মন্দির।	* ইলোরার কৈলাস মন্দির কখন নির্মিত হয়েছিল?
মন্দির নির্মাণে পরিপূর্ণ দক্ষতার পরিচয় পাওয়া গেল চোল শাসনকালে। পল্লব যুগের মন্দিরগুলো ছিল ক্ষুদ্রাকারের। চোল যুগে বিশালাকার মন্দির, প্রাঙ্গণ, নাটমন্দির, জলাশয়, বিপনি প্রভৃতি গড়ে উঠলো কোন দেবস্থানকে কেন্দ্র করে। তাঞ্জোর, গঙ্গই কোণ্ড চোলপুরম্, চিদাম্বরম, ত্রিচিনাপল্লী প্রভৃতি স্থানে চোল স্থাপত্যের নিদর্শন আছে।	* মন্দির নির্মাণে সর্বাধিক দক্ষতা দেখিয়েছেন কারা? * তাদের মন্দিরের বৈশিষ্ট্য কি কি? * এই স্থাপত্যের নিদর্শন কোথায় পাওয়া যায়?

বোর্ডের কাজ—অদ্যকার পাঠের সারাংশ শিক্ষার্থীদের সহায়তায় বোর্ডে লেখা হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজেদের খাতায় লিখে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধ জ্ঞান পরীক্ষার জন্য তাদের নিম্নরূপ সমস্যাবলী সমাধানে উদ্বুদ্ধ করা হবে:—

এক। প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে আধুনিক স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার একটি সংক্ষিপ্ত তুলনামূলক আলোচনা শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে লিখতে বলা হবে।

দুই। ছক্ এঁকে দক্ষিণ ভারতের প্রশাসনিক কাঠামোটি বিশ্লেষণ করতে বলা হবে।

তিন। নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখতে বলা হবে:—
কৈলাস মন্দির, মহাবলিপুরম, চোল-মন্দির, চোল হ্রদ, পঞ্চ মহাসভা।

গৃহকাজ—(ক) অদ্যকার পাঠ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের নিম্নোক্ত বইগুলো বাড়ীতে পাঠ করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে:

এক। ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড) লেখক অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায়।

দুই। ভারতজন কথা—লেখক বিমল ঘোষ।

তিন। ভারতের ইতিবৃত্ত—বিমলা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়।

(খ) বর্তমান স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাচীন দক্ষিণ ভারতের স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার এক তুলনামূলক আলোচনা লিখে আনবার জন্য শিক্ষার্থীদের নির্দেশ দেওয়া হবে।

পাঠ-পরিকল্পনা ৮)

শ্রেণী—নবম

বিষয়: ভারত ও ভারতজন কথা
অদ্যকার পাঠ: সিপাহী বিদ্রোহের স্বরূপ।

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ: ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

পরোক্ষ: ইতিহাস চর্চা কালে বিভিন্ন বিতর্কিত প্রশ্নে বিচারবোধ ও যুক্তি বোধকে সজাগ ও সতর্ক রেখে নৈর্ব্যক্তিক মানসিকতা নিয়ে প্রকৃত সত্যের আবরণ উন্মোচন করা।

উপকরণ—বিভিন্ন উদ্ধৃতি সম্বলিত একাধিক চার্ট ও শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—শিক্ষার্থীদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইবে :—

এক ॥ ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ কি ?

দুই ॥ এই বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ ঘটে কোথায় ?

তিন ॥ এই বিদ্রোহের দু/একজন বিখ্যাত নেতার নাম বল ।

চার ॥ ভারতের কোন্ কোন্ অঞ্চলে এই বিদ্রোহ সম্প্রসারিত হয়েছিল ?

পাঠঘোষণা—আজ আমরা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের প্রকৃতি নির্ণয়ে সচেষ্ট হবো।" এই বলে অদ্যকার পাঠ ঘোষিত হবে।

উপস্থাপন—

শিক্ষকের ভূমিকা :

ভারতের ইতিহাসের একটি বহু বিতর্কিত প্রসঙ্গ অদ্যকার আলোচ্য বিষয়। অতএব এই বিতর্কিত বিষয় সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা করতে হলে শিক্ষককেই প্রধান ভূমিকা নিতে হবে এবং সম্পূর্ণ নিরাসক্তভাবে বিষয়টিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করতে হবে।

শিক্ষকের বক্তব্য :

১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ নিয়ে নানা মুনির নানা মত। ঐতিহাসিকেরা প্রায় পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশ করেছেন এই বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এই মতামতগুলোকে দুই ভাগে ভাগ করে নেব। সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতামত। আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মতামত।

সমসাময়িক ঐতিহাসিকদের মতামত :

(১) সাধারণভাবে ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে "Great Divide in modern Indian History" বা বড় বিভাজক হিসেবে বর্ণনা করেছেন। এই বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ ফল হ'ল এদেশে কোম্পানীর শাসনকালের অবসান হ'ল, আরম্ভ হ'ল বৃটিশ রাজ্যের প্রত্যক্ষ শাসনকাল। বিদ্রোহের পটভূমিকা যে ছিল সুদূর প্রসারী তা শাসন ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের মধ্যেই আচ্ছন্ন। নস্যাৎ করে দেবার মত ঘটনা হলে এত বেশী গুরুত্ব দেবার কোন কারণ ছিল না।

শিক্ষার্থীদের বিচার্য :

এক। ঐতিহাসিকেরা এই বিদ্রোহকে কি বলে বর্ণনা করেছেন ?

দুই। এ রকম বর্ণনার কারণ কি ?

তিন। এই বর্ণনার পেছনে যুক্তি কি ?

সমসাময়িক বিভিন্ন ব্যক্তি :

(২) তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল **লর্ড ক্যানিং**-এর এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে দুই উল্লেখযোগ্য মন্তব্য :

(ক) I look upon Central India as gone, and to be reconquered.

(খ) If Scindia joins the rebellion, I shall have to pack off tomorrow.

(৩) শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন **আলেকজাণ্ডার ডাফ্** লিখেছেন : "কোটি কোটি লোকের মনে গভীর বিক্ষোভ বিরাজ করছে। অনেকে ইংরেজ শাসনের অনুকূলে থাকলেও তারা ঐ শাসনের প্রতি অনুরক্ত বললে ভুল ধারণার সৃষ্টি করা হবে।

(৪) বিদ্রোহের প্রত্যক্ষদর্শী ইংরেজ লেখক ম্যালেসন্. কে, বল প্রভৃতি এই অভিমত প্রকাশ করেছেন যে এই বিদ্রোহ ছিল ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের একটি সুপরিকল্পিত উদ্যোগ।

(৫) ১৮৫৯ সালের এপ্রিল মাসে 'এডিনবার্গ রিভিউ' পত্রিকায় লেখা হয়েছিল, "Throughout its whole progr.ss it has faithfully retained the character of a military revolt.

(৬) সেই সময়কার একজন বিখ্যাত বাঙ্গালী লেখক কিশোরী চাঁদ মিত্র লিখেছিলেন, "The insurrection is essentially a military insurrection ··· It has nothing of the popular element in it."

(৭) বিদ্রোহকালে হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি এমন স্তরে ছিল যে কে বলেছেন, "Mahammedans and Hindus were plainly united against us." লর্ড লরেন্স বলেছেন, "In this instance we could not play the Mahammedan against the Hindu."

(৮) ১৮৫৭ সালের ২১শে মে তারিখে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লেখেন, "গত কয়েক সপ্তাহের ঘটনা থেকে দেখা গেছে যে ভারতীয় প্রজাদের মনে ইংরেজ শাসনের প্রতি আনুকূল্য একান্ত অল্প। আজ শুধু সিপাহীদের নয়, সারা দেশেই যেন বিদ্রোহ ঘটেছে।"

(৯) ১৮৫৮ সালে কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন,

"স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে, কে বাঁচিতে চায় ?
দাসত্ব শৃঙ্খল বলো কে পরিবে পায় হে, কে পরিবে পায় ?"

এমন এমন বহু বক্তব্য উদ্ধৃত করা যায়, যে সব থেকে আমরা এই মহা বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে একটি ধারণা করে নিতে পারি।

শিক্ষার্থীদের ভূমিকা :

উপরোক্ত উদ্ধৃতিগুলি থেকে শিক্ষার্থীদের বিচার্য হ'ল নিম্নোক্ত বিষয়গুলো :

এক ॥ সমসাময়িক কালের কয়েকজন বিখ্যাত লেখকের নাম বল।
দুই ॥ এদের মধ্যে কার বক্তব্য সর্বাধিক মূল্যবান বলে মনে হয় ?
তিন ॥ তিনি কি বলেছেন ?
চার ॥ তার বক্তব্য থেকে এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কি ধারণা হয় ?
পাঁচ ॥ উপরোক্ত মতামতগুলো থেকে বিদ্রোহ সম্পর্কে তোমার মতামত কি ?

শিক্ষকের বক্তব্য :—

আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের মতামত :

এই মুহূর্তে ঘটে যাওয়া ঘটনা ইতিহাস হলেও সেই ঘটনার প্রকৃত ঐতিহাসিক মূল্যায়ণ কখনো সেই মুহূর্তেই সম্ভব নয়। কেননা ঘটিত ঘটনার সঙ্গে উদ্ভূত কিছু প্রাক্ষোভিক বহিঃপ্রকাশ এই মূল্যায়ণের কাজে বিশেষ প্রতিবন্ধক। তাই যথার্থ মূল্যায়ণের স্বার্থেই প্রয়োজন কিছুটা সময়ের দূরত্ব। এ কারণেই ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ সম্পর্কে সমসাময়িক কালের মতামত জানার পরেও আমাদের জানা দরকার পরবর্তী কালের ঐতিহাসিকদের মতামত, যারা বহুলাংশে সময়ের দূরত্ব-হেতু নিরপেক্ষ হতে পারেন, নির্লিপ্তভাবে সত্যতা যাচাই করতে পারেন এবং ফলতঃ ঘটনার নিরাসক্ত বিচারক হতে পারেন।

(১) বিখ্যাত দেশপ্রেমিক ভি. ডি. সাভারকার এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতার জন্য প্রথম ভারতীর সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর লেখা "Indian war of independence নামক গ্রন্থে তিনি লিখেছেন, "national minded leaders and thinkers have regarded it as a planned and organised political and military rising aimed at destroying the British power in India."

(২) সর্দার পানিক্কর বলেছেন, "the mutiny was no 'mutiny at all, but a great national uprising."

(৩) ডঃ সুরেন্দ্র নাথ সেন বিদ্রোহের গতি-প্রকৃতি ও বিস্তৃতি আলোচনা করে মন্তব্য করেছেন, "what began as a fight for religion ended as a war of independence for there is not the slightest doubt that the rebels wanted to get rid of the alien government.

(৪) ডঃ রমেশ মজুমদার অবশ্য এ কথা স্বীকার করেছেন যে, এই বিদ্রোহ কেবল সিপাহীদের বিদ্রোহই ছিল না, কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ বিদ্রোহের রূপলাভ করেছিল। তথাপি তিনি বিদ্রোহকে জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহ বলে মেনে নিতে রাজী হন নি

(৫) ভারতের সাম্প্রতিক ঐতিহাসিকেরা অবশ্য জোর দিয়েই এই বিদ্রোহকে স্বাধীনতা লাভের ভারতের মানুষের প্রথম সক্রিয় উদ্যোগ বলে চিহ্নিত করতে চান। তাঁরা তাঁদের পক্ষে যে যুক্তিগুলি উপস্থাপন করেন তার মধ্যে প্রধান হ'ল :

(ক) বিদ্রোহীদের মধ্যে জাতীয় চেতনার অভাব ছিল বলে যে মত প্রকাশ করা হয় তার বিপক্ষে এইসব ঐতিহাসিকেরা, বর্তমান চেতনার মানদণ্ডে তখনকার জাতীয়তাবোধকে বিচার করা চলে না। জাগ্রত জাতীয় চেতনা যে তাদের ছিল তার প্রমাণ বিদ্রোহ-বার্তা প্রচারে পদ্মফুল ও চাপাটির প্রতীক ব্যবহার। তাছাড়া বিদ্রোহী বিক্ষোভ সমানভাবেই প্রকাশিত হয়েছিল তাদের বিরোধী ভারতীয় রাজন্যবর্গ, জমিদার ও অন্যান্যদের প্রতি।

(খ) বিদ্রোহের প্রথম বহিঃপ্রকাশ সিপাহীদের মধ্যে হলেও সাধারণ জনচিত্ত যে কতটা বিক্ষুব্ধ ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় সিপাহীদের কাছে লেখা তাদের অভিভাবকদের চিঠি-পত্র থেকে। প্রায় তিন হাজার চিঠি এখনো দিল্লীর মহাফেজ খানায় সংরক্ষিত আছে।

(গ) বিদ্রোহের ব্যাপকতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা সমীচীন নয়। কেননা ১৯০৫ সালের যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন কেবলমাত্র মূলতঃ বঙ্গদেশেই কেন্দ্রীভূত ছিল তাকে যদি আমাদের স্বাধীনতা-আন্দোলন বলে চিহ্নিত করতে কোন দ্বিধা না থাকে, তবে সেই তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক ও বিস্তৃত ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহকেও জাতীয় আন্দোলন বলে চিহ্নিত না করার কোন কারণ নেই।

শিক্ষার্থীদের বিবেচ্য :—

এক। আধুনিকদের মধ্যে খ্যাতনামা দুজন ঐতিহাসিক কে কে ?
দুই। তাঁরা এই বিদ্রোহ সম্পর্কে কি মত প্রকাশ করেছেন ?
তিন। তাঁদের উভয়ের মতামতের মধ্যে পার্থক্য কোথায় ?
চার। ভারতের তরুণতর ঐতিহাসিকদের মত কি ?
পাঁচ। তাঁরা তাঁদের বক্তব্য প্রতিষ্ঠায় কি কি যুক্তি প্রদর্শন করেন ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

অভিযোজন—নবলব্ধ জ্ঞান শিক্ষার্থীগণ কতটা আয়ত্ত করতে পেরেছে তা যাচাই করবার জন্য শ্রেণীকক্ষে নিম্নোক্ত কর্মসূচী অনুসৃত হবে।

বিতর্ক সভার অনুষ্ঠান :

বিষয় : সভার মতে ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহ প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতার সংগ্রাম।

বিতর্কে পক্ষে পাঁচজন ও বিপক্ষে পাঁচ জনকে বলার সুযোগ দেওয়া হবে।

প্রত্যেকের জন্য দুই মিনিট করে সময় নির্দিষ্ট করা হবে। শিক্ষক নিস্পৃহভাবে আলোচনার গতি প্রকৃতি লক্ষ্য করবেন। কেবলমাত্র আলোচনা বিপথগামী হলেই তিনি হস্তক্ষেপ করবেন। নতুবা শিক্ষার্থীদের পূর্ণ কর্তৃত্বে তিনি বাধাদান করবেন না।

গৃহকাজ—১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব মতামত বাড়ী থেকে লিখে নিয়ে আসতে বলা হবে।

পাঠপরিকল্পনা (৯)

শ্রেণী—দশম	বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা অদ্যকার পাঠ— স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য

উদ্দেশ্য—প্রত্যক্ষ ঃ—স্বদেশী আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের ভারতীয় মুক্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হতে সাহায্য করা।

পরোক্ষ ঃ—ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও অতীত সম্পর্কে সচেতন করে তোলার মধ্য দিয়ে তাদের স্বদেশানুরাগী করা।

উপকরণ—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতিকৃতি, অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কীত একটি চার্ট ও শ্রেণী কক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষের উপযোগী বাতাবরণ সৃষ্টি এবং তাদের পূর্বজ্ঞান পরীক্ষার উদ্দেশ্যে শিক্ষক নিম্নরূপ প্রশ্নাবলী উত্থাপন করবেন—

এক। বঙ্গ ভঙ্গের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন কে?
দুই। এমন সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ কি ছিল?
তিন। এই সময় বঙ্গ দেশের নেতৃত্বে কারা ছিলেন?
চার। এই সিদ্ধান্ত রদ করার জন্য তাঁরা কি কর্মসূচী ঘোষণা করলেন?

পাঠঘোষণা—আজ আমরা বঙ্গভঙ্গ সিদ্ধান্ত রোধে যে স্বদেশী "আন্দোলনের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল সেই আন্দোলনের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবো।" এই বলে অদ্যকার পাঠ ঘোষণা করা হবে।

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
		আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠ দান কার্য অগ্রসর হবে। প্রয়োজন মত উপকরণ ব্যবহৃত হবে। আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে বিভক্ত হবে। ক। শীর্ষ=ভূমিকা খ। শীর্ষ = অর্থ নৈতিক তাৎপর্য গ। শীর্ষ=রাজনৈতিক তাৎপর্য
	॥ ক শীর্ষ ॥	প্রশ্নাবলী :—
	বঙ্গ দেশকে বিভক্ত করার যে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ১৯০৫ সালে তাকে রদ করার যে কর্মসূচী সেইদিন বঙ্গ দেশের নেতৃবৃন্দ গ্রহণ করেছিলেন তা স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। কিন্তু এর আগেও আন্দোলন হয়েছে স্বদেশ ও স্বদেস বাসীর কল্যাণার্থে। কিন্তু তবু বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনই স্বদেশী আন্দোলন নামে পরিচিত। এর কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন।	(এক) স্বদেশী আন্দোলন বলতে কোন্ আন্দোলনকে বোঝায় ?
	সবচেয়ে বড় কারণ এ সময় জাতীয় চেতনা যেমন ভাবে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি সর্বক্ষেত্রে পরিস্ফুট হয়েছিল তেমন আর কখনো হয় নি। আমাদের এই জাতীয় ভাবধারার বাণীমূর্তি হলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি এ সময় গানের মধ্য	(দুই) এর সবচেয়ে বড় কারণ কি ? (তিন) জাতীয় ভাবধারার বাণীমূর্তি কে ছিলেন ? (চার) তিনি কেমন করে

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
	দিয়ে জাতীয় চেতনাকে সর্বপ্লাবী করে তুলেছিলেন এ সময়ই তিনি রচনা করেন, “ও আমার সোনার বাংলা” “যদি তোর ডাক শুনে কেউ” “বাংলার মাটি বাংলার জল” প্রভৃতি গান	জাতীয় চেতনাকে বিস্তৃত করেছিলেন ? (পাঁচ) এ সময় তিনি কি কি গান রচনা করেন ?
	॥ **খ শীর্ষ** ॥ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আন্দোলনের মৌল লক্ষ্য ছিল দুটি : বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং পৃষ্ঠপোষকতা। এই আন্দোলনে অগ্রণী হয় দেশের তরুণ ছাত্র সমাজ। এ আন্দোলনের সাফল্যের প্রমাণ :	(এক) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলনের লক্ষ্য কি ছিল ?
	(এক) এক বছরে বিলাতী কাপড়ের বিক্রি ৭৭,০০০ টাকা থেকে কমে দাঁড়ায় মাত্র ৯০০০ টাকায়। (দুই) ১৯০৫ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বরে বিলাতী লবণের আমদানী কমে ১৪০,০০০ মন, কাপড় কমে তিন কোটী গজের মতো। (তিন) বিদেশী জুতার আমদানী কমে ৭৫% এবং সিগারেট ৫০%।	(দুই) আন্দোলনের সাফল্যের দুই / একটি প্রমাণ দাও। (তিন) বিদেশী ব্যবসায়ীগণ কি স্বীকার করেছেন ?
	ফলে বিদেশী ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় বন্ধ হবার যোগাড় হয়। বিদেশী ব্যবসায়ীগণই স্বীকার করেছেন, “Boycott result is disastrous.” অন্য দিকে দেশী শিল্পের মধ্যে বস্ত্র শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটে। বাংলার তরুণেরা, রজনীকান্তের মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়’ এই গানটি গাইতে গাইতে ঘরে ঘরে দেশী বস্ত্র নিয়ে ফেরী করে বেড়াতো।	(চার) কোন্ দেশীয় শিল্পের প্রসার হয় এ সময় ? (পাঁচ) কেমন ভাবে দেশীয় বস্ত্র শিল্প প্রসারিত হয়েছিল ?

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
	॥ গ শীর্ষ ॥ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই আন্দোলন জাতীয় ঐক্য ও সংহতির গুরুত্ব উপলব্ধি করতে শেখালো। কেবলমাত্র আবেদন নিবেদন করার নীতি যে সার্থক হবে না, এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সে অভিজ্ঞতা ভারতবাসী অর্জন করলো। ফলে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে চরমপন্থী ও অধিকতর সংগ্রাম মুখী মতবাদের বিকাশ হ'ল। এই আন্দোলনের আরেকটি উল্লেখ-যোগ্য তাৎপর্য হ'ল, হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি। ইংরেজ শক্তি উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির চেষ্টায় অংশত সফল হলেও সামগ্রিকভাবে ব্যর্থ হয়। এই আন্দোলনের সূত্র ধরেই আরম্ভ হয় জাতীয় শিক্ষা আন্দোলন।	(এক) এই আন্দোলন কি শেখালো ? (দুই) এই আন্দোলনের অভিজ্ঞতা কি ? (তিন) এই আন্দোলনের ফলে কোন মত-বাদের বিকাশ হ'ল ? (চার) এই আন্দোলনের আরেকটি তাৎপর্য কি ? (পাঁচ) এই আন্দোলনের সূত্র ধরে আর কোন্ আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অন্তকার পাঠের সারাংশ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীগণ নবলব্ধ জ্ঞান ঠিকমত গ্রহণ করতে পেরেছে কি না তা অনুধাবনের উদ্দেশ্যে তাদের সম্মুখে নিম্নরূপ প্রশ্নমালা উত্থাপিত হবে :

(এক) স্বদেশী আন্দোলন বলতে কি বোঝ ?
(দুই) এই আন্দোলনের বানীমূর্তি কে ছিলেন ?
(তিন) তিনি কিভাবে আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন ?
(চার) এই আন্দোলনে অগ্রণী হয়েছিল কে ?
(পাঁচ) এই আন্দোলনের অর্থনৈতিক তাৎপর্য কি কি ?
(ছয়) রাজনৈতিক গুরুত্বই বা কি কি ?

গৃহকাজ—ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে স্বদেশী আন্দোলনের ভূমিকা—এই শিরোণামায় শিক্ষার্থীদের বাড়ী থেকে একটি নিবন্ধ রচনা করে নিয়ে আসতে নির্দেশ দেওয়া হবে।

পাঠ পরিকল্পনা (১০)

শ্রেণী—দশম	বিষয়—ভারত ও ভারতজন কথা আজকার পাঠ—ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার

উদ্দেশ্য প্রত্যক্ষ :—ভারতীয় সংবিধানে ভারতীয় নাগরিকদের কি কি মৌলিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে সে সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানার্জনে সাহায্য করা।

পরোক্ষ : ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে এই অভিজ্ঞতা অর্জন যে মানুষে যুগে যুগে বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যদিয়ে সংগ্রাম করতে করতে বর্তমান স্তরে এসে পৌঁছেছে।

উপকরণ মৌলিক অধিকার সম্বলিত একটি চার্ট ও শ্রেণীকক্ষের অন্যান্য সাধারণ উপকরণ।

আয়োজন—শ্রেণীকক্ষের উপযোগী বাতাবরণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাদের নিম্নরূপ **প্রশ্ন** জিজ্ঞাসা করা হবে :—

(ক) আমরা ইংরেজ শাসনাধীনে ছিলাম কত কাল ?
(খ) আমরা মুসলমান শাসনাধীনে কতদিন ছিলাম ?
(গ) তা হলে সব মিলিয়ে মোট কতকাল আমরা পরাধীন ?
(ঘ) পরাধীনতা আমরা বুঝি কি ভাবে ?
(ঙ) বর্তমানে আমাদের দেশে কি ধরনের শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তিত ?
(চ গণতন্ত্র কথাটির অর্থ কি ?

পাঠঘোষণা—'আজ আমরা গণতান্ত্রিক ভারতের নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সম্পর্কে আলোচনা করবো।' এই বলে অদ্যকার পাঠ ঘোষিত হবে।

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
		আলোচনা ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে অদ্যকার পাঠদান কার্য অগ্রসর হইবে। আলোচনার সুবিধার জন্য অদ্যকার পাঠ নিম্নোক্ত শীর্ষে বিভক্ত হইবে। ক) শীর্ষ—ভূমিকা (খ) শীর্ষ—সাম্যের অধিকার

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
		গ শীর্ষ - স্বাধীনতার অধিকার (ঘ) শীর্ষ - শোষণের অধিকার (ঙ) শীর্ষ– ধর্মের অধিকার (চ) শীর্ষ– সম্পত্তির ও নিয়মতান্ত্রিক প্রতিকারের অধিকার (ছ) শীর্ষ সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার
	॥ক শীর্ষ॥ বর্তমান পৃথিবীর প্রত্যেকটি গণতান্ত্রিক দেশ নিজেদের নাগরিকদের জন্য কতকগুলো মৌল অধিকার স্বীকার করে নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই অধিকারগুলো ছাড়া গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকত্ব অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাই এই অধিকারগুলোর গুরুত্ব এতখানি এবং এ কারণেই এই অধিকারগুলিকে বলা হয়েছে মৌলিক অধিকার। ভারতও একটি গণতান্ত্রিক দেশ। তাই ভারতীয় নাগরিকেরা কতকগুলো মৌলিক অধিকার ভোগ করে থাকে।	(এক) মৌলিক অধিকার কি ? (দুই) এই অধিকারের গুরুত্ব কি ?
	॥খ শীর্ষ॥ সাম্য বলতে বোঝায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নারী-পুরুষ বা জন্ম স্থানের ভেদাভেদ হেতু কোনো মানুষকে ভিন্ন চোখে বিচার না করা। অর্থাৎ রাষ্ট্রের দৃষ্টিতে সকল মানুষের সমান মর্যাদা।	(এক) সাম্য বলতে কি বোঝ ?

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
—	ভারতীয় সংবিধানের ১৪ থেকে ১৮নং ধারায় নাগরিকদের সাম্যের অধিকারগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। এই অধিকারগুলির মধ্যেই আছে, রাষ্ট্রের অধীনে সকলের চাকুরী পাবার অধিকার। সাম্যের অধিকার বলেই ঘোষিত হয়েছে অস্পৃশ্যতা এক আইনগত অপরাধ।	(দুই) ভারতীয় সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় সাম্যের অধিকারগুলি উল্লিখিত। (তিন) সাম্যের একটি অধিকার বল। (চার) এই অধিকার বলে কি ঘোষিত হয়েছে।
	॥ গ শীর্ষ ॥ ভারতীয় সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারায় যে অধিকারগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি স্বাধীনতার অধিকার রূপে চিহ্নিত। এইসব অধিকার বলতে বোঝায়, মত প্রকাশের অধিকার; শান্তিপূর্ণ সভাসমিতির সংগঠনের অধিকার, ভারতের সর্বত্র অবাধ চলাফেরার অধিকার, ভারতের যে কোন স্থানে বসবাসের অধিকার, যে কোন পেশা গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি। তবে এইসব অধিকারগুলো এক দায়িত্ববোধ দ্বারা সর্বদাই সীমাবদ্ধ। যেমন : মত প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে রাষ্ট্র-বিরোধী মন্তব্য করার অধিকারও থাকবে। এ কাজ করলে তা হবে রাষ্ট্রোদ্রহীতার অপরাধ।	(এক) সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় স্বাধীনতার অধিকার-গুলি উল্লিখিত ? (দুই) স্বাধীনতার অধিকারগুলি কি কি ? (তিন) এই অধিকারগুলি কিসের দ্বারা সীমাবদ্ধ ? (চার) এই সীমাবদ্ধতার যুক্তি কি ?
	॥ ঘ শীর্ষ ॥ শোষণ বলতে বোঝায়; মানুষের দারিদ্র্য বা অশিক্ষার সুযোগ নিয়ে তার শ্রম ও সেবা কোন ক্ষুদ্র স্বার্থে প্রয়োগ করে তাকে বঞ্চিত করা। এর বিরুদ্ধে	(এক) শোষণ বলতে কি বোঝায় ? (দুই) শোষণের বিরুদ্ধে

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
	নাগরিকদের অধিকার ভারতীয় সংবিধানের ২৩ ও ২৪ নং ধারায় উল্লিখিত। এই প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, জোর করে কাউকে বেগার খাটানো যাবে না, এবং চৌদ্দ বৎসরের কম বয়সের ছেলে-মেয়েদের কোন কর্মে নিয়োগ করা যাবে না।	অধিকার সংবিধানের কোন্ কোন্ ধারায় উল্লিখিত ? (তিন) এ প্রসঙ্গে কি বলা হয়েছে।
	॥ ঙ শীর্ষ ॥ ভারত ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। অর্থাৎ কারো ধর্মীয় বিষয়ে তার হস্তক্ষেপ নেই। তাই সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিক নিজ নিজ বিশ্বাস অনুসারে ধর্ম পালন করতে পারবে। তবে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় বা সাহায্যে পরিচালিত বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকবে না।	(এক) ভারত কি রকম রাষ্ট্র ? (দুই) এ কথার অর্থ কি ? (তিন) কোন্ কোন্ ধারায় এই অধিকার সম্পর্কে বলা হয়েছে ? (চার) কোথায় কোথায় ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না ?
	॥ চ শীর্ষ ॥ সংবিধানের ৩১ নং ধারা অনুসারে যে কোন নাগরিক সম্পত্তির অধিকারী হতে পারবেন। আইনানুগ ব্যবস্থা ছাড়া তাকে এই অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। তবে রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণকর কাজে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করতে পারে, এমন ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারে। কোন নাগরিক যদি মনে করেন যে তিনি তার মৌলিক অধিকারগুলো ভোগ করতে পারছেন না, তবে সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫ নং ধারা অনুসারে সুপ্রীমকোর্টে বিচারপ্রার্থী হতে পারে।	(এক) সংবিধানের ৩১নং ধারায় কি বলা হয়েছে ? (দুই) রাষ্ট্র কখন ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করতে পারে ? (তিন) কোন নাগরিক মৌলিক অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত হলে কি করতে পারে ?

উপস্থাপন :	বিষয়	পদ্ধতি
	॥ ছ শীর্ষ ॥ ভারতে বহু জাতির বাস। তাদের প্রত্যেকের প্রায় নিজেদের ভাষা আছে, সাহিত্য আছে, সংস্কৃতি আছে এবং এ সব নিজস্বতার প্রতি সবার দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক। তাই সংবিধানের ২৯ ও ৩০ নং ধারায় বলা হয়েছে, প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার হ'ল যে সে তার নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি অনুসারে শিক্ষা লাভের সুযোগ পাবে।	(এক) কিসের প্রতি মানুষের স্বাভাবিক দুর্বলতা ? (দুই) এই দুর্বলতার জন্য সংবিধানে কি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ?

বোর্ডের কাজ—শিক্ষার্থীদের সহায়তায় অদ্যকার পাঠ বোর্ডে লিখে দেওয়া হবে এবং শিক্ষার্থীদের তা নিজ নিজ খাতায় তুলে নিতে বলা হবে।

অভিযোজন—শিক্ষার্থীদের নবলব্ধজ্ঞান যাচাই করতে তাদের নিম্নরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হবে :

এক/ মৌলিক অধিকারকে মৌলিক বলা হয়েছে কেন ?
দুই/ এই অধিকারগুলি কি কি ?
তিন/ সংবিধানের ৩২ থেকে ৩৫নং ধারার তাৎপর্য কি ?
চার/ কোন্ অধিকারগুলি দায়িত্ববোধ দ্বারা সীমাবদ্ধ।

গৃহকাজ—অদ্যকার পাঠ্যাংশ শিক্ষার্থীদের বাড়ীতে ভালো করে পুণরাবৃত্তি করার নির্দেশ দেওয়া হবে।